নৈতিকতা ও নারীবাদ

দার্শনিক প্রেক্ষিতের নানা মাত্রা

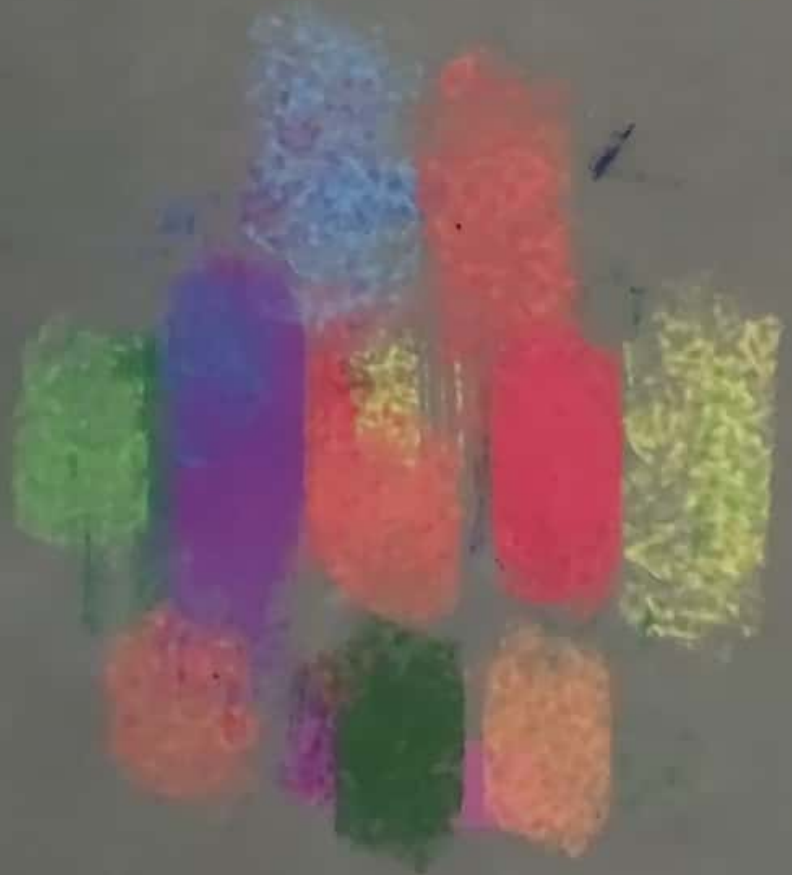

শেফালী মৈত্র

Scanned wit

প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর ২০০৩
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
© শেফালী মৈত্র ২০০৩
নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে
১২সি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ থেকে
শিলাদিত্য সিংহ রায় কর্তৃক প্রকাশিত
অক্ষরবিন্যাস: নন্দন ফটোটাইপ
২৯ জাস্টিস এম.এম. মুখার্জী রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯
মুদ্রণ: গিরি প্রিন্ট সার্ভিস
৯১এ বৈঠকখানা রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৯

ISBN 81 7819 026 5

JADAVPUR UNIVERSITY
PY 9460
Acc No.
Date 12.12.05
LIBRARY KOLKATA-32

মূল্য: এক শত পঞ্চাশ টাকা

সূচি

	প্রাক্‌কথন	সাত
	প্রস্তাবনা	নয়
১.	নারীবাদী দর্শন ও তার প্রেক্ষাপট	১
২.	ফেমিনিজম: লিবারাল এবং র‍্যাডিকাল	১৮
৩.	নির্মাণ থেকে বিনির্মাণ	৩৫
৪.	উত্তর-আধুনিকতা ও নারীবাদ	৬৬
৫.	ন্যায় ও অন্যায় সৃজন: ম্যাকির পদ্ধতি	৮৮
৬.	নৈতিকতা ও নারীবাদ	১০৭
৭.	নারী-নিসর্গনীতি	১৩২
৮.	এম্পাওয়ারমেন্ট	১৪৫
৯.	নারীবাদী স্রোতের দোলাচল	১৫৯
	পরিশিষ্ট	১৬৩
	পারিভাষিক শব্দাবলি	১৭৯
	উৎস-নির্দেশ	১৮৪
	নির্দেশিকা	১৮৭

Scanned with

প্রাক্‌কথন

আজকের দিনে 'নারীবাদ' প্রত্যেকেরই—নারী-পুরুষ নির্বিশেষে—অবশ্যচিন্তনীয় বিষয়।

বেশ কিছুদিন ধরে নারীবাদী দর্শন আয়ত্ত করার ব্রতে রত আছি। যখনই তার কোনো একটি প্রকোষ্ঠে কিছুটা প্রবেশ ঘটেছে তখনই প্রবন্ধের আকারে আমার সেই মনন ও বোধ লিপিবদ্ধ করেছি। বিগত দশ বছর ধরে প্রবন্ধগুলি একাধিক পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকলেও এগুলি একটি ধারাবাহিক গবেষণারই ফসল।

কোনো একটি দার্শনিক বিতর্কে প্রবেশ করে অনেক সময়ই মনে হয়েছে যে বিতর্কটিকে বিশদভাবে বুঝতে গেলে অপর একটি দার্শনিক সমস্যার সমাধান খোঁজা প্রয়োজন। বর্তমান বইটির জন্য যে নিবন্ধগুলির সাহায্য নিয়েছি সেগুলির প্রতিটিই সেই তাগিদেই লেখা। বিষয়-বিন্যাসের যোগসূত্রটি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে কয়েকটি অধ্যায় বিশেষ করে এই বই-এর জন্যই লেখা হয়েছে। কোনো প্রবন্ধই তার আদিরূপে এখানে রাখা হয়নি, অনেকগুলির ক্ষেত্রে বহু অংশই যোগ করা হয়েছে। বই-এ অন্তর্ভুক্তির আগে পরিবর্ধন ছাড়াও প্রতিটি প্রবন্ধের পরিমার্জনও হয়েছে।

এই বই-এ ব্যবহৃত কয়েকটি প্রবন্ধের আদিরূপের প্রকাশনা সম্বন্ধে কিছু তথ্য উল্লেখ্য:

- "নির্মাণ থেকে বিনির্মাণ", 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', নব পর্যায়-৩, মাঘ-চৈত্র ১৪০১
- "উত্তর-আধুনিকতা ও নারীবাদ", 'বারোমাস', শারদীয় ২০০১
- "নৈতিকতা অনুষঙ্গে ন্যায় ও অন্যায় সৃজন: ম্যাকির পদ্ধতি"—প্রবন্ধটি এই শিরোনামে 'দর্শন' পত্রিকায় ৪৩ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৪০৩-এ প্রকাশিত হয়েছিল
- "নৈতিকতা ও নারীবাদ", 'দর্শন', ৪৪ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৪০৬
- "নারী-নিসর্গনীতি", 'বারোমাস', শারদীয় ১৯৯৮
- "এম্পাওয়ারমেন্ট" অধ্যায়টি 'স্বয়ংসিদ্ধা' শিরোনামে 'বারোমাস' পত্রিকায় ২০০২-এ প্রকাশিত প্রবন্ধ অবলম্বনে লেখা

Scanned wit

- পরিশিষ্টের অন্তর্গত "সংলাপ" প্রকাশিত হয় 'বিশ্বভারতী পত্রিকা' নবপর্যায়-৪, ১৪০২

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এই বই-এর পরিকল্পনার গোড়া থেকেই যুক্ত ছিলেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে বইটির প্রকাশনাকে দুর্লভ প্রাপ্তি বলে মনে করি। সুবাস মৈত্র পাণ্ডুলিপিটি আদ্যোপান্ত পড়ে তথ্য ও লিখনশৈলী সম্বন্ধে অমূল্য পরামর্শ দিয়ে বইটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর কাছে আমি ঋণী। নারীবাদী দর্শন এখনও মূলস্রোতে স্থান পায়নি—তথাপি শিলাদিত্য সিংহ রায় এমন একটি বিষয়ে বই প্রকাশে সম্মত হয়ে তাঁর মুক্ত মনের পরিচয় দিয়েছেন। এর জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানাই।

শেফালী মৈত্র
সেন্টার অব অ্যাডভান্সড স্টাডিজ ইন ফিলজফি
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা ৭০০ ০৩২
১ জুলাই ২০০৩

প্রস্তাবনা

নারীবাদ ইদানীং একটি বিশিষ্ট শাস্ত্র হয়ে উঠেছে সারা পৃথিবী জুড়ে—উন্নত, উন্নতিশীল প্রায় সব দেশেই। বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশক থেকে এই শাস্ত্র ক্রমশ গড়ে উঠেছে। লিঙ্গ-সংশ্লিষ্ট নানা গুরুতর প্রশ্নের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে এই শাস্ত্রের উৎপত্তি।

ইতিপূর্বে নারীর সমস্যাকে একটি আর্থ-সামাজিক সমস্যারূপেই দেখা হত, সমস্যাগুলির যে একটি পৃথক তাত্ত্বিক পর্যালোচনা প্রয়োজন তা মনে করা হয়নি। যেহেতু প্রাথমিকভাবে নারীবাদী তাত্ত্বিক পর্যালোচনা পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শুরু হয়, তাই এই চর্চার প্রেক্ষাপট বুঝে নিতে গেলে পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস বুঝতে হবে। বলা যায়, নারীবাদ এখনও তার থিওরেটিকাল বেস বা তাত্ত্বিক ভিত্তিভূমি নির্মাণের প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। এখনও নারীবাদের আলোচনা একটি তত্ত্বভিত্তিক স্পষ্ট রূপ পায়নি।

নির্দিষ্ট কয়েকটি ক্ষেত্রে মূলস্রোতের দার্শনিক বিতর্কের সঙ্গে নারীবাদী তাত্ত্বিক অবস্থানের এখন চাপান-উতোর চলছে। এই সব আলোচনার মূল বিতর্কটি হল 'লিঙ্গ-প্রেক্ষিত তত্ত্বের কোটিকে স্পর্শ করতে পারে কি পারে না?' এবং 'তত্ত্বের লিঙ্গ-প্রেক্ষিত থাকা উচিত কি অনুচিত?' এই নিয়ে, প্রশ্নগুলির উত্তরভেদে, নারীবাদী অবস্থানের ভিন্নতা গড়ে ওঠে।

কোনো কোনো নারীবাদী মনে করেন যে তত্ত্বের লিঙ্গ-প্রেক্ষিত থাকাটা অনুচিত এবং ইচ্ছাকৃতভাবে তত্ত্বের লিঙ্গ-প্রেক্ষিত বজায় রাখার মধ্যেই রাজনীতি আছে। অপরপক্ষে, যাঁরা তত্ত্বের লিঙ্গ-প্রেক্ষিত আছে বলে মনে করেন তাঁদের মতে, তত্ত্বকে লিঙ্গমুক্ত করার চেষ্টার মধ্যেই রাজনীতি আছে। উভয়পক্ষ যে রাজনীতির উল্লেখ করেন তা হল লিঙ্গ-রাজনীতি। অর্থাৎ তত্ত্বগঠনের সময় লিঙ্গ-বৈষম্য কায়েম করার উদ্দেশ্যে তত্ত্বকে লিঙ্গ-লাঞ্ছিত বা লিঙ্গ-বর্জিত রূপ দেওয়া হচ্ছে।

তত্ত্বে লিঙ্গ-প্রেক্ষিত থাকা বা না-থাকার বিতর্কটি প্রধানত দুটি বিতর্কের ওপর ভর

Scanned with

করে আছে। প্রথম বিতর্কটি চলে রিজন (reason) বা যুক্তির স্বরূপকে ঘিরে এবং দ্বিতীয় তর্কটি চলে অবজেক্টিভিটি (objectivity) বা বিষয়তা নিয়ে। এই দুটি স্থলে লিঙ্গ-প্রেক্ষিত থাকা এবং না-থাকা নিয়ে অনেক দিন ধরেই তুমুল বিতর্ক চলেছে।

এইজাতীয় বিতর্ক দর্শনের মূলস্রোতেও চলে আসছে। মূলস্রোতে প্রশ্নটি হল: রিজন বা যুক্তি কি দেশ ও কাল অনপেক্ষ হতে পারে? এর উত্তরে কোনো কোনো দার্শনিক বলেছেন 'হতে পারে'—ইম্যানুয়েল কান্ট (Immanuel Kant 1724–1804) তাঁদের অন্যতম। কোনো কোনো দার্শনিক মনে করেছেন যে রিজন আবশ্যিকভাবে দেশ ও কাল সাপেক্ষ, রিচার্ড রোরটি (Richard Rorty 1931–) এই মত সমর্থন করেন।

এই তর্কের প্রসঙ্গে নারীবাদীরা বাড়তি যে প্রশ্ন তুলেছেন তা হল এই দেশ ও কাল সাপেক্ষতার মধ্যে লিঙ্গ-পরিচয়ের উপস্থিতিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় কিনা? ওঁরা জানতে চান রিজন কি লিঙ্গ-পরিচয়-সাপেক্ষ নাকি লিঙ্গ-পরিচয়-অনপেক্ষ? লিবারাল (liberal) নারীবাদীরা মনে করেন যে রিজন লিঙ্গ-পরিচয়-অনপেক্ষ, র‍্যাডিকাল (radical) নারীবাদীরা কিন্তু তা মনে করেন না।

তাহলে দেখা যাচ্ছে মূলস্রোতে রিজন বা যুক্তির স্বরূপ নিয়ে একটা তর্ক চলছিলই—দীর্ঘদিনের তর্ক। সেই গ্রিক যুগে প্লেটো, অ্যারিস্টটল-এর সঙ্গে সোফিস্টদের তর্ক স্মরণ করা যেতে পারে। দেকার্তের (René Descartes 1596–1650) সময় থেকে এই তর্কের পুনরুজ্জীবন ঘটে। যাঁরা দেশ ও কাল অনপেক্ষ যুক্তির কথা বলেন তাঁরা মনে করেন যে এ হেন রিজন ধ্রুবত্ব দাবি করতে পারে। প্লেটো যেমন মনে করতেন যে রাষ্ট্রকে বিশুদ্ধ রিজন-এর নিয়মে নির্মাণ করতে পারলে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব প্রশ্নাতীত হবে। 'যুক্তির মাধ্যমে সংশয়াতীত জ্ঞান পাওয়া যায় কিনা' এই জিজ্ঞাসাকে দেকার্ত আরো এগিয়ে নিয়ে গেলেন এবং কান্ট বিশ্লেষণ করলেন বিশুদ্ধ রিজন-এর স্বরূপ। কান্টের মতে বিশুদ্ধ রিজন বা বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার সঙ্গে যোগ রয়েছে সর্বজনীনতার ও নেসেসিটি বা অনিবার্যতার। তাঁর মতে বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার প্রতিপাদ্য সর্বদাই সর্বজনীন ও অনিবার্য হবে। কিন্তু প্রশ্ন হল, বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার প্রতিপাদ্যগুলি জগতের বাস্তবতা দ্বারা সমর্থিত কিনা? বা, বিশুদ্ধ যুক্তি দ্বারা নির্মিত তত্ত্ব কি নিছকই তাত্ত্বিক নির্মাণ, তার কি কোনো প্রয়োগ নেই?

এই মূল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে বাস্তবতার স্বরূপ কী সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

বাস্তবতার স্বরূপ জানার অর্থ হল জগতের অবজেক্টিভ রিয়ালিটি (objective reality) জানা। এর জন্য জ্ঞাতা বা সাবজেক্টকে সরিয়ে রেখে জগতের বাস্তবতাকে তার স্বরূপে চিনে নিতে হয়। বিষয়ীকে বাদ দিয়ে বিষয়ের জ্ঞান পাওয়া সম্ভব কিনা এই প্রশ্নকে মুখ্য প্রতিপাদ্য করেছিলেন লজিকাল পসিটিভিস্টরা। এঁরা মনে করতেন যে বিষয়ী-অনপেক্ষ বিষয়ের জ্ঞান সম্ভব। বিজ্ঞানীরা এমনতর জ্ঞানেরই সাধনা করে থাকেন আর তাই তাঁরা জগতের তথ্যনিষ্ঠ ব্যাখ্যা দিতে পারেন। গোড়ার দিকে লজিকাল পসিটিভিস্টরা গবেষণার পদ্ধতি সম্বন্ধে একটা লিখিত কর্মসূচি হাতে নিয়েছিলেন। পরে তাঁরা দেখলেন যে নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁদের নিজেদের করা কর্মসূচি তাঁরা নিজেরাই অনুসরণ করতে পারছেন না। লজিকাল পসিটিভিস্ট গোষ্ঠীর সদস্যরা গবেষণার পদ্ধতিগত রদবদল করতে থাকেন। এর থেকে বোঝা যায় যে তত্ত্ব আর প্রয়োগের ক্ষেত্রে পরিবর্তনগুলি সবসময় বাইরের সমালোচনার চাপে ঘটে না।

রিজন বা যুক্তির সঙ্গে লিঙ্গ-প্রেক্ষিতের সম্পর্ক এবং লিঙ্গ-প্রেক্ষিতের সঙ্গে অবজেক্টিভিটির সম্পর্ক নিয়ে নারীবাদী দর্শনে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। আলোচনাটি মুখ্যত জ্ঞানতত্ত্বের অনুষঙ্গে এবং ফিলসফি অব সায়েনসে হয়েছে।

মনে হতে পারে যুক্তি এবং অবজেক্টিভিটি সম্বন্ধে মূলস্রোতের দার্শনিকরা যে অবস্থানই গ্রহণ করুন না কেন তাতে নারীবাদের কী আসে-যায়? নারীবাদীদের বক্তব্য হল, দেশ ও কাল অনপেক্ষ যদি কোনো বিশুদ্ধ যুক্তি থেকে থাকে—যা সর্বজনীন ও আবশ্যিক—তবে সেই যুক্তির দরবারে লিঙ্গ-সমস্যার বিচার চাওয়া যেতে পারে। আশা করা যেতে পারে যে সে বিচার সুবিচারই হবে। অপরপক্ষে, যদি মনে করা যায় যে দেশ ও কাল অনপেক্ষ বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার উপস্থিতিই অলীক, তাহলে বিশুদ্ধ যুক্তির দোহাই দিয়ে নারী-পুরুষের ওপর কিছু আপতিক বিধিকে সর্বজনীন এবং আবশ্যিক বলে চাপিয়ে দেওয়াটা অন্যায় হবে। এই ধরনের অন্যায়ের প্রশ্রয় নিয়ে যদি লিঙ্গ-বৈষম্য কায়েম করা হয় তবে বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার ধারণার মধ্যে ফাঁকির জায়গাটা ধরিয়ে দেওয়া নারীবাদীদের অবশ্যকর্তব্য।

পিওর রিজন (pure reason) বা বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার প্রসঙ্গ উঠলেই প্রতিতুলনায় ইমোশন (emotion) বা হৃদয়াবেগ বা অনুভূতির প্রসঙ্গও এসে পড়ে। প্রশ্ন করা হয়, 'রিজনকে গুরুত্ব দিলে কি ইমোশন বা আবেগ-অনুভূতিকে রিজন-এর নিয়ন্ত্রণে রাখার কথাও বলা হয়? যতদূর সম্ভব প্রজ্ঞার দ্বারা চালিত হওয়াই কি মানুষের পক্ষে মঙ্গলজনক? নাকি তার হৃদয়াবেগ তার পক্ষে অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য পথিকৃৎ?'

Scanned with

এই প্রশ্নের উত্তর কী হবে তা নির্ভর করছে আর একটি প্রশ্নের উত্তরের ওপর। প্রশ্নটি হল, মানুষের জীবনের লক্ষ্য কী? মানুষের জীবনের লক্ষ্য যদি একটি যূথবদ্ধ সমৃদ্ধ জীবনযাপন করা হয়—যেখানে ব্যষ্টি এবং গোষ্ঠী উভয়ের বিকাশ সম্ভব—তবে এই যূথবদ্ধতা কীভাবে অব্যাহত থাকবে তা নিয়ে ভাবতে হবেই। যুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ যতটা ঐক্যবদ্ধ হতে পারবে হৃদয়ের উষ্ণতা দিয়ে হয়ত সে আরো গভীর সখ্য স্থাপন করতে পারবে।

(দৈনন্দিন জীবনযাপনে, মনে হয়, মানুষ কখনই বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা বা বিশুদ্ধ আবেগের দ্বারা চালিত হয় না, প্রজ্ঞা এবং আবেগ একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। অ্যারিস্টটলের বাণী স্মর্তব্য: Man is a reasoning but not a reasonable animal—মানুষ যুক্তিনিষ্ঠ তার চিন্তায়, কাজে নয়। তার ফলে বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা অথবা হৃদয়াবেগ ছাড়াও সখ্য-স্থাপনের আরো অনেক বিকল্প উপায় ভাবা যেতে পারে। এবারে এখানে একটি নৈতিক প্রশ্ন দেখা দেয়। কী উপায়ে যূথবদ্ধতা স্থাপন করলে তা নৈতিক এবং মঙ্গলের হবে তা স্থির করা প্রয়োজন। যদি মনে হয় বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার অনুজ্ঞা অনুসারে গোষ্ঠী-জীবনে মিলিত হওয়া উচিত তাহলে হৃদয়াবেগকে সেখানে মুখ্য স্থান দেওয়া যাবে না। অপরপক্ষে যূথবদ্ধ হওয়ার মূলে যদি দয়া-সেবা-প্রেম-প্রীতি-ভালবাসার মতো হৃদয়াবেগ থাকাটা বাঞ্ছনীয় হয় তাহলে বিশুদ্ধ যুক্তিকে সেখানে প্রাধান্য দেওয়া যাবে না।)

'মনে হতে পারে যে নৈতিকতার মূল প্রশ্নটিকে 'যুক্তি আগে না হৃদয়াবেগ আগে?' এমন সরল বিকল্পের ছকে কেন বিচার করা হচ্ছে? করা হচ্ছে তার কারণ এই মূল প্রশ্নের সঙ্গেই লিঙ্গ-স্বরূপের ব্যাখ্যা যুক্ত হয়ে আছে। প্রায় সব সমাজে নারী ও পুরুষের লিঙ্গ-পরিচয় নির্মাণ করার সময় নারীকে সেবা-প্রেম-প্রীতি-ভালবাসার গুণে ভূষিত করা হয় এবং পুরুষকে বলিষ্ঠ যুক্তি এবং নিরপেক্ষতার পৃষ্ঠপোষক রূপে দেখা হয়। এমন লিঙ্গ-প্রভেদ নির্মাণ করার পরে যদি নৈতিকতায় বিশুদ্ধ প্রজ্ঞাকে প্রাধান্য দেওয়া হয় তাহলে প্রকারান্তরে পুরুষের লিঙ্গ-ধর্মকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। অপরপক্ষে হৃদয়াবেগকে অগ্রাধিকার দিলে স্ত্রীসুলভ গুণকে নৈতিকতায় প্রাধান্য দেওয়া হয়।)

লিঙ্গ-পরিচয়ের স্বরূপের সঙ্গে নৈতিক আদর্শ নির্বাচনের প্রসঙ্গ জড়িয়ে দিলে মনে হতে পারে যে নৈতিক বিচারের মূল্য কমে যায়। লিঙ্গ-রাজনীতি স্বার্থ আর ক্ষমতার আস্ফালনের সঙ্গে যুক্ত, সুতরাং লিঙ্গ-রাজনীতির সঙ্গে নৈতিক আদর্শ

নির্বাচনের প্রশ্ন জড়ালে নৈতিকতাও তখন স্বার্থ আর ক্ষমতার আস্ফালনের দ্বারা কলুষিত হয়। তাহলে কি জগতের সত্য ও মিথ্যার মতো নৈতিক আদর্শের কোনো অবজেক্টিভিটি বা আদর্শের ধ্রুবত্ব নেই, নৈতিক আদর্শ মাত্রই কি আপেক্ষিক? কোনো শাশ্বত এবং অপরিবর্তনীয় নৈতিক আদর্শ কি নেই?

নৈতিকতা যে আপেক্ষিক এ কথা মূলস্রোতের অনেক দার্শনিকই বলবেন। কেউ মনে করেন সুখ সাপেক্ষে নৈতিক ন্যায়-অন্যায়ের আদর্শ নিরূপিত হয়; কেউ মনে করেন উপযোগিতা সাপেক্ষে ন্যায়-অন্যায় সৃজিত হয়। কিন্তু মূলস্রোতের দর্শন-ভাবনায় কখনই লিঙ্গসাপেক্ষে ন্যায়-অন্যায় সৃজনের কথা বলা হয়নি। জন এল. ম্যাকি (John L. Mackie 1917–1981) যেমন নৈতিকতার আলোচনা করতে গিয়ে নৈতিকতার অধ্রুবত্বের সপক্ষে অনেক যুক্তি দিয়েছেন, সেই সঙ্গে বোঝানোর চেষ্টাও করেছেন যে ন্যায়-অন্যায় সৃজনের ক্ষেত্রে কেমন করে সুখবাদী চিন্তা, উপযোগিতাবাদী চিন্তা, স্বার্থচিন্তা, রাজনীতি, ইত্যাদি আরো নানা মাত্রা মিশে যায়। ম্যাকির লেখার আরো একটি বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি অধিকারভিত্তিক ন্যায়-অন্যায়ের বিধির কথা বললেও এই অধিকার ও কর্তব্যগুলিকে ধ্রুব বলেননি। একদিকে ম্যাকি রাইট-বেসড মরালিটির (right-based morality) কথা বলছেন, অপরদিকে তিনি আপেক্ষিকতা সমর্থন করছেন।

কান্ট দেশ ও কাল অনপেক্ষ বিশুদ্ধ প্রায়োগিক প্রজ্ঞার কথা বলেন—তাই অনেক নারীবাদী তাঁর মত অস্বীকার করেন। অথচ ম্যাকি দেশ ও কাল সাপেক্ষ প্রায়োগিক প্রজ্ঞার কথা বললেও তাঁর মতটি নারীবাদীদের কাছে গ্রাহ্য নয়। কারণ অনুষঙ্গ-সাপেক্ষতার কথা বলতে গিয়ে ম্যাকি লিঙ্গ-সাপেক্ষতার উল্লেখ করেননি। ম্যাকি যদিও মডার্নিজম বা আধুনিক ঘরানার দার্শনিক, তবুও লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে দেকার্ত বা কান্টের মতো আধুনিক দার্শনিকদের সঙ্গে তাঁর কত পার্থক্য রয়েছে। বাইরের সমালোচনার মোকাবিলা করতে গিয়ে একটি দার্শনিক ঘরানার ভেতরের পরিবর্তন কেমন করে হয় তার একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ ম্যাকির অবস্থানে পাওয়া যায়।

১৯৭০ থেকে যখন পরিবেশ রক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে ধীরে ধীরে আন্দোলন শুরু হল, তখন বলা হল পরিবেশ সংরক্ষণ সকলের নৈতিক দায়িত্ব। ম্যাকি বললেন, পরিবেশ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করতে হলে সেটা হবে এক্সটেনশন অব মর‍্যালিটি (extension of morality) বা নৈতিক আলোচনার সম্প্রসারণ। অর্থাৎ মূলস্রোতে

Scanned with

নৈতিক আলোচনা যেমন চলছে চলুক, পরিবেশ রক্ষার সমস্যাটিকে তার সঙ্গে একটা বাড়তি সমস্যা হিসেবে যোগ করা যেতে পারে।

প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে অ্যানিমাল এথিক্স (animal ethics) বা প্রাণিজগতের নৈতিকতার প্রসঙ্গও উঠে এল। প্রশ্ন হল, উদ্ভিদজগৎ এবং প্রাণিজগতের পৃথক কোনো এথিক্স বা নীতিশাস্ত্র থাকতে পারে কিনা? নৈতিকতার এই অনুষঙ্গগুলিতে 'দায়িত্ব' এবং 'কর্তব্য'র ধারণা প্রযোজ্য হতে পারে কিনা এবং হলে কী অর্থে হতে পারে। যদি মানুষের প্রাণিজগতের প্রতি কিছু কর্তব্য আছে বলা হয় তাহলে কথাটার একভাবে মানে বোঝা যেতে পারে। কিন্তু যদি মানুষের প্রতি প্রাণিজগতের 'কর্তব্য' আছে বলা হয়, তবে সে কথাটা বোঝা শক্ত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, নিসর্গনীতির স্বরূপ কেমন হবে সে বিতর্কে নারীবাদী দার্শনিকদের একটা বড় অবদান রয়েছে।

অনেকে মনে করেন যে নারীর লিঙ্গ-পরিচয়ের দরুন প্রকৃতির সঙ্গে তার সমরূপতা আছে। বসুন্ধরাকে মাতা, জীবপালিকা বলা হয়। নারীর লিঙ্গ-পরিচয়ের দরুন তাকেও জননী ও জীবপালিকারূপে চিহ্নিত করা হয়। জীবপালনের ক্ষেত্রে নারী বা প্রকৃতি উভয়ই দায়িত্ব ও কর্তব্যের গণ্ডির বাইরে চলে যায়।পুরোপুরি দায়িত্ব ও কর্তব্যের বাঁধা ছকের ভেতরে থেকে জীবনদায়িনীর ভূমিকা পালন করা যায় না, জীবপালন করতে গেলে যার যা স্বরূপ ধর্ম বা স্বধর্ম তাকে বিকশিত হওয়ার সুযোগ দিতে হয়। প্রতিটি প্রাণীর স্বধর্ম বিকাশের সুযোগ দেওয়াটাই নৈতিকতার লক্ষ্য হলে দায়িত্ব ও কর্তব্যের ছকে আবদ্ধ থেকে কেউই সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না। কান্টের মতো বলা যাবে না যে একমাত্র বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার ওপর নির্ভর করে নৈতিকতার সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। অথবা তাঁর মতো বলা যাবে না যে বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার অধিকারী মাত্রই সম্মানের যোগ্য, সে তার প্রজ্ঞার পরিচয় দিচ্ছে কি না তাতে কিছু এসে যায় না। অধিকার ও কর্তব্যের নিয়মের বাইরে যে সব নারীবাদী নৈতিক অবস্থান গড়ে উঠছে সেগুলিতে একরূপতার চেয়ে বৈচিত্র্যের ওপর মনোযোগ বেশি দেওয়া হচ্ছে। এই অবস্থানগুলির মতে ব্যক্তি, প্রাণী ও উদ্ভিদকে নানা কারণে শ্রদ্ধা করা যায়। একটি হাতি ও একটি প্রজাপতি উভয়ই শ্রদ্ধার পাত্র—যদিও তাদের স্বধর্ম আলাদা। কীভাবে বিভিন্ন দিক থেকে তারতম্য থাকা সত্ত্বেও জীবজগৎ ও প্রাণিজগৎকে সমান মূল্য দেওয়া যেতে পারে তাই নিয়ে ডিপ ইকোলজিস্টরা (deep ecologist) বা

নিবিড় নিসর্গনীতিবাদীরা এবং ইকো-ফেমিনিস্ট (eco-feminist) বা নারী-নিসর্গনীতিবাদীরা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন প্রস্তাব দিয়েছেন।

বিকল্প প্রস্তাবগুলির মধ্যে একটা মূল সুর রয়েছে—প্রতিটি বিকল্প নৈতিক অবস্থানে চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে ক্ষমতার মেরুকরণ ঠেকানো যায়। সব অধিকার, সব দায়িত্ব মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ—অতএব মানুষই ঠিক করে দেবে কোন্ প্রাণীর বা কোন্ উদ্ভিদের বেঁচে থাকার অধিকার আছে বা কীভাবে বেঁচে থাকার অধিকার আছে—নীতিশাস্ত্রের এই প্রকল্পটি নারী-নিসর্গনীতিবাদীরা মানতে চাইবেন না। কারণ এই একই লজিক-এ নারী ও পুরুষের লিঙ্গভেদের অজুহাতে পুনরায় ক্ষমতার মেরুকরণ ঘটবে। নারীর কোন্‌টা অধিকার আর কোন্‌টা কর্তব্য তা তখনও পুরুষতন্ত্রের প্রেক্ষিত থেকেই স্থির করা হবে।

নারীবাদীরা তত্ত্বের বিচার করেন নিজেদের প্রান্তিক অবস্থাটিকে ভালভাবে বুঝে নেওয়ার জন্যে। তত্ত্ব-কাঠামোর সঙ্গে লিঙ্গ-বৈষম্য সমর্থনকারী প্রতিষ্ঠানগুলির একটা যোগ আছে বলে তাঁরা মনে করেন—এবং কতকগুলি বৈষম্যমূলক আচরণও কায়েম থাকে সেগুলি প্রতিষ্ঠানের মদতপুষ্ট হয় বলেই। নারীর প্রান্তিকতা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় আলোচনা করতে গিয়েই তাই স্বাভাবিকভাবে তত্ত্বের আলোচনা চলে আসে। পর্যালোচনা করতে হয় আধুনিকতার তত্ত্বের সঙ্গে কীভাবে লিবারাল বা উদারমনা অবস্থান যুক্ত আর উত্তর-আধুনিকতার সঙ্গে র‍্যাডিকাল বা সংশোধনমূলক অবস্থানের যোগই বা কোথায়। এই বিকল্প নারীবাদী অবস্থানগুলি বিভিন্নভাবে নারীর সক্ষমতার লক্ষ্যকে উপস্থাপন করে। লিবারাল নারীবাদীরা ক্ষমতার মূলস্রোতে অনুপ্রবেশ করতে চান, র‍্যাডিকালরা চান মূলস্রোতের অভিমুখ ঘুরিয়ে দিতে যাতে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটে। ফলে এম্পাওয়ারমেন্ট (empowerment) বা সক্ষমতার রূপ কী হলে লিঙ্গ-সাম্য সুরক্ষিত থাকবে তা নিয়েও নারীবাদী বিতর্ক রয়েছে।

'নারীবাদী দর্শন ও তার প্রেক্ষাপট' অধ্যায়ে সক্রিয় আন্দোলন-এর পাশাপাশি কী কারণে নারী তত্ত্বের দিকে মনোযোগ দিল এবং ধীরে ধীরে নারীবাদী দর্শন গড়ে উঠল তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে মূলস্রোতের দর্শন থেকে কী অর্থে নারীবাদী দর্শন ভিন্ন এবং কী তার বৈশিষ্ট্য তাই নিয়ে আলোচনাও করা হয়েছে। মূলস্রোতের দর্শনে দার্শনিক তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ উহ্য রাখেন অথচ নারীবাদী দর্শনে দার্শনিক তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ ঘোষণা করবেন এটাই রীতি।

Scanned with

নারীবাদী দর্শনকে আলোচনার সুবিধের জন্য লিবারাল ও র‍্যাডিকাল এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

'ফেমিনিজম: লিবারাল এবং র‍্যাডিকাল', শিরোনামের দ্বিতীয় অধ্যায়টিতে যতটা সম্ভব স্পষ্ট করে এই দুই ধারার নারীবাদের মূল বক্তব্য তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে এই মতবাদগুলির উৎপত্তির ইতিহাস উপস্থাপন করেছি। লিবারাল ও র‍্যাডিকাল ফেমিনিজম-এর ইতিহাস থেকে মনে হতে পারে যে এই দুই ধারার জন্ম যেহেতু পশ্চিমের মাটিতে তাই আমাদের দেশে এই মতগুলির কোনো প্রাসঙ্গিকতা নেই। এই মত পশ্চিমে যেভাবে চর্চা হচ্ছে অবিকল সেইভাবে আমাদের দেশে হয়তো প্রাসঙ্গিক নয়। কিন্তু এই মতগুলির অনেকটাই আমরা গ্রহণ করতে পারি এবং প্রয়োজনমতো গ্রহণ করাও হয়েছে।

এই বই-এর তৃতীয় অধ্যায় 'নির্মাণ থেকে বিনির্মাণ'। লিবারাল ও র‍্যাডিকাল ফেমিনিজম-এর তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটটির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য নির্মাণ থেকে বিনির্মাণের ইতিহাসটা জানা অত্যন্ত জরুরি। প্রাচীন গ্রিক যুগ থেকেই রাজনৈতিক মতাদর্শকে লজিক ও জ্ঞানতত্ত্বের শক্তভূমির ওপর প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হচ্ছে। দর্শনের ইতিহাসে যাঁরা এই চেষ্টায় ব্রতী হয়েছেন তাঁরা পরস্পরের অবস্থানের আলোচনা ও সমালোচনা করে তাঁদের মূল প্রতিপাদ্যকে আরো সুপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন। কখনো কখনো মনে হয়েছে তাঁরা সফল হয়েছেন; কখনো মনে হয়েছে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন।

প্রাচীন গ্রিক দর্শন থেকে পাশ্চাত্য দর্শনের আধুনিক যুগে পদার্পণের প্রায় আড়াই হাজার বছরের ইতিহাস দীর্ঘ ও বৈচিত্র্যময়। তার মূল ধারার বিবর্তনের রৈখিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে মাত্র। অবশ্যই এর ফলে কিছু সরলীকরণ ঘটেছে। এখানে উদ্দেশ্য হল বিতর্কটির একটি প্রাথমিক পরিচয় দেওয়া—গোটা বিতর্কটি তুলে ধরা নয়। বাদ-প্রতিবাদের প্রেক্ষিতে যখনই আধুনিকতার অবস্থানকে আরো প্রামাণিক ও বিশ্বাসযোগ্য করা হয়েছে তখনই আশা জেগেছে যে অবস্থানটির দুর্বল জায়গাগুলিকেও সংস্কারের মাধ্যমে জোরালো করা যাবে। আবার যখন মনে হয়েছে যে আধুনিকতার অকাট্য যুক্তির চেয়ে তর্কের ফাঁকই বেশি তখন আধুনিকতার বিকল্প অন্বেষণ করা হয়েছে।

আধুনিকদের মধ্যেও পারস্পরিক বিবাদ-বিতর্ক চলেছে—একদল আর একদলের বক্তব্যকে অগ্রাহ্য করছেন। উত্তর-আধুনিকদের মধ্যেও যে সকলে একমত পোষণ করেন তা নয়, দার্শনিকদের মধ্যে এত মত-পার্থক্য সত্ত্বেও প্রত্যেকেই দাবি করেন তাঁর বক্তব্যই সঠিক! কোনো মত সর্বজনগ্রাহ্য না হওয়া সত্ত্বেও যদি সকলের ওপর তা আরোপ করা হয় তাহলে বুঝতে হবে যে সেই মতের পৃষ্ঠপোষকদের ক্ষমতার জোর আছে। একটি অবস্থানের বেশি প্রতিপত্তি থাকাটা দোষের নয় যদি সেটা বৈধ উপায়ে পাওয়া প্রতিপত্তি হয়ে থাকে।

'ন্যায় ও অন্যায় সৃজন: ম্যাকির পদ্ধতি' অধ্যায়ে একটি নৈতিক অবস্থানের কথা বলা হয়েছে। সেটি সর্বজনগ্রাহ্য না হয়েও নৈতিক উপায়ে সৃজিত বলে দাবি করা হচ্ছে। ম্যাকি বলতে চেয়েছেন যে কতকগুলি শর্ত মেনে যদি ন্যায় ও অন্যায় সৃজন করা হয় তবে সেই প্রক্রিয়াটিকে নৈতিক বলা হবে। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নৈতিক এবং রাজনৈতিকের মধ্যে সম্পর্ক আছে বলে স্বীকার করেছেন। মূলস্রোতের দার্শনিকরা দার্শনিক আলোচনার মধ্যে রাজনৈতিক স্বার্থের উপস্থিতি স্বীকার করেন না। ম্যাকি এইদিক থেকে ব্যতিক্রম।

নারীবাদী দার্শনিকরা প্রত্যেকে কিন্তু দার্শনিক অবস্থানে রাজনৈতিক অভিপ্রায়ের উপস্থিতি অনুমোদন করেন। তাঁদের মতে রাজনৈতিক অবস্থান সকলেরই থাকে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়, আবার কোথাও থাকে প্রচ্ছন্ন। নারীবাদীরা মনে করেন যে আলোচনা আরম্ভ করার আগে প্রত্যেকের নিজের রাজনৈতিক অবস্থান ঘোষণা করা সমীচীন ও যুক্তিযুক্তই শুধু নয়, তা অবশ্যকর্তব্য।

তত্ত্ব কীভাবে লিঙ্গ-পরিচয়কে প্রভাবিত করে তার স্পষ্ট উদাহরণ 'নৈতিকতা ও নারীবাদ' অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব অনুসারে লিঙ্গস্বরূপ নির্মাণ করলে একরকম নৈতিক মূল্যায়ন পাই। আর বিকল্প তত্ত্ব অনুসারে লিঙ্গস্বরূপ নির্মাণ করলে অন্যরকম নৈতিক মূল্যায়ন পাই। ফ্রয়েডীয় তত্ত্বকে অনুসরণ করে ব্যক্তির ডেভেলপমেন্টাল স্টেজেজ (developmental stages) বা মানসিক বিকাশের স্তরভেদ ব্যাখ্যা করলে দেখা যাবে যে পুত্র-সন্তান বয়ঃসন্ধিকালে নৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে যে পরিমাণে পরিণত (mature) হয় একই বয়সে কন্যা-সন্তান তুলনামূলকভাবে কম পরিণত। কিন্তু ফ্রয়েডের এই সিদ্ধান্তটিকে স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত বলে মেনে নেবার প্রবণতাকেই মেনে নেওয়া যায় না। ফ্রয়েডের মূল্যায়ন যে পুরুষ-শ্রেষ্ঠ চিন্তাধারার (male chauvinistic attitude) প্রতিফলন নয় তা কি নিশ্চিতভাবে

বলা যায়? তাই ক্যারল গিলিগান এই সিদ্ধান্তের বৈধতা বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেন, এবং জানতে চান নৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে কে পরিণত, আর কে পরিণত নয় তা মূল্যায়নের জন্য যে মানদণ্ড ব্যবহার করা হয় তার মধ্যেই লিঙ্গ-পক্ষপাত আছে কিনা। গিলিগান মনে করেন যে মানদণ্ড নির্বাচনটিই পক্ষপাতদুষ্ট।

মনস্তত্ত্ব আলোচনার পথ ধরে কী করে নৈতিকতার আলোচনায় পৌঁছানো যায় তা গিলিগান স্পষ্ট করে আলোচনা করেছেন। মনস্তত্ত্ব আর নৈতিকতার মেলবন্ধন দেখে আন্দাজ করা যায় একটি ইন্টারডিসিপ্লিনারি শাস্ত্রের (interdisciplinary subject) আলোচনা কীভাবে হতে পারে।

নারীবাদের ইন্টারডিসিপ্লিনারি রূপটি আরো স্পষ্ট হয় সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে। নারী-নিসর্গনীতির সঙ্গে সোশাল ইকোলজির (social ecology) তর্কের মাধ্যমে পুনরায় লিবারাল আর র‍্যাডিকালদের মতান্তরের প্রতিফলন দেখা যায়। নিসর্গনীতির ক্ষেত্রেও একাধিক শাস্ত্রের মিশ্রণ দেখতে পাই। একাধারে মনস্তত্ত্ব, অধিবিদ্যা, জ্ঞানতত্ত্ব ও নৈতিকতার আলোচনা এসে যাওয়ার ফলে নারীনিসর্গনীতি একটি জটিল রূপ ধারণ করে। এখানে সেই জট খোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়ে আছে এম্পাওয়ারমেন্ট বিষয়ে আলোচনা। এর বাস্তব অবস্থার কতকগুলি সমস্যার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। প্রশ্ন তোলা হয়েছে: কেন নারীকে খাতায়-কলমে বা কথায়-কানুনে ক্ষমতা দিলেও সে ওই ক্ষমতা ভোগ করতে পারে না? তার নিজের ভেতরে এবং বাইরে বাধাগুলি কোথায়? নানান দিক দিয়ে এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজে বার করার চেষ্টা করা হয়েছে।

নারীকে যথার্থ আধুনিক ও সক্ষম করতে হলে শুধু পলিসির পরিবর্তন করলেই হবে না। অথবা, প্রাতিষ্ঠানিক রদবদল করলেও হবে না। নারীর মানসিকতা বদল করলেও হবে না। এম্পাওয়ারমেন্টের জন্য এর প্রতিটি শর্তই জরুরি, কিন্তু যথেষ্ট নয় (necessary but not sufficient condition)।

প্রকৃত সক্ষমতার জন্য আনা চাই পিতৃতন্ত্রের বদল, পুরুষ-চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন এবং নারী-বিষয়ে পুরুষ-মনে নবমূল্যায়ন।

পরিশিষ্টে রাখা হল কয়েকটি সংলাপ যা নির্মাণ থেকে বিনির্মাণ নিয়ে বিতর্কের বিস্তার ও জটিলতা বুঝতে কিছুটা সাহায্য করবে।

'যা নেই তা নেই, যা নেই তা হবে
সতর্ক যদি প্রহরায় থাকো
ভিত থেকে ফুঁড়ে উঠবে দিন;'

শচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
"জগৎ", 'মৃত্যুটাকে ভুলতে চাই'

Scanned with

প্রথম অধ্যায়

নারীবাদী দর্শন ও তার প্রেক্ষাপট

১৯৭০ থেকে নারীবাদী দর্শন স্বতন্ত্র রূপ নিতে শুরু করে। সত্তরের দশক থেকে উঠে-আসা নারী আন্দোলনের নতুন জোয়ার 'নিউ ওয়েভ ফেমিনিজম' (New Wave Feminism) বলে চিহ্নিত হয়ে থাকে। তার আগে নারী আন্দোলন মূলত দাবিদাওয়া আদায়ের আন্দোলনে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৭০-এ তার সঙ্গে যুক্ত হল সমস্যার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা। প্রতিবাদ, বিদ্রোহ ও জেহাদের সঙ্গে যুক্ত হল কনসেপ্টস (concepts) বা ধারণার স্তরে পরিবর্তনের দাবি। ফলত 'অ্যাকটিভিজম' (activism) বা সক্রিয় আন্দোলনের সঙ্গে একটা নতুন বৌদ্ধিক মাত্রা পাওয়া গেল।

নারীর সমস্যা নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তাভাবনা এবং প্রতিবাদ অঙ্কুরিত হয় অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে। শিল্প-বিপ্লবের (১৭৬০) ফলে মেয়েরা ক্রমান্বয়ে রুজি-রোজগারের উদ্দেশ্যে ঘরের বাইরে বেরোতে থাকে। বিভিন্ন কলকারখানায় শিশু ও নারী শ্রমিক সেই সময় নিযুক্ত হয়। এরা পুরুষদের তুলনায় বেশি সময় কাজের বিনিময়ে কম মজুরি পেত। ফলে প্রথমে ব্রিটেনে ও পরে আমেরিকায় মহিলারা সংগঠিত হতে থাকে বিভিন্ন অভার-অভিযোগ ব্যক্ত করার জন্য এবং তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য। ১৭৮৩-তে মেরি ওলস্টনক্রাফ্‌ট (Mary Wollstonecraft 1759—1797) লন্ডনে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন কিন্তু সে বিদ্যালয় বেশিদিন চলেনি। তার প্রায় দশ বছর পরে ১৭৯২-এ ওলস্টনক্রাফ্‌ট মেয়েদের অধিকারের সমর্থনে একটি বই লেখেন যার নাম *A Vindication of the Rights of Woman* । এর ঠিক এক বছর আগে (1791) অলিম্প দ্য গজ (Olympe de Gouges 1748—1793) *Declaration of the Rights of Woman* বইটিতে সরকারের চোখে, আইনের চোখে ও শিক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েদের সমান অধিকারের দাবি রাখেন।

ওলস্টনক্রাফ্‌ট তাঁর বইতে লিখছেন: নারী সমান অধিকার লাভের জন্য সংগ্রাম করছে অথচ সে সর্বতোভাবে তার সংগ্রামী ক্ষমতা হারিয়েছে—তার শিক্ষা নেই,

রাজনৈতিক ক্ষমতা নেই, সে গৃহস্থালির দায়ভারে ক্লিষ্ট। ওলস্টনক্রাফ্‌ট মনে করেছিলেন যে এমন নির্বল গোষ্ঠির প্রতিবাদ পরিণামহীন হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

প্রসঙ্গত বলা যায় যে ওলস্টনক্রাফ্‌টের ওই রচনার প্রায় আশি বছর পরে ১৮৬৯-এ জন স্টুয়ার্ট মিলের (John Stuart Mill 1806—1873) *The Subjection of Women* প্রকাশিত হয়। মিলের লেখাকে বৈপ্লবিক মনে করা হয়েছিল যদিও তাঁর অনেক বক্তব্যের প্রাথমিক উচ্চারণ ওলস্টনক্রাফ্‌টে বইটিতেই পাওয়া যায়। প্রচারের অভাবে সে কথার বিস্মরণ ঘটে। ইদানীং অবশ্য ওলস্টনক্রাফ্‌টের বইটি বহুলপঠিত। এটি আজকাল মানবীবিদ্যা-চর্চার পাঠ্য তালিকায় অপরিহার্য 'টেক্সট' বলে গণ্য হয়ে থাকে।

আমেরিকায় নারী আন্দোলন সংগঠিত হয় দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূত্র ধরে। সেই সংগ্রামে শ্বেতাঙ্গ এবং কৃষ্ণাঙ্গ মহিলারা একজোট হয়ে প্রতিবাদ করে। ১৮৩৩-এ এই মহিলাদের প্রথম প্রকাশ্য সভা বর্ণবিদ্বেষীদের আক্রমণে পণ্ড হয়। এর পর ১৮৪০-এ ব্রিটেনে দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে আয়োজিত কনভেনশনে শুধু পুরুষ সদস্যদের আমন্ত্রণ জানানো হয়; সেই সভায় মহিলাদের অংশগ্রহণের অধিকার ছিল না।

এই অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে দুই আমেরিকান মহিলা লুক্রিসিয়া মোট (Lucretia Mott 1793—1850) এবং এলিজাবেথ ক্যাডি স্ট্যানটন (Elizabeth Cady Stanton 1815—1902) যৌথভাবে 'সেনেকা ফলস—ডিক্লেয়ারেশন অব সেন্টিমেন্টস' Seneca Falls–Declaration of Sentiments নামে ইস্তাহার রচনা করেন। এই ইস্তাহারে মেয়েদের সমান অধিকারের কথা দৃঢ়ভাবে বলা হয়। এঁদের ইস্তাহারের শিরোনামটি লক্ষ্যণীয়, 'ডিক্লেয়ারেশন অব রাইটস' না বলে 'ডিক্লেয়ারেশন অব সেন্টিমেন্টস' বলা হয়েছে। জানতে ইচ্ছা করে কেন এমনটি হল? তাহলে কি মেয়েদের প্রতিবাদ সেন্টিমেন্ট-আশ্রিত?

ব্রিটেন এবং আমেরিকায় অষ্টাদশ শতক থেকে এক এক করে নারীর ভোটাধিকার, শিক্ষার অধিকার, স্বোপার্জিত অর্থ স্বাধীনভাবে ব্যয় করার অধিকার, ইত্যাদি নিয়ে আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। এই সংগ্রামগুলির কোনোটাই অনায়াসে সাফল্য অর্জন করেনি। ব্রিটেনে এই তিনটি মৌলিক অধিকার আদায় হয়েছে তিন প্রজন্মের সংগ্রামের ফলে।

ভারতের মহিলাদের ভোটের অধিকার কার্যকর হয় ১৯২৯-এ। এই ভোটাধিকারে তিনটি শর্ত যুক্ত ছিল: (১) নারীকে বিবাহিত হতে হবে, (২) তাকে সম্পত্তির অধিকারী হতে হবে, এবং (৩) তাকে শিক্ষিত হতে হবে।[১] উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে যাঁরা নিরলসভাবে নারী শিক্ষণ প্রবর্তনের চেষ্টা করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন বাঙলার রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩)। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১), মহারাষ্ট্রের জ্যোতিরাও ফুলে (১৮২৭-১৮৯০) এবং গুজরাটের দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-৮৩) প্রমুখ। এঁদের অক্লান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও ভারত সরকারের *Report of the Committee on the Status of Women* (December 1974) থেকে জানা যায় 'Only a few thousand girls, mostly belonging to urban upper and middle class families, entered the formal system of education between 1850 and 1870.'[২]

১৭৯২-এ মেরি ওলস্টনক্রাফ্‌ট মেয়েদের যেজাতীয় বঞ্চনার চাপের কথা উল্লেখ করেছেন সমকালীন ভারতের নারীর ক্ষেত্রেও তা সমানভাবে প্রযোজ্য ছিল। এছাড়া ভারতের মহিলাদের ওপর বাড়তি চাপও ছিল, তা হল ঔপনিবেশিকতার চাপ। দেশে তখন স্ব-শাসনের অধিকার না থাকায় নারীর সুবিচার এবং স্বাধিকারের দাবিগুলি পেশ করতে হত বিদেশী শক্তির কাছে। এমন প্রতিবাদ তো অরণ্যে রোদন ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। ব্রিটিশ সরকার তার প্রশাসনের স্বার্থে দেশে ছাপাখানা, চিকিৎসালয়, বিদ্যায়তন, রাস্তাঘাট নির্মাণ করে যার প্রসাদ পরোক্ষভাবে চুয়ে চুয়ে মেয়েদের কাছেও কিছুটা এসে পৌঁছায়।

একটি বিষয় লক্ষণীয়—আঠার শতক থেকে পশ্চিম দেশে যেমন নারী আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল আমাদের দেশে নারীমুক্তির প্রচেষ্টাগুলির ক্ষেত্রে তেমনটি দেখা যায়নি, কোনো কোনো ব্যক্তি নিজের চেষ্টায় বা কোনো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নারীকে আরো সক্ষম করার কর্মসূচি হাতে নিলেও এই প্রচেষ্টার লক্ষ্য ছিল নারীকে সুগৃহিণী করে তোলা যাতে ব্রিটিশ শাসনের প্রভাবে পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে সে তার স্বামীর প্রকৃত কর্মসঙ্গিনী হতে পারে।

বিংশ শতকের গোড়া থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে নারী-পুরুষ সমবেতভাবে কাজ করেছেন। সেখানে লক্ষ্য ছিল দেশকে স্বাধীন করা। অবশ্য পরোক্ষভাবে নারীর শৃঙ্খলও কিছুটা শিথিল হয়েছিল। নারীর সমস্যাকে

Scanned with

বিশেষভাবে কর্মসূচিভুক্ত করে কোনো দীর্ঘমেয়াদি লড়াই তখনও গড়ে ওঠেনি। বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচির সংযোজন হিসেবে হয়ত কখনও নারীর সমস্যার কথা উত্থাপিত হয়েছিল অথবা সমাজে একটা আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে নারী কিছু সুযোগ পেয়েছে। ভারতের নারীকে যখন পাশাপাশি দুটো চাপের বিরুদ্ধে যুঝতে হয়েছে—একদিকে ঔপনিবেশিকতার চাপ, আর অপর দিকে লিঙ্গ-বৈষম্যের চাপ—তখন দেখা গেছে সবসময় প্রথম চাপের মোকাবিলাটা বেশি জরুরি মনে করা হয়েছে, অথবা ভাবা হয়েছে যে প্রথমটা থেকে রেহাই পেলেই লিঙ্গ-বৈষম্যের অবদমন আর থাকবে না।

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে যে নারী-আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল তা পৃথিবীর বিভিন্ন কোণে ছড়িয়ে গেলেও সব জায়গায় সমান ফলপ্রসূ হয়নি। এক-একটি আন্দোলনে কিছুটা ওঠা-পড়াও চলতে থাকে। নানান চাপে আন্দোলন কখনও স্থগিত থেকেছে, কখনও পিছু হটেছে, আবার কখনও পরিত্যক্ত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই মূল বিষয়ের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক এবং অপ্রাসঙ্গিক সমস্যা জড়িয়ে গিয়ে সংগ্রামের লক্ষ্য ঝাপসা হতে থাকে। ফলে আন্দোলনে ক্রমশ ভাঙন ধরে। নারী-আন্দোলনের আর একটি অনুপেক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য অনেক সময় দৃষ্টি এড়িয়ে যায়—পুরুষের বৈষম্যমূলক আচরণের চেহারাটা যে পাল্টে পাল্টে যায় তা মেয়েদের খেয়াল থাকে না। এক ধরনের নির্যাতন বন্ধ করতে সক্ষম হলে আর এক রূপ নিয়ে পুনরায় নির্যাতন চলতে থাকে—সতীদাহের পরিবর্তে এখন কানে আসে বধূহত্যার সংবাদ। ইদানিং আবার বধূহত্যার তুলনায় গণ-ধর্ষণের ঘটনা আরো অনেক বেশি ঘটছে।

সমাজের বৃহত্তর কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে হলে, সমাজ পরিচালনায় নারীরূপে কর্তৃত্ব পেতে গেলে (পুরুষের ছায়াবলম্বনে কর্তৃত্ব না-চাইলে) নারীকে নিজের কথা নিজের মতো করে বলতে শিখতে হবে। তাকে স্পষ্ট করে বুঝতে হবে সে কী চায়। তার অভাব-অভিযোগগুলি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করতে হবে। নারীর নিজের কথা নিজের মতো করে বলা প্রয়োজন। তাকে বুঝে নিতে হবে কোন স্বরটি তার নিজের আর কোনটি বা ধার করা। এর জন্য ভাষার ওপর দখল থাকলেই হবে না, তার সঙ্গে চাই চিন্তার স্বচ্ছতা।

ক্ষমতার বিচারে নারী সমাজের প্রান্তদেশে অবস্থিত, নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ কখনও স্পষ্ট কখনও প্রচ্ছন্ন। সমাজে ক্ষমতার প্রান্তে যারা আছে তারা বিভিন্ন পরিচয়ে জোট বাঁধে—আদিবাসী জোট, আঞ্চলিক জোট, অসংগঠিত শ্রমিকের

জোট, প্রতিবন্ধী জোট, ইত্যাদি। অন্যান্য প্রান্তিক সমাজের সঙ্গে নারীর প্রান্তিকতা এক নয়। অপরাপর বৈষম্যের একটা মোটামুটি স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়, সেই সঙ্গে তার একটা সামাজিক মানচিত্রও তৈরি করা যায়। প্রতিতুলনায়, লিঙ্গ-বৈষম্যের চেহারা অনেক বেশি অস্পষ্ট। ঘরে এবং বাইরে যেখানেই নারী ও পুরুষ অবস্থান করে সেখানেই তারা তাদের লিঙ্গ-পরিচয় বহন করে। বলাই বাহুল্য, লিঙ্গ-পরিচয়ের মধ্যেই বৈষম্য-ভাবনা নিহিত রয়েছে। এইজন্য এই সমস্যা কোনো একটি স্থানে কোনো একটি বিশেষ রূপে সীমাবদ্ধ থাকেনি। প্রান্তিক গোষ্ঠির মধ্যে যেমন লিঙ্গ-সমস্যা রয়েছে তেমনি সমাজের মূলস্রোতেও এই সমস্যার দেখা মেলে। প্রান্তিক গোষ্ঠির প্রান্তিকতার সঙ্গে লিঙ্গ-বৈষম্য যুক্ত হয়ে বরং বাড়তি সমস্যা সৃষ্টি করে। তার মানে অবশ্য এই নয় যে উচ্চবিত্ত, উচ্চবর্ণ, এবং উচ্চশিক্ষিত মহিলাকেও লিঙ্গ-সমস্যা পীড়িত করে না।

লিঙ্গ-বৈষম্যের কোনো সমরূপী চেহারা নেই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এ জাতীয় বৈষম্য-ভাবনার জন্য সমাজের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণের অধিকার না থাকার ফলে সে অনুপস্থিত, কখনও দেখা যায় যে সে উপস্থিত থেকেও অদৃশ্য, অর্থাৎ তার উপস্থিতির কোনো স্বীকৃতি নেই। কোথাও কোথাও আবার একই কাজের জন্য পুরুষের তুলনায় সে কম বেতন পায় বলে বৈষম্য উৎপন্ন হয়। অধিকাংশ কর্মস্থলে দেখা যায় যে পুরুষের প্রয়োজন অনুযায়ী কর্মস্থল সাজানো হয় এবং কাজের শর্তাবলীও নির্মিত হয় সেই ভাবে—এটাই স্বাভাবিক এবং ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করা হয়। নারীর প্রয়োজন পুরুষের প্রয়োজনের অনুরূপ না হলে ধরে নেওয়া হয় নারী কোনো অতিরিক্ত সুযোগ চাইছে!

দীর্ঘদিন ধরে লিঙ্গ-বৈষম্য ও নির্যাতনের সমস্যাগুলিকে খণ্ড-খণ্ড বিচ্ছিন্ন সমস্যা রূপে দেখা হচ্ছিল। প্রতিটি সমস্যার শিকড় যে কত গভীরে প্রোথিত এবং প্রতিটি সমস্যার সঙ্গে যে অন্য কত সমস্যা জড়িত হয়ে আছে তা তলিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়নি। আরো পাঁচটা প্রান্তিকতার সমস্যার সঙ্গে এই সমস্যাটিকেও এক করে দেখার জন্যই হয়তো এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। অবশ্যই অপরাপর প্রান্তিকতার সমস্যার সঙ্গে লিঙ্গ-বৈষম্যের সমস্যার সাদৃশ্য আছে। তবে এই সমস্যা অনেক দিক থেকে অনন্যও বটে।

লিঙ্গ-বৈষম্যের সমস্যার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য: (১) লিঙ্গ-ভাবনা যে প্রকারে

পরিব্যাপ্ত আর কোনো বৈষম্য-ভাবনাই সেভাবে আবিশ্ব ছড়িয়ে নেই। লিঙ্গ-সমস্যা যে কেবল ভৌগোলিক ভাবে পরিব্যাপ্ত তাই নয়, এটি আমাদের চিন্তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্তরেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে আছে।

(২) লিঙ্গ-সমস্যা অপরাপর সমস্যার সঙ্গে যুক্ত হয়ে জটিল রূপ ধারণ করে। যেমন তৃতীয় বিশ্বের একটি নিম্নবর্ণের মেয়ের সমস্যা শুধু লিঙ্গ-জনিত নয়। তার জীবনের সমস্যা ঔপনিবেশিকতা, বিত্ত, বর্ণ ও লিঙ্গের সংমিশ্রণে এক বিচিত্র জটিলতার সৃষ্টি করে।

(৩) লিঙ্গ-সমস্যাটিকে সম্পূর্ণভাবে নৈর্ব্যক্তিক রূপে দেখা সম্ভব নয়। লিঙ্গ-পরিচয় নারী-পুরুষের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। পাশাপাশি নারী-পুরুষের মধ্যে একটা প্রেমের সম্পর্ক থাকাও অস্বাভাবিক নয়। বিদ্বেষ আর ভালবাসা মিলে সম্পর্কের একটা দ্বান্দ্বিকতা গড়ে ওঠে (love-hate relation) যা অপরাপর প্রান্তিক গোষ্ঠীর মধ্যে থাকে না। যেমন প্রভু আর ভৃত্যের মধ্যে এই সম্পর্ক অনুপস্থিত; প্রভুর প্রতি দাসের যুগপৎ অনুরাগ আর বিরাগের টানা-পোড়েন চলে না। নারী কিন্তু প্রতিষ্ঠান আর ব্যক্তির সঙ্গে এমন অন্তরঙ্গভাবে যুক্ত থাকে যে 'সম্পর্ক ছিন্ন করলে তার হারানোর কিছু নেই' এই কথা সে নির্দ্বিধায় বলতে পারে না।

(৪) লিঙ্গ-বৈষম্যের সমস্যাটি বহুমাত্রিক। এর মোকাবিলা প্রচলিত পদ্ধতিতে সম্ভব নয়। কারণ, এর মূল সমাজের অনেক গভীরে প্রবেশ করেছে এবং এর শাখাও সর্বত্র বিস্তৃত। তাই এই সমস্যার অভিব্যক্তি কেবল চর্যায় সীমাবদ্ধ নয়, প্রাতিষ্ঠানিক স্তরেও তা উপস্থিত। এমনকি কনসেপ্ট বা ধারণার স্তরও লিঙ্গ-বৈষম্যের বাহক হতে পারে। ফলে চর্যা, প্রতিষ্ঠান ও ধারণার পরিমণ্ডল—এই তিন স্তরেই লিঙ্গ-বৈষম্য পরিব্যাপ্ত।

(৫) লিঙ্গ-বৈষম্য প্রসূত সমস্যাগুলির সমাধানকল্পে একাধিক মাত্রার দিকে দৃষ্টি দিতে হয় বলে কেবলমাত্র 'অ্যাক্টিভিজম' (activism) বা সক্রিয় আন্দোলনের সাহায্যে এই সমস্যার মোকাবিলা করা যাবে না। অপরপক্ষে, কেবল তত্ত্বের সাহায্যেও তার মোকাবিলা করা যাবে না। এই সমস্যার সমাধানে যুগপৎ তত্ত্ব আর প্রয়োগের আশ্রয় নিতে হবে। যৌগপত্যের ওপর জোরটা এখানে লক্ষ্যণীয়।

(৬) তত্ত্বের কোনো একটি বা দুটি শাখার সাহায্যে লিঙ্গ-সমস্যা বোঝা যাবে না। এই সমস্যাটি প্রকৃত অর্থে ইন্টারডিসিপ্লিনারি (interdisciplinary) বা আন্তর্বিষয়ক

সমস্যা। একই সঙ্গে ইতিহাস-ভূগোল-অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যের আলোচনার মাধ্যমে সমস্যাটি বুঝতে হবে।

কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে বোঝানোর চেষ্টা করা যেতে পারে যে লিঙ্গ-বৈষম্যের আলোচনা ঠিক কী অর্থে বিভিন্ন শাস্ত্রকে ছুঁয়ে যায় :

ইতিহাসের কথাই ধরা যাক। আগে আমাদের লিঙ্গ-রাজনীতির গোড়ার কথা জানতে হবে। বুঝতে হবে যুগে যুগে এক একটা সমাজে লিঙ্গ-বৈষম্যের উৎস কী কী, সেগুলি কীভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এককথায় বলতে গেলে—লিঙ্গ-ভাবনার ইতিহাস ভালভাবে বুঝতে হবে। ইতিহাস আলোচনা করতে গেলেই ধর্মের অনুশাসনের কথা এসে যাবে। সব সমাজেই লিঙ্গ-ব্যবস্থা বলবৎ রাখার ব্যাপারে ধর্মগ্রন্থ, ধর্মযাজক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের শক্তিশালী ভূমিকা ছিল। এখনও আছে।

লিঙ্গ-বৈষম্যের সমস্যাটি শুধু পরম্পরাগত ঐতিহাসিক সমস্যা নয়, ধর্মের সংস্কারও নয়। এর সঙ্গে অর্থনীতিরও যোগ আছে। ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস মনে করেন (Frederick Engels 1820—1895, *The Origin of the Family, Private Property and the State*) অতীতে লিঙ্গ-বৈষম্যের সূত্রপাত হয় সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা আসার ফলে। বর্তমানেও অর্থনীতি এবং বাজারের প্রয়োজনে লিঙ্গ-বৈষম্যকে বিজ্ঞাপন, মিডিয়া এবং পণ্যের মাধ্যমে সুদৃঢ় করার প্রক্রিয়া চলছে।

বাণিজ্যিক দুনিয়া কীভাবে লিঙ্গ-ভাবনাকে প্রভাবিত করে এবং বহাল রাখে তা বুঝে নেওয়া দরকার। বাজারে কোন জিনিসের চাহিদা আছে তার ওপর তরুণ-প্রজন্মের সিদ্ধান্ত অনেকাংশে নির্ভর করে। যেমন অধুনা সকলেই যেন চায় আই.টি. বা ইনফরমেশন টেকনোলজির একটি কোর্স করতে—স্নাতক স্তরে দর্শনের বিদ্যার্থী দুর্লভ। এর কারণ এই নয় যে দর্শন জীবনের কোনো কাজে লাগে না, বা বিষয়টা নীরস। এর প্রধান কারণ এই যে দর্শনের ডিগ্রির মূল্য কর্ম-নিযুক্তির ক্ষেত্রে খুব একটা নেই। ঠিক তেমনি, লিঙ্গ-সাম্যের কথা বললে যদি উৎপাদকদের অসুবিধা হয় তাহলে সাম্যের সপক্ষে প্রচার করা হবে না। অথবা খুব নিপুণভাবে লিঙ্গ-সাম্যের নামে লিঙ্গ-বৈষম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলবে। বিজ্ঞাপনের জগতে বাক্যের আপাত-অর্থ আর প্রকৃত-অর্থের এমন প্রভেদ রাখাটা একটি বহুলপ্রচলিত কৌশল।

বাজার তৈরি হয় কিছু ক্রেতা আর বিক্রেতা নিয়ে। সেই সঙ্গে থাকে পণ্য। ক্রেতা, বিক্রেতা আর পণ্য এই তিন মিলেও অবশ্য আমাদের চিন্তনের জগৎকে

Scanned with

সম্পূর্ণ বশীভূত করতে পারে না। অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে রাজনীতি, দণ্ডবিধি ও সামরিক ক্ষমতার দাপট। বাজার দখল করতে গেলে ছলে-বলে-কৌশলে নিজের আধিপত্য অপরের ওপর চাপাতে হয়, এও এক ধরনের রাজনীতি। তেমনি লিঙ্গ-বৈষম্য সহ্য করার জন্য প্রচার মাধ্যম কৃত্রিম চাহিদা সৃষ্টি করতে পারে। এবং প্রচারের জোর থাকলে অন্যান্য কৌশলের মাধ্যমে ব্যক্তির সিদ্ধান্তকে নিয়ন্ত্রিতও করতে পারে।

অর্থনীতির মতো মনস্তত্ত্বের সঙ্গেও লিঙ্গ-ভাবনার একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। কোন মানসিকতায় মানুষ নৈরাশ্যের শিকার হয় বা অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে বা নিজের স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠা করতে চায় না সেটাও ভেবে দেখার বিষয়। অপরের আচরণে, সম্বোধনে, ইঙ্গিতে বা উপেক্ষায় অস্বস্তি বোধ করলে বা অপমানিত বোধ করলে নারী নীরব থাকে কেন? সে প্রতিবাদ করে না কেন? তা কি করুণায়, নাকি ভয়ে, নাকি লজ্জায়? অথবা এমনও কি হতে পারে যে অপরের আচরণে তার মিশ্র-প্রতিক্রিয়া হয়, সে এমন সম্বোধনে যুগপৎ আহত এবং তৃপ্ত হয়? সে আহত হয় যখন তাকে নিছকই যৌনসঙ্গীরূপে দেখা হয়; আবার একই সঙ্গে তার শ্লাঘা বোধ হয় যখন সে মনে করে যে অপরাপর প্রতিযোগী নারীদের মধ্যে তারই প্রতি বিশেষ করে নজর দেওয়া হচ্ছে।

নারী ও পুরুষের সম্পর্কের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়া দুরূহ, সহজে বলে দেওয়া যায় না যে কোন প্রতিক্রিয়াটি ভয়ের প্রকাশ, কোনটি কল্পনা-প্রসূত আর কোনটাই বা কৃত্রিম। ঠিক যেমন বলা যায় না যে আমাদের ভাবনার কতটা স্বকীয় আর কতটা পরিবেশ-সঞ্জাত।

মনস্তাত্ত্বিক বিচারের সঙ্গে যখন ঔচিত্য-অনৌচিত্যের প্রশ্ন যুক্ত হয় অথবা যখন বিচার করতে বসি কোন প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক এবং কোনটি অস্বাভাবিক, বা কোন প্রতিক্রিয়া পরিণত এবং কোনটি অপরিণত বুদ্ধির পরিচায়ক তখন সমস্যাটি আরো জট পাকায়। লিঙ্গ-বৈষম্যের প্রশ্ন তখন আর ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি এবং মনস্তত্ত্বের মধ্যে সীমায়িত থাকে না। নৈতিক প্রশ্ন যুক্ত হয়ে লিঙ্গ-ভাবনার সমস্যাটি নতুন মাত্রা পায়, বহু নতুন বিতর্ক ওঠে। তবে কি নারী আর পুরুষ দুটি পৃথক বর্গ, যাদের নৈতিক আদর্শ ভিন্ন? নাকি নারী ও পুরুষের জৈবিক পার্থক্য সত্ত্বেও যেহেতু তারা উভয়েই মানুষ তাই তাদের জীবনের নৈতিক লক্ষ্যও এক? লিঙ্গ-পরিচয়কে ঘিরে নীতিশাস্ত্রের আরো অনেক বিতর্কেরই অবতারণা করা যেতে পারে।

লিঙ্গ-সমস্যার একাধিক মাত্রা থাকায় কোনো একটি শাস্ত্রের চৌহদ্দির মধ্যে এই সমস্যার পূর্ণাঙ্গ বিচার সম্ভব নয়। তাই একটি নতুন ইন্টারডিসিপ্লিনারি শাস্ত্রের প্রয়োজন হল। লিঙ্গ-সমস্যার আলোচনা করা হয় যে শাস্ত্রের মাধ্যমে সেটি নিতান্তই অর্বাচীন—শাস্ত্রটির নাম মানবীবিদ্যাচর্চা। শাস্ত্রটি প্রকৃত অর্থেই ইন্টারডিসিপ্লিনারি, অর্থাৎ মানবীবিদ্যা হল একাধিক ডিসিপ্লিন বা শাস্ত্রের সম্মিলিত প্রয়োগের ফসল।

লিঙ্গ-পরিচয় বিচারকে উপলক্ষ্য করে বুঝে নিতে হয় কেমন করে অর্থনীতি, রাজনীতি, ইতিহাস, মনস্তত্ত্ব, নৈতিকতা অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। মানবীবিদ্যার অনুষঙ্গে একটি শাস্ত্র অপর শাস্ত্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত, প্রত্যেকটি শাস্ত্র অপর প্রতিটি শাস্ত্রের সঙ্গে দৃঢ়-সংবদ্ধ। যোগসূত্রটি আলগা হলে অর্থনীতি, রাজনীতি, ইত্যাদির প্রশ্ন না তুলে লিঙ্গ-সমস্যার ইতিহাস বিচ্ছিন্নভাবে অনুসন্ধান করা যেত, বা তার নৈতিকতাও আলোচনা করা যেত।

মানবীবিদ্যা যেহেতু একটি অখণ্ড অভিজ্ঞতাকে বুঝবার চেষ্টা করে সেহেতু এক-একটি শাস্ত্রের নিজস্ব সীমানার প্রাচীর তুলে দিলে অভিজ্ঞতার সমগ্রতাকে কৃত্রিমভাবে খণ্ডিত করা হবে। এর ফলস্বরূপ লিঙ্গ-বৈষম্যের ব্যাখ্যাও বিঘ্নিত হবে। আমাদের জীবনযাপনের বিবিধ বৈষম্য সৃষ্টিকারী দিক কীভাবে একে অপরের সঙ্গে গ্রথিত হয়ে একটা পিতৃতান্ত্রিক জীবনযাপনের পরিমণ্ডল (patriarchal form of life) রচনা করে তা বোঝা যাবে না। প্রতিটি শাস্ত্র মানুষের 'ফর্ম অব লাইফ' বা জীবনযাপনের পরিমণ্ডল থেকেই উদ্ভূত। এই 'ফর্ম অব লাইফ'-এর মানচিত্র কিন্তু খণ্ড-খণ্ড অসংলগ্ন ভাগে বিভক্ত নয়। তেমনি জীবন-যাপনের পরিমণ্ডলটি নিছক তাত্ত্বিকও নয়, নিছক প্রায়োগিকও নয়—সেখানে তত্ত্ব আর প্রয়োগের মধ্যে একটা আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে।

মানবীবিদ্যা নিছক একটা ইন্টারডিসিপ্লিনারি শাস্ত্র নয়। এই বিদ্যা চর্চার ফলে আশা করা হয় যে প্রতিটি শাস্ত্র তার স্বক্ষেত্রে লিঙ্গের প্রেক্ষিত থেকে বিচার করবে। একটি শাস্ত্রে লিঙ্গ-প্রেক্ষিত যুক্ত হওয়ার অর্থ হল শাস্ত্রটি একাধিক শাস্ত্রের নিরিখে তাদের উপপাদ্যগুলিকে বিচার করবে। যেমন ইতিহাস পড়াতে গিয়ে শুধু 'হিজ-স্টোরি' পড়ালে চলবে না, 'হার-স্টোরি'ও বলতে হবে; এই দুটি 'স্টোরির' তুলনামূলক বিচার করতে হবে।

তেমনি, নির্বিচারে সুয়োরানি আর দুয়োরানির গল্প বলে গেলে হবে না। সেইসঙ্গে

Scanned with

বহুবিবাহ প্রথা এবং রানিদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের কারণও বিশ্লেষণ করতে হবে। সুয়োরানি বা দুয়োরানির প্রতিতুলনায় সুয়ো-রাজা বা দুয়ো-রাজার মতো চরিত্র কেন রূপকথায় কল্পনা করা হয়নি তাও বিচার করা যেতে পারে। 'সুয়ো'-র অর্থ পতিপ্রিয়া আর 'দুয়ো' হল তার বিপরীত। অনুসন্ধান করতে হবে, যে নারীর বহুপতি আছে—যেমন দ্রৌপদী—তার কি কখনো প্রিয় বা অপ্রিয় ভেদে পতিদের সঙ্গে বিভেদমূলক আচরণের সুযোগ আছে? সুয়োরানি-দুয়োরানির এই আপাত-নির্দোষ গল্পটি হয়তো আমাদের অনেকের শৈশব কল্পনাকে সমৃদ্ধ করেছে। এখন লিঙ্গ-বৈষম্যের নিরিখে—মনস্তত্ত্ব, নৈতিকতা, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজবিজ্ঞানের নিরিখ যুক্ত করে—রূপকথাটিকে 'ইনটিগ্রেটেড' (integrated) বা সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে হবে।

শুধু ইতিহাস বা সাহিত্য নয়, দর্শনচর্চার ক্ষেত্রেও নারীবাদীদের প্রভাবে আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নারীবাদী দর্শন-পাঠের বৈশিষ্ট্য হল লিঙ্গ-ভাবনার নিরিখে দর্শনের নতুন পাঠ। নারীবাদী দর্শনের প্রথম পর্বে অতীতের দার্শনিকদের লেখা পড়ে লিঙ্গ-বৈষম্যকারী উচ্চারণ চিহ্নিত করার চেষ্টা হয়েছিল। পরপর কয়েকটি উদ্ধৃতির সাহায্যে এই জাতীয় উক্তির নমুনা দেওয়া সম্ভবপর হবে।

প্লেটোর (Plato c. 428—347 B.C.) 'রিপাব্লিক' গ্রন্থে, যেখানে ভবিষ্যৎ অভিভাবকের প্রাথমিক শিক্ষার রূপরেখা দেওয়া আছে, সেখানে প্লেটো বলছেন যে এই শিক্ষানবিসদের নারীর ভূমিকা অনুকরণ করতে দেওয়া উচিত নয়, সে নারী বয়স্কই হোক বা অল্পবয়সী হোক। যে নারী স্বামীর নিন্দা করে তাকে অনুকরণ করা অনুচিত বা যে নারী সুখের বড়াই করে বলে যে তার সুখ দেবতাদের তুল্য বা যে নারী দুঃখে বিহ্বল বা দুর্ভাগ্যহত কিংবা প্রেমাসক্ত অথবা অসুস্থ বা যে গর্ভযন্ত্রণা অনুভব করছে তাকেও অনুকরণ করা উচিত নয়। প্লেটো বলছেন "So these charges of ours, who are to grow up into men of worth, will not be allowed to enact the part of a woman, old or young, railing against her husband, or boasting of a happiness which she imagines can rival the gods or overwhelm with grief and misfortune, much less a woman in love or sick, or in labour."[৩]

তা হলে প্রশ্ন ওঠে, আনন্দ-বেদনা, প্রেম, সন্তানধারণ, ইত্যাদি অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাগুলি কি একান্ত মেয়েলি? অতএব তারা কি শিক্ষণীয় নয়? এভাবে মানব-

অভিজ্ঞতাকে ভাগ করে নিলে তো আমাদের জীবনযাপনের পরিমণ্ডলের একটা বড় অংশই অনবহিত থেকে যাবে। বলা বাহুল্য, যা অবধানযোগ্য নয় তার কোনো গুরুত্বই নেই। মেয়েদের জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা এইভাবে গৌণ হয়ে যাওয়ার ফলে তার ইতিহাস, তার মূল্য, তার প্রাসঙ্গিকতা সবই তখন দর্শনের দ্বারা উপেক্ষিত হয়। উপেক্ষিত হতে হতে কালক্রমে এই অভিজ্ঞতা-সংক্রান্ত সমস্যাগুলিও দার্শনিকদের কাছে আর দৃশ্যমান থাকে না।

অনুরূপভাবে অ্যারিস্টটলের (Aristotle c. 384—322 B.C.) লেখার মধ্যেও লিঙ্গ-বৈষম্যসূচক উক্তি পাওয়া যায়। তিনি তাঁর 'পলিটিক্স' গ্রন্থে লিখেছেন যে মুক্ত-পুরুষ ও ক্রীতদাস, পুরুষ ও মহিলা, প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশু সকলেরই মনের (soul) বিভিন্ন অংশ আছে, তাদের যৌক্তিক নিয়ামক অংশ আছে এবং অযৌক্তিক নিয়ন্ত্রিত অংশও আছে; কিন্তু বিভিন্ন জনের মধ্যে তা বিভিন্ন ভাবে আছে। যেমন দাস-এর বিচার-ক্ষমতা নেই, মেয়েদের বিচার-ক্ষমতা থাকলেও তার কোনো কর্তৃত্ব নেই, এবং সে কোনো স্পষ্ট সিদ্ধান্তে আসতে পারে না। আর শিশুদের বিচার-ক্ষমতা অত্যন্ত অপরিণত অবস্থায় থাকে। "All these persons [free man and slave, male and female, adult and child] possess in common the different parts of the soul [namely, the rational/ruling and the irrational/ruled elements]; but they possess them in different ways. The slave is entirely without the faculty of deliberation; the female indeed possesses it, but in a form which remains inconclusive [*akuron*, lacking in authority]; and if children also possess it, it is only in an immature form."[৪]

অথচ এই অ্যারিস্টটলকে দর্শনের ইতিহাসে সাম্যের প্রবক্তা রূপেই স্মরণ করা হয়। তার কারণ হিসেবে বলা হয় যে তিনি সব মানুষের মধ্যে র‍্যাশনালিটি, রূপ-অনুগত সামান্য ধর্ম স্বীকার করেছেন। র‍্যাশনাল হয়েও যে নর ও নারী, প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশু, প্রভু ও দাস-এর যুক্তি ব্যবহারের ক্ষমতা স্বতন্ত্র অ্যারিস্টটলের এই মন্তব্য তেমন গুরুত্ব পায় না।

ঠিক একইভাবে ইম্যানুয়েল কান্টের লেখায়ও আমরা নির্বাচিত অংশগুলি পড়ি। তাঁর তিনটি 'ক্রিটিক' (*Critique*) খুব সযত্নে পড়া হয় কিন্তু তাঁর 'অবজারভেশন্স অন দা ফিলিং অব দা বিউটিফুল অ্যান্ড সাবলাইম' (*Observations on the Feeling of*

Scanned with

the Beautiful and Sublime) তেমন মনোযোগ আকর্ষণ করে না। এই বইটিতে তিনি লিখছেন : মেয়েদের কোনো উচ্চ দর্শন নেই, তারা ভীরু, তারা গুরুত্বপূর্ণ কাজের অযোগ্য, ইত্যাদি, এর জন্য তাদের লজ্জাও নেই। নারী সুন্দর, সে মুগ্ধ করে এবং সেটাই যথেষ্ট।

'A woman is embarrassed little that she does not possess certain high insights, that she is timid, and not fit for serious employments, and so forth; she is beautiful and captivates, and that is enough'[৫]। অর্থাৎ দায়িত্বপূর্ণ কার্যক্ষেত্রে তার অক্ষমতার জন্য নারী কুণ্ঠিত নয়।

যে কান্ট ক্যাটেগরিকাল ইম্প্যারেটিভ (categorical imperative) বা নিঃশর্ত আদেশ অনুসারে সকলকে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছেন এবং বলেছেন প্রত্যেক মানুষকে তার যুক্তিবাদী বৌদ্ধিক ক্ষমতার জন্য যথাযথ মর্যাদা দেখাতে হবে তিনিই আবার মহিলাদের সম্বন্ধে তাঁর 'অবসারভেন্স অন দা ফিলিং অব দা বিউটিফুল অ্যান্ড সাবলাইম' গ্রন্থে লিখছেন যে মেয়েদের জ্যামিতি শিখে কাজ নেই, তার 'পর্যাপ্ত যুক্তি' বা 'মোনাড' বিষয়ে ঠিক ততটুকু জানলেই হবে যতটুকু জানলে পুরুষদের সেনসার করা নীরস বিদ্রূপের মূল বিষয়টা সে অনুধাবন করতে পারে। দেকার্তের তত্ত্ব তাদের কষ্ট করে না বুঝলেও চলবে।

''A woman therefore will learn no geometry; of the principle of sufficient reason or the monads she will know only so much as is needed to perceive the salt in a satire which the insipid guilts of our sex have censured. The fair can leave Descartes his vortices to whirl for ever without troubling themselves about them,...''[৬]

কান্টের এই বইটি মেরি ওলস্টনক্রাফ্টের 'এ ভিন্ডিকেশন অব দা রাইটস অব ওমান'-এর (১৭৯২) মাত্র আঠাশ বছর আগে (১৭৬৪) লেখা। কান্ট যদি অষ্টাদশ শতকে বলতে পারেন মেয়েদের জ্যামিতি পড়ে কাজ নেই এবং দেকার্তের গূঢ় দার্শনিক তত্ত্ব না বুঝলেও তাদের চলবে তাহলে আর দু-তিন হাজার বছর আগেকার মনুর ওপর দোষারোপ করে কী হবে।

দেখা যাচ্ছে প্লেটো, অ্যারিস্টটল, কান্ট এবং আরো অনেক পাশ্চাত্য দার্শনিক মহিলাদের তাচ্ছিল্য করলেও এই দার্শনিক অবস্থানগুলিকে অগ্রাহ্য করা হয়নি। এমনকি নারীবাদী দার্শনিকদের একাংশ এঁদের দর্শন-ভাবনা অনুসরণ করতেও প্রস্তুত।

সাম্প্রতিককালে মার্থা ন্যুসবম (Martha Nussbaum) সগর্বে ঘোষণা করেন যে তিনি নারীবাদী এবং তিনি অ্যারিস্টটলপন্থী। নারীবাদী দর্শনের প্রথমপর্বে ১৯৭০ নাগাদ যে কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল ধীরে ধীরে তার পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন দেখা গেল।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০০০-এ প্রকাশিত সংকলন-গ্রন্থ 'দা কেম্ব্রিজ কমপ্যানিয়ান টু ফেমিনিজম ইন ফিলজফি'তে দর্শনের ইতিহাস নিয়ে নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা সমালোচনামূলক প্রবন্ধ পাওয়া যায়। এই সংকলন থেকে স্পষ্ট হয় যে নারীবাদ মানে শুধু কোন দার্শনিক কোথায় মেয়েদের সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করেছেন তার সমালোচনা করা নয়। পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে যে এই উক্তিগুলির মূলে কতখানি তদানীন্তন আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রভাব রয়েছে এবং কতখানি সুচিন্তিত বিচার রয়েছে। ন্যুসবম যেমন মনে করেন যে অ্যারিস্টটলের নারী-বিদ্বেষ তাঁর দর্শনের মূল বক্তব্যের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। নারী এবং দাস সম্পর্কে অ্যারিস্টটল যা বলেছেন তা না বললেও তাঁর মূল প্রতিপাদ্য অক্ষুণ্ণ থেকে যায়। ন্যুসবম-এর মতে নারীবাদী দার্শনিককে অনেকটা যেন পরমহংসের মতো 'পুরুষশ্রেষ্ঠ-মতবাদী' দার্শনিকদের সার বক্তব্যটা চয়ন করে অপ্রধান বিষয়গুলি বর্জন করতে হবে।

কোনো কোনো নারীবাদী দার্শনিক কান্টের দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছেন। কান্টের প্রতি কিছুটা সদয় হয়ে বলা যায় যে মানুষমাত্রই বদলায়। কান্ট 'অবসারভেশন্স অন দা ফিলিং অব দা বিউটিফুল অ্যান্ড সাবলাইম' লিখেছেন তাঁর তথাকথিত প্রি-ক্রিটিকাল পিরিয়ডে (pre-critical period) বা স-বিচার দর্শনের পর্বের পূর্বে, পরবর্তীকালে লেখা তাঁর 'ক্রিটিক'গুলিতে এ জাতীয় লিঙ্গ-বৈষম্যকারী উক্তি পাওয়া যায় না।

যে নারীবাদীরা ধ্রুপদী দর্শনের পরম্পরার মধ্যে থেকে লিঙ্গ-বৈষম্য দূর করতে চান তাঁরা মনে করেন যে দর্শনের নিজস্ব কোনো লিঙ্গ-পক্ষপাত নেই। ভ্রম বা অজ্ঞতাবশত দর্শন যদি লিঙ্গ-পক্ষপাতের সাধনরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তবে তা দর্শনের নিজস্ব ত্রুটি নয়, সেটা যিনি দর্শনকে কাজে লাগাচ্ছেন তাঁর লিঙ্গ-পক্ষপাতের ফল। এ সব ক্ষেত্রে দর্শনকে তার লিঙ্গ-অনপেক্ষ অবস্থানের মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে হবে।

পাশাপাশি, নারীর অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে মূলস্রোতের দর্শনচর্চার বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে ইম্যানুয়েল কান্ট ও জন স্টুয়ার্ট মিলের সময় নীতিশাস্ত্রের আওতায় 'আবর্শন' (abortion)-এর

Scanned with

মতো বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল না, বা ক্লোনিং (cloning)-এর সঙ্গে মাতৃত্বের অধিকারের রূপান্তরজনিত নৈতিক সমস্যার আলোচনা হত না।

লিঙ্গ-রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নতুন নতুন বিষয়গুলিকে একে একে ধ্রুপদী দর্শনের নিরিখে বিচার করার প্রস্তাব নারীবাদীরা রাখলেন। যেমন মনে করা হল মিলের সর্বজনীন সুখবাদের সঙ্গে 'অ্যাবর্শন'-এর বিরোধ আছে কিনা আলোচনা করা যায়। অথবা আলোচনা করা যেতে পারে যে 'অ্যাবর্শন' সমর্থন করলে কান্টের ক্যাটেগরিকাল ইম্প্যারেটিভকে অমান্য করা হয় কি না। এই নারীবাদীরা মনে করেন যে ধ্রুপদী দার্শনিকরা হয়ত অনবধানবশত লিঙ্গ-সাম্যের কথা ভাবেননি, তাই বলে ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁরা লিঙ্গ-বৈষম্যের প্রবক্তাও নন।

কোনো একটি প্রতিষ্ঠিত দার্শনিক তত্ত্ব-কাঠামোর মধ্যে যদি নারীর অভিজ্ঞতা-প্রসূত কোনো সমস্যাকে ব্যাখ্যা করা না যায় তবে বুঝতে হবে যে সেই বিশেষ সমস্যাটি দর্শন-বহির্ভূত। অবশ্য সব নারীবাদী এই রায় মানতে সম্মত নন। অনেকের মতে, মানুষের সকল অভিজ্ঞতাই দার্শনিক ব্যাখ্যার দাবি রাখে—সে অভিজ্ঞতা যতই ব্যক্তিগত হোক বা যতই শৈল্পিক হোক। দর্শনের প্রচলিত চিন্তা-কাঠামোর মধ্যে কোনো সমস্যার স্থান না হলে বুঝতে হবে যে কাঠামোটিই অপূর্ণ; সমস্যাটি যে দার্শনিক ব্যাখ্যার অযোগ্য তা ভাবাটা অনুচিত হবে। একটি উপেক্ষিত অভিজ্ঞতাকে প্রতিষ্ঠিত চিন্তা-কাঠামোর আওতায় আনতে না পারলে কাঠামোটিকে সম্প্রসারিত করতে হবে।

'দর্শন' শব্দের আক্ষরিক অর্থ প্রদর্শক ও বোধক। এই অর্থে মানুষের চর্চা ও মননের সবটাই দর্শনের বিষয় হওয়া উচিত। নারীবাদী দার্শনিকরা দর্শনকে বিমূর্ত ধারণার domain বা কোটিতে সীমাবদ্ধ রাখার পক্ষপাতী নন। শুধু যে তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে একটা যোগ তাঁরা দেখতে পান তা নয়, তত্ত্ব আর তথ্যের মধ্যেও একটা সম্পর্ক আছে বলে তাঁরা মনে করেন। তাঁদের মতে দর্শন দেশ-কাল অনপেক্ষ একটি বিশুদ্ধ চর্চা নয়। দর্শন যদি প্রদর্শক ও বোধক হয় তবে তা আমাদের তাবৎ অভিজ্ঞতার প্রদর্শক ও বোধক হওয়া উচিত, কেবলমাত্র প্রজ্ঞার নয়। এর ফলে দর্শনের ধ্রুপদী দ্যোতনা আর থাকে না, বলা যাবে না যে দর্শন হলো 'তত্ত্বজ্ঞানসাধন শাস্ত্র'। দর্শনচর্চায় তত্ত্বের অনুষঙ্গে প্রয়োগ তথা তত্ত্ব এবং প্রয়োগ দুই-এর অনুষঙ্গে ক্ষমতার প্রতিপত্তি ও তার বৈধতা নিয়ে আলোচনা করাটা জরুরি। সেই সঙ্গে মানুষের

আশা-আকাঙ্ক্ষার মূল্যায়ন ও তা সফল করার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনাও নারীবাদী দর্শনের আওতায় পড়ে।

নারীবাদী-দর্শন কিন্তু শুধু নারীর সমস্যা নিয়েই আলোচনা করে না। এটি দর্শনের একটি বিশেষ শাখা নয়। দর্শনের যাবতীয় শাখা—অধিবিদ্যা, তর্কশাস্ত্র, জ্ঞানতত্ত্ব ইত্যাদি—সবই নারীবাদী দর্শনের আলোচ্য বিষয়। নারীবাদীরা মনে করেন নারী ও পুরুষের যাপিত অভিজ্ঞতা লিঙ্গ-অবস্থানের দ্বারা প্রভাবিত হতে বাধ্য—ফলে দর্শনের প্রতিটি শাখায় লিঙ্গের প্রেক্ষিত আছে এটা মেনে নিয়ে দর্শনচর্চা করাটা বাস্তবানুগ এবং সমীচীন। যদি কেউ দাবি করে যে সে লিঙ্গ-অনপেক্ষ নৈর্ব্যক্তিক অবস্থান থেকে দর্শনচর্চা করছে তাহলে সেই অবস্থানটিকেও পরোক্ষভাবে একটি লিঙ্গ-সাপেক্ষ প্রেক্ষিত বলে গণ্য করা হবে। তার মানে লিঙ্গ-প্রেক্ষিত অস্বীকার করাটাও প্রকারান্তরে লিঙ্গ-সাপেক্ষ প্রেক্ষিত। এই মতটি বিশেষ করে উত্তর-আধুনিক (post-modern) নারীবাদীদের মত।

নারীবাদী প্রেক্ষিত বনাম পুরুষবাদী প্রেক্ষিত, এরকম কোনো দ্বিকোটিক বিভাজন করাটা এখানে উদ্দেশ্য নয়। দর্শনের মূলস্রোতে যে অবস্থানটিকে লিঙ্গ-অনপেক্ষ 'মানুষের' প্রেক্ষিত বলে চিহ্নিত করা হয় প্রকৃতপক্ষে সেই প্রেক্ষিতটি একতরফা, পুরুষের চোখ দিয়ে যেন 'মানুষ'কে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। তার অর্থ অবশ্যই এই নয় যে এবার মেয়েদের চোখ দিয়ে দেখা হোক এই প্রস্তাব করা হচ্ছে। প্রস্তাবটি হল 'মানুষ' বলতে যেন শুধু পুরুষমানুষ না বোঝায়—যদিও এতদিন তা-ই হয়ে এসেছে।

নারীবাদী দর্শনের কাজ এ ক্ষেত্রে দ্বিবিধ। প্রথমত, দর্শনের আদিযুগ থেকে আজ অবধি কোথায় কীভাবে লিঙ্গ-অনপেক্ষতার আড়ালে লিঙ্গ-সাপেক্ষ প্রেক্ষিত কাজ করছে তা দেখানো। দ্বিতীয়ত, লিঙ্গ-সাম্য বজায় রেখে যদি দর্শনচর্চা করতে হয় তবে সেই দর্শন কেমন হবে তার একটা দিক-নির্দেশ করা। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে প্রথম কাজটি সমালোচনাত্মক, আর দ্বিতীয়টি নির্মাণাত্মক।

দর্শনচর্চার ক্ষেত্রে সর্বদা যা হয় নারীবাদী দর্শনের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি—নারীবাদী দর্শনও বহুবিধ। ধ্রুপদী দর্শনে কোথায় এবং কীজাতীয় লিঙ্গ-বৈষম্য রয়েছে সে বিষয়ে একাধিক মত পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে, নারীবাদী দর্শন নির্মাণের প্রকল্পও বিবিধ। দর্শনের মূল ধারায় বিভিন্ন ঘরানা যখন গড়ে উঠেছে এবং

Scanned with

প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে তখন বিশুদ্ধ তত্ত্বের তাগিদেই একমাত্র তা ঘটেনি, তার সঙ্গে একটা জীবনবোধও যুক্ত ছিল। কোনো একটি দার্শনিক অবস্থানকে প্রাধান্য দেওয়ার অর্থই হল অপরাপর অবস্থানকে তার তুলনায় অকিঞ্চিৎকর বলে গণ্য করা। ইচ্ছে করলেই এরকম একটা তারতম্য বজায় রাখা যায় না, এটা বহাল রাখার জন্য ক্ষমতা থাকা চাই। যেখানেই ক্ষমতার রেষারেষি সেখানেই কোনো না কোনো ভাবে রাজনীতি এসে পড়ে। দর্শনের মূলস্রোতে যে রাজনীতি কাজ করে চলেছে তাকে চিনে নেওয়া ও লিঙ্গ-সাম্য প্রতিষ্ঠার সপক্ষে একটা পাল্টা রাজনীতি প্রয়োগ করাটা নারীবাদী দর্শনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

মূলস্রোতের দর্শন-ভাবনায় ঘোষিতভাবে সর্বপ্রকার রাজনীতির সংস্রব বর্জনের আদর্শ অনুসরণ করা হয়। নারীবাদীরা মনে করেন যে স্থূল অথবা সূক্ষ্মভাবে তাত্ত্বিক আলোচনাতে রাজনীতি বর্তমান। ফলে কে কোন পক্ষের সমর্থনে আলোচনা করছে সেটা বলে নিয়েই দর্শনের বিতর্ক শুরু করা উচিত। এককথায় বলা যায় যে নারীবাদী দর্শন মাত্রই রাজনৈতিক অবস্থান-সংলগ্ন। এই দর্শনের সঙ্গে সক্রিয় রাজনীতির প্রত্যক্ষ যোগ আছে, বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে আন্দোলনের প্রয়োজনেই নারীবাদীরা তত্ত্ব তথা দর্শনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তাঁরা মনে করেছিলেন প্রয়োগ আর তত্ত্বকে (practice and theory) সমন্বিত করা দরকার।

দীর্ঘদিনের আন্দোলনের অভিজ্ঞতা তাঁদের শিখিয়েছিল যে প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক তত্ত্ব-কাঠামোর প্রতি আনুগত্য বজায় রেখে নারী-আন্দোলন থেকে কোনো দীর্ঘমেয়াদি সুরাহা পাওয়া যাবে না। লিঙ্গ-সাম্য অর্জন করতে হলে বিচ্ছিন্নভাবে মানুষের আচরণে পরিবর্তন আনা যাবে না। কারণ লিঙ্গ-বৈষম্য কায়েম থাকার পেছনে রয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন।

পরিবার-ধর্ম-আইন-শিক্ষা সবেরই একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ আছে, আর এই প্রতিষ্ঠানগুলি একপেশে। লিঙ্গ-সাম্য আনতে হলে প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কার প্রয়োজন। এই সংস্কারের দিকে মনোযোগ দিলে বোঝা যায় যে প্রতিষ্ঠানগুলি দাঁড়িয়ে আছে ন্যায়/অন্যায়, সঠিক/ভ্রান্ত, সত্য/মিথ্যা বিষয়ে কতকগুলি নির্দিষ্ট বিচারের ওপর। আমাদের বিচারের মধ্যেই লিঙ্গ-পক্ষপাত রয়েছে। এর দ্বারা প্রতিষ্ঠানগুলি সংক্রামিত হয়, আর প্রতিষ্ঠানের মদতপুষ্ট দৈনন্দিন আচরণেও লিঙ্গ-সাম্য উপেক্ষিত হয় বা স্পষ্টত লিঙ্গ-বৈষম্য ঘটতে থাকে।

লিঙ্গ-সমস্যা একটি ত্রিমাত্রিক সমস্যা। চর্যা তার একটি মাত্রা, প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন তার আর একটি মাত্রা এবং এই দুই-এর আড়ালে কাজ করে চলে ধারণার রাজ্য—যা কিনা সমস্যাটির তৃতীয় মাত্রা। মানবীবিদ্যাচর্চায় এই তিন মাত্রার সমন্বয়কে বুঝে নিতে হয় বলেই ধ্রুপদী দর্শনচর্চা থেকে নারীবাদী দর্শনচর্চা এত ভিন্ন।

নারীবাদী দর্শনের কোনো সমরূপ না থাকলেও মোটামুটিভাবে নারীবাদী দর্শনকে লিবারাল ও র‍্যাডিকাল এই দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। এঁরা সকলেই লিঙ্গ-সমস্যার ত্রিমাত্রিকতা স্বীকার করেন। এই তিনটি মাত্রার ব্যাখ্যা ও সেগুলির শোধন সম্বন্ধে তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। যে কোনো নারীবাদী দর্শনের আলোচনায় প্রবেশ করার আগে যেমন যৌন-পরিচয় ও লিঙ্গ-পরিচয়ের পার্থক্য কী তা জেনে নেওয়া দরকার তেমনি জরুরি হল লিবারাল নারীবাদ ও র‍্যাডিকাল নারীবাদের পার্থক্য বোঝা।

PY 9460

দর্শনের মূল স্রোতে যখন অভিজ্ঞতাবাদী দর্শন, যুক্তিবাদী দর্শন এইরূপ ভাগ করা হয় তখন এই দার্শনিকদের রাজনৈতিক অবস্থানগুলি স্পষ্ট হয় না। নারীবাদী দার্শনিকরা যেহেতু একটা ঘোষিত রাজনৈতিক অবস্থান থেকে দর্শনচর্চা করেন তাই তাঁদের ক্ষেত্রে যুক্তিবাদী/অভিজ্ঞতাবাদী এইরূপ পার্থক্য না করে লিবারাল/র‍্যাডিকাল বিভাজন করলে তাঁদের বক্তব্য বুঝতে সুবিধে হয়।

সূত্র-নির্দেশ

১. "রাজনীতিতে নারী", 'নারী শ্রেণী ও বর্ণ, নিম্নবর্গের নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থান', কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, ম্যানাস্ক্রিপ্ট ইন্ডিয়া, হাওড়া, ২০০০, পৃ. ১২৬-৭.

২. *Towards Equality : Report of the Committee on the Status of Women in India*, Government of India, Department of Social Welfare, Ministry of Education and Social Welfare, December 1974, p. 238.

৩. *The Republic of Plato*, trans. Francis Macdonald Cornford, Oxford University Press, London, 1969, III. 395.

৪. *Politics*, Aristotle, I. 1260a 10.

৫. *Observations on the Feelings of the Beautiful and Sublime*, Immanuel Kant, trans. John J. Goldthwait, University of California Press, 1960, p. 93.

৬. *Observations on the Feelings of the Beautiful and Sublime*, p. 79.

JADAVPUR UNIVERSITY LIBRARY

Scanned with

দ্বিতীয় অধ্যায়

ফেমিনিজম: লিবারাল এবং র‍্যাডিকাল

লিবারালিজম (Liberalism) বা উদারতাবাদ এবং র‍্যাডিকালিজম (Radicalism) বা আমূল সংস্কারবাদ উভয়েরই আছে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক অবস্থান। নারীবাদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এমন কিছু বিশেষ সমস্যা যা মূল রাজনৈতিক প্রশ্ন থেকে অন্যতর। নারীবাদে সমাজে মেয়েদের স্টেটাস (অবস্থান) নিয়ে আলোচনা করা হয়। নারীর বর্তমান অবস্থান, তার কার্য-কারণ ব্যাখ্যা, তার অবস্থার পরিবর্তনের সম্ভাবনা এবং অন্তরায় এসবই নারীবাদের আলোচ্য বিষয়। সমস্যার পরিচয় দিতে গিয়ে সব নারীবাদীরা একই কথা বলেন না। লিবারাল ফেমিনিস্টরা সমস্যাটিকে যেভাবে দেখেন র‍্যাডিকাল ফেমিনিস্টরা ঠিক সেভাবে দেখেন না।

লিবারালিজম বলতে শুধু একটি রাজনৈতিক অবস্থান বোঝায় না। এই অবস্থানের সঙ্গে লগ্ন হয়ে আছে এক ধরনের মেটাফিসিক্স বা অধিবিদ্যা এবং জাস্টিসের বিশেষ ধারণা। রাজনীতিতে লিবারালিজম বলতে বোঝায় একপ্রকার ইনডিভিজুয়ালিজম (Individualism) বা স্বাতন্ত্র্যবাদ। ব্যক্তির বিকাশের জন্য রাষ্ট্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য হলেও তার কর্মকাণ্ডের পরিধি যথাসম্ভব সঙ্কুচিত করে রাখার কথা বলা হয়। ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখাটা রাষ্ট্র এবং সমাজের কর্তব্য। ব্যক্তিগত জীবনে রাষ্ট্র যথাসম্ভব নিষ্ক্রিয় থাকবে।

লিবারালিজমে প্রিন্সিপল তথা বিধিনিয়মের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। সমাজকে পরিচালনা করবে কতকগুলি বিধিনিয়ম। সবসময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে বিধিগুলি নিরপেক্ষ হয়। নারী-পুরুষ সকলের জন্য একই বিধিনিয়ম বলবৎ করতে হবে এবং সেগুলি লিঙ্গ-অনপেক্ষ অবশ্যই হবে। নারী ও পুরুষের লিঙ্গ-লাঞ্ছিত পরিচয়কে বাদ দিয়ে তারা কী উপায়ে নিরপেক্ষ বিধায়ক হতে পারে তা ভেবে দেখা দরকার। উদারনৈতিক মত যাঁরা পোষণ করেন তাঁরা মনে করেন যে নারী-পুরুষের লিঙ্গমোচন

সম্ভব নয় কিন্তু লিঙ্গ-উত্তরণ সম্ভব। এটা কী করে সম্ভব বুঝতে গেলে তাঁদের দেওয়া সেক্স এবং জেন্ডার বিষয়ক ব্যাখ্যাটা বুঝে নেওয়া প্রয়োজন, আর সেই সঙ্গে কিছুটা তাদের মেটাফিসিক্স (metaphysics) বা অধিবিদ্যাগত অবস্থানের সঙ্গে পরিচয় থাকাও আবশ্যক।

সাধারণভাবে সেক্স-আইডেনটিটি (sex-identity) বা যৌন-পরিচয় বলতে ব্যক্তির জৈবিক বৃত্তিকেই বোঝায়। নারী ও পুরুষের জৈবিক বৈশিষ্ট্য তিন জাতীয় পরিচয়ে সূচিত হয়ে থাকে। এগুলি হল ক্রোমোজম-এর গঠন, hormonal make-up বা হরমোনের রসায়ন এবং anatomy বা দেহের গঠন।

নারীর জীবকোষে (female cell) কেবলমাত্র X ক্রোমোজম (chromosome) থাকে এবং পুরুষের জীবকোষে X এবং Y দুই প্রকার ক্রোমোজম থাকে।

নারী ও পুরুষের হরমোন এক। ক্রোমোজম-ভেদে একই হরমোন ভিন্ন ভিন্ন রসায়ন সৃষ্টি করে। সব পুরুষের হরমোনের রসায়ন এক নয় আবার সব নারীরও হরমোনের রসায়ন এক নয়। ফলে পার্থক্যটা শুধু নারী ও পুরুষের পার্থক্য নয়, প্রভেদটা ব্যক্তিতে—ব্যক্তিতে দেখা যায়।

নারী-পুরুষের প্রাথমিক যৌনধর্মী পরিচয় (primary sex-linked characteristics) ক্রোমোজমের দ্বারা নিরূপিত হয় এবং দ্বিতীয় স্তরের যৌনধর্মী-পরিচয় (secondary sex-linked characteristics) নির্ধারিত হয় হরমোনের রসায়নের দ্বারা। তৃতীয় পর্যায়ের যৌন পার্থক্য (tertiary sex-linked difference) ঘটে প্রথম দুটি পরিচয়ের ওপর এনভায়রনমেন্ট (environment) বা পরিবেশের প্রভাবের ফলে। অর্থাৎ ক্রোমোজোম, হরমোন ও পরিবেশের মিলিত প্রভাবে স্ত্রী-পুরুষের বৈশিষ্ট্যের কিছু পরিবর্তন দেখা যায়, যেমন মনে করা হয় যে পুরুষ বেশি যুক্তিবাদী—সে গণিত এবং যুক্তিবিদ্যায় পারঙ্গম এবং নারী বেশি সংবেদনশীল (emotional)—গান, ছবি আঁকা এবং সাহিত্যে তার স্বচ্ছন্দ বিচরণ। বা বলা হয় যে পুরুষ কর্তৃত্ব ফলাতে ভালবাসে আর নারী কোনো এক কর্তার অধীনে থাকলে আশ্বস্ত বোধ করে। আবার বলা হয় পুরুষ স্পষ্ট এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে, আর নারী সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে সদাই দ্বিধাচ্ছিন্ন।

পুরুষ আর নারীর গুণগত বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করে একটা তালিকা প্রস্তুত করলে দেখা যাবে পুরুষোচিত গুণ ও নারীসুলভ গুণগুলি সর্বদাই একে অন্যের বিপরীত।

Scanned with

এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কেউ কেউ বলেছেন যে নারী ও পুরুষের জৈবিক গঠনের পার্থক্যের দরুন তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য গড়ে উঠেছে।

আমরা এ পর্যন্ত সেক্স-আইডেনটিটি বা যৌন-স্বরূপের বৈশিষ্ট্যগুলি বলেছি। কিন্তু নারীবাদীরা আর এক ধরনের পরিচয়ের কথাও বলেন, সেটা হল জেন্ডার-আইডেনটিটি (gender identity)। তৃতীয় পর্যায়ের যৌন-পরিচয়ের সঙ্গে জেন্ডার বা লিঙ্গ-পরিচয়ের সাদৃশ্য আছে। যেমন হঠকারিতা/সহনশীলতা, অধিনায়কত্ব/নমনীয়তা, চঞ্চলতা/ধৈর্য—মনে করা হয় এ সবই লিঙ্গ-বৈশিষ্ট্য। ওপরের দ্বিকোটিক বিভাজনের প্রথমোক্ত পরিচয়টি সাধারণত পুরুষের ধর্ম, যেমন হঠকারিতা, অধিনায়কত্ব, চঞ্চলতা, এবং দ্বিতীয় ধর্মগুলি নারীর ধর্ম বলে মনে করা হয়।

জেন্ডার-আইডেনটিটি বলতে কতকগুলি কন্সট্রাকটেড বা সৃজিত ধর্মকেই বোঝায়। সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার পরিবর্তন ঘটে। প্রতিটি সভ্য সমাজ নারী ও পুরুষের কাছে বিশেষ কতকগুলি আচরণ প্রত্যাশা করে। এই আচরণ যারা অনুশীলন করে তাদের 'আদর্শ' নারী এবং 'আদর্শ' পুরুষ রূপে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে—আর এই গুণগুলি যথাক্রমে পুরুষালি গুণ ও মেয়েলি গুণ রূপে গণ্য হয়। সমাজ প্রত্যাশা করলেই যে যেকোনো নারী বা পুরুষ সেইমতো আচরণ করবে তা না-ও হতে পারে। একজন নারী ইচ্ছে করলে পুরুষের গুণের চর্চা করতে পারে অথবা একজন নারীর কাছ থেকে যে চর্যা প্রত্যাশা করা হয় তা একজন পুরুষ অনুকরণ করতে পারে। এর ফলে দেখতে পাওয়া যাবে পুরুষালি নারী ও মেয়েলি পুরুষ। জেন্ডার বা লিঙ্গ পরিচয় সমাজ-আরোপিত বলেই এইরূপ সম্ভব। লিঙ্গ-পরিচয় নারী ও পুরুষের সহজাত ধর্ম হলে এর থেকে এত সহজে নিষ্কৃতি পাওয়ার কথা ভাবা যেত না।

যৌন-স্বরূপকে যদি সহজাত বলা হয় এবং লিঙ্গ-স্বরূপকে যদি সৃজিত বলা হয় তবে প্রশ্ন জাগে: এই দুই স্বরূপের মধ্যে কোনো কার্য-কারণ সম্বন্ধ আছে কিনা? অনেকে মনে করেন যে যৌন-স্বরূপ অনুযায়ী সমাজ লিঙ্গ-ধর্ম নির্মাণ করে থাকে। সংক্ষেপে এই সম্পর্কটিকে বোঝানোর জন্য বলা হয় ('gender is wired into biology')। এখানে একটি বৈদ্যুতিক তারের উপমা ব্যবহার করে যেন বলা হচ্ছে যে লিঙ্গ-পরিচয়ের সূত্র যৌন-পরিচয়ের মধ্যে প্রোথিত রয়েছে। শুধু তাই নয়, এই মত

অনুসারে কার্য-কারণ সম্পর্কে এই অভিমুখের কোনো বিকল্পও কল্পনা করা যায় না। তার কারণ হিসেবে বলা হয় যে anatomy is destiny। এর মানে জন্মসূত্রেই স্থির হয়ে যায় সারাজীবন কোন আচরণ নারীর পক্ষে আদর্শ আচরণ হবে আর কোন্‌টি পুরুষের পক্ষে শোভন। ক্রোমোজোম আর হরমোন দিয়েই যেন নিয়তি নির্ধারিত হয়ে যায়। এই ব্যাখ্যায় আমরা পাই একপ্রকার 'বায়োলজিজম' (biologism) বা জৈবকেন্দ্রিক মতবাদ—জি. ই. ম্যুর হয়তো এখানে একটা 'ন্যাচারালিস্টিক ফ্যালাসি' (naturalistic fallacy) বা প্রকৃতিবাদী অনুপপত্তিরও আভাস পেতেন। কারণ এখানে বলা হচ্ছে 'তুমি যা হয়ে জন্মেছ তোমার জীবনের আদর্শ তাই দিয়েই স্থির হওয়া উচিত।' আমরা যখন বাস্তব অবস্থা থেকে আদর্শ অবস্থাকে পাবার চেষ্টা করি বা আমরা যখন 'is' থেকে 'ought'-এ পৌঁছানোর চেষ্টা করি তখনই এমন ফ্যালাসি বা অনুপপত্তির জন্ম হয়।

কিছু নারীবাদী মনে করেন যে জৈব-স্বরূপকে যখন অস্বীকার করা যায় না তখন এই বাস্তব অবস্থাটা মেনে নিয়েই নারীমুক্তি আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। এইভাবে ভাবা যেতে পারে: নারী আর পুরুষ উভয়ে মিলে সংসার রচনা করে বলে তাদের গুণগুলি কমপ্লিমেনটারি বা পরিপূরক। একের প্রয়োজন অপরকে, কারণ এককভাবে তারা অপূর্ণ এবং খণ্ডিত—যদিও তারা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র এবং অনন্য। এই অবস্থানটি লিবারালও নয় র‍্যাডিকালও নয়, এটি একটি এসেনশিয়ালিস্ট (essentialist) অবস্থান বা অপরিহার্য অবস্থান।

উপরোক্ত মতটি সেকেলে অতএব উপেক্ষণীয় এরকম মনে করার কোনো কারণ নেই। ধর্মযাজকরা এই মত আজও সমর্থন করেন এবং কিছু নারীবাদীও এই মত পোষণ করেন। তাঁরা মনে করেন পুরুষ ও নারীর যৌন-পরিচয় ও লিঙ্গ-পরিচয় পৃথক। শুধু তাই নয়, তাঁরা অনেকে মনে করেন পুরুষ অপেক্ষা নারী অধিকতর গুণান্বিত কারণ নারীর দরদ আছে, ধৈর্য আছে, সে সহনশীল এবং সেবাপরায়ণ। এই গুণগুলি মানুষের ভাল থাকার পক্ষে অপরিহার্য। যুদ্ধ, হানাহানি, আগ্রাসন কখনই সমস্যার সমাধানে সাহায্য করবে না।

ইদানিং অর্থনীতি, রাজনীতি এবং নীতিশাস্ত্রে একটি কথা প্রায়ই শোনা যায়: 'quality of life', অর্থাৎ জীবনের গুণগত মান। জীবনের গুণগত মান বৃদ্ধি করাটাই নৈতিক আদর্শ হওয়া উচিত বলে মনে করা হয়। যে নারীবাদীরা এসেনশিয়াল অবস্থান সমর্থন করেন তাঁরা মনে করেন যে সমাজে নারীসুলভ ধর্মগুলি প্রাধান্য

Scanned with

পেলে এবং নারীর অভ্যস্ত প্রেক্ষিত থেকে মানব সংসারের সমস্যার বিচার করলে বিচার অধিকতর মানবিক হবে। এই নারী-কেন্দ্রিক মতটিকে বলা হয় গাইনোসেনট্রিজম (gynocentrism)। এটি পিতৃতন্ত্রের বিপরীত। নারী-নিসর্গনীতির বা ইকোফেমিনিজম-এর কথা যাঁরা বলেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ নারী-কেন্দ্রিকতার সপক্ষে যুক্তি দেন। এঁরা আরণ্যক সভ্যতায় ফিরে যাওয়ারও কথা বলেন। এটাও বলা হয় যে নারীকে সক্ষম করে তুলতে হলে তার সেবাবৃত্তির প্রচলিত ভূমিকায় সক্রিয় থেকেই তাকে সক্ষম হতে হবে কারণ সেটাই তার শক্তির উৎস।

এমন যুক্তি প্রায়ই শোনা যায় যে অন্দরমহলে থেকেও নারী যথেষ্ট ক্ষমতাশালী হতে পারে। ক্ষমতার স্বাদ পাওয়ার জন্য তার বাইরের জগতে পুরুষের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ করে নেওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রায় সব সমাজেই নারীকে দেওয়া হয় সেই সমাজের নৈতিক আদর্শ পালনের দায়িত্ব। আশা করা হয় নারী ব্যক্তিজীবনে ধর্মের পথে চলবে এবং পরিবারকে ন্যায়ের পথে চালিত করবে। বিপথগামী পুরুষকে ধর্মের পথে ফেরাতে পারে যেন নারী-ই। ফলে সমাজের নৈতিক স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য বিবাহ যেন একটি প্রতিষেধক!

নারীকে নৈতিক পাহারাদারির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলেই পুরুষের ক্ষেত্রে যা দূষণীয় নয় নারীর ক্ষেত্রে সেই আচরণ দূষণীয়। আমাদের শব্দকোষে এমন কতকগুলি শব্দের ব্যবহার আছে যা কেবল মেয়েদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, পুরুষদের ক্ষেত্রে তার কোনো তুল্য প্রয়োগ নেই। 'শ্লীলতাহানি' নারীর হয়, পুরুষের হয় না। 'রক্ষিতা'র কোনো পুংলিঙ্গসূচক শব্দ নেই। এর কোনো প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিতুলনা পুরুষদের জন্য নেই। স্ত্রীর 'সতীন' থাকতে পারে, পুরুষের থাকে না। স্ত্রীলোক 'ডাইনি' হতে পারে, কোনো অনুরূপ ভূমিকা পুরুষের নেই, তেমনি সতীত্ব নারীর-ই ভূষণ।

নারীর ক্ষেত্রে যে ভূমিকাগুলি নিষিদ্ধ বা পাপের, পুরুষের ক্ষেত্রে তা নয়। এর একটা ব্যাখ্যা হতে পারে যে পুরুষকে অনেক বেশি স্বাধীনতা দেওয়া হয়। অথবা আর একটা বিকল্প ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। স্ত্রী-জাতির কাছে আরো অনেক উচ্চ আদর্শ প্রত্যাশা করা হয়। সে জননী, সে লক্ষ্মী, সে সরস্বতী, এবং এমন আরো অনেক কিছু আখ্যায় ভূষিত হয়। এককথায় বলতে গেলে নারী হল দেবীতুল্য।

নারীকে অকলুষিত রাখার জন্য সমাজকে নানা উপায় অবলম্বন করতে হয়েছে, অন্দরমহলের মতো একটা সুরক্ষিত এলাকা রচনা তার অন্যতম। এই মত অনুসারে

নারীবাদের সঙ্গে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না। কারণ রাজনীতির জগৎ সর্বদাই কলুষিত। মনে পড়ে যায় জাঁ-পল সার্ত্রে-র (Jean-Paul Sartre 1905—1980) বিখ্যাত নাটক *Dirty Hands*-এর কথা। সেখানে নায়ক কিংকর্তব্যবিমূঢ়, বাঁচতে গেলে তাকে সক্রিয় রাজনীতি করতে হবে অথচ সে যে দলেই যায় সেখানেই তাকে তার আদর্শের সঙ্গে 'কমপ্রোমাইজ' বা সমঝোতা করতে হয়। এই নাটকের নায়কের অনুভূতি হয় যে, হাত ময়লা না করে রাজনীতি করা যায় না। রাজনীতি করলে এই কথাটি নারীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবার কথা। তবে কেন সে সুরক্ষিত অন্দরমহল ছেড়ে এই আবিলতায় মগ্ন হতে চাইছে? এই প্রশ্নের উত্তর লিবারাল এবং র‍্যাডিকাল ফেমিনিস্টরা সমস্বরে দেবেন। তাঁরা বলবেন, কে বলেছে অন্দরমহলে রাজনীতি নেই? আবিলতা অন্দরমহলকেও স্পর্শ করে। অন্দরমহলের রাজনীতিকে চিনতে মেয়েদের সময় লেগেছে।

অন্দরমহলের রাজনীতি সনাক্ত করার পরে একটা স্লোগান তৈরি হয়েছে: 'The personal is political'। স্লোগানটি উদারপন্থী নারীবাদীরা গ্রহণ করেছেন, সংস্কারকামী নারীবাদীরাও গ্রহণ করেছেন। 'দা পারসোনাল ইজ পলিটিকাল' বলতে বোঝায় যে ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলির মধ্যে সূক্ষ্মভাবে ক্ষমতার প্রতাপ, স্বার্থপরতা, বঞ্চনার একটা রাজনীতি চলতে থাকে। এই সম্পর্কগুলি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হতে পারে, শাশুড়ি-বৌ-এর সম্পর্ক হতে পারে, বা পরিবারের অপর কোনো সম্পর্ক হতে পারে। এর ফলেই সৃষ্টি হয় বৈষম্য। কন্যা-সন্তানের চেয়ে পুত্র-সন্তান বেশি সুযোগ পেতে পারে, বৃদ্ধ বাবা-মা অবহেলিত হতে পারেন।

এই সমস্যাগুলির একটি নির্দিষ্ট আদল থাকতেও পারে, আবার নাও থাকতে পারে। এই সমস্যাগুলিকে রাজনৈতিক সমস্যারূপে দেখা হবে কিনা সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন। 'দা পারসোনাল ইজ পলিটিকাল' বলার মধ্যে দিয়ে সম্পর্কের রাজনীতির উপস্থিতি স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে। এখানে রাজনীতি বলতে একধরনের ক্ষমতার আস্ফালনকে বোঝানো হচ্ছে।

ব্যক্তিগত সম্পর্কের রাজনীতিতে কী করে সুবিচার পাওয়া যায় সে বিষয়ে লিবারাল এবং র‍্যাডিকাল নারীবাদীরা ভিন্ন মত পোষণ করেন।

✓ লিবারাল নারীবাদীরা মনে করেন যে ব্যক্তি-জীবনে সুবিচার পেতে গেলে ন্যায়নীতির দ্বারস্থ হতেই হবে। তাঁদের মতে ন্যায়নীতির কোনো লিঙ্গ-পরিচয় নেই, 'প্রিনসিপল অব জাস্টিস' (principle of justice) বা ন্যায়-বিধির কোনো পক্ষপাত

থাকতে পারে না। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ-নির্বিশেষে ন্যায়বিচার সকলেরই প্রাপ্য এবং সকলের ক্ষেত্রে একই বিধি সমানভাবে প্রযোজ্য। এমন নিরপেক্ষ বিধি পেতে গেলে বিধিকে যুক্তিনিষ্ঠ হতে হবে। তাঁরা এমন বিধির সন্ধান করছেন যা নারী পুরুষের লিঙ্গ-পরিচয়ের উর্ধ্বে।

(লিবারাল নারীবাদীরা মনে করেন যে 'জাস্টিস' বা ন্যায়নীতির কোনো 'সেক্স-আইডেনটিটি' নেই এবং কোনো 'জেন্ডার-আইডেনটিটি' নেই। এটা কী করে সম্ভব যে, যে মানুষের যৌন ও লিঙ্গ-পরিচয় আছে সেই মানুষ যখন আইন প্রণয়ন করে, বিধি রচনা করে, তখন সে দেশ-কাল বর্জিত নৈর্ব্যক্তিক অবস্থান নিতে পারে? এর ব্যাখ্যা পেতে গেলে একটু খুঁটিয়ে যৌন ও লিঙ্গ-প্রভেদ সম্বন্ধে লিবারাল নারীবাদীদের মতটা জেনে নেওয়া প্রয়োজন। লিবারাল নারীবাদীরা কখনই বলবেন না যে জন্মসূত্রে স্থির হয়ে যায় সারা জীবন কোন আচরণ নারীর পক্ষে আদর্শ আচরণ হবে। অথবা তাঁরা বলবেন না যে লিঙ্গ-পরিচয়ের সূত্র যৌন-পরিচয়ের মধ্যে প্রোথিত রয়েছে। লিবারাল মতের ওপর দেকার্তের অধিবিদ্যার বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। দেকার্ত দুটি পদার্থ স্বীকার করতেন—'মাইন্ড' (mind) বা মন, এবং ম্যাটার (matter)—যার মধ্যে বডি বা দেহ অন্তর্ভুক্ত। আমাদের জৈবিক পরিচয় দেহের দ্বারা নিরূপিত হয়—সেখানে ক্রোমোজোম বা হরমোনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিন্তু মানুষের মন তো চলে যুক্তির নিয়মে। যুক্তির বলে মানুষ রচনা করে আইন, দর্শন, বিধিব্যবস্থা, এককথায় যাকে বলে 'কালচার' (সংস্কৃতি)।

কোন কালচারে নারীর ভূমিকা কী হওয়া উচিত এবং পুরুষের ভূমিকা কী হওয়া উচিত তা মানুষ যুক্তি দিয়ে নির্মাণ করে। ফলে ব্যক্তির যৌন-পরিচয়—অর্থাৎ তার ক্রোমোজমের গঠন ইত্যাদি যদিও সহজাত, তার লিঙ্গ-পরিচয়—যেমন নারী সেবাময়ী আর পুরুষ প্রতিহিংসাপরায়ণ, এই ধরনের পরিচয়—সমাজ-আরোপিত প্রত্যাশা। সুষ্ঠুভাবে সমাজ পরিচালনার জন্য নারী-পুরুষের এজাতীয় ভূমিকার বিভাজন প্রয়োজন হতে পারে। আবার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে নতুন ভূমিকা নির্মাণ করা যেতে পারে।)

সমাজে আইন প্রণয়নের সময় চেষ্টা করা হয় যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্তগুলিকে আইনের রূপ দেওয়ার। এই সংস্কারটি প্রাচীন গ্রিসের যুগ থেকে চলে আসছে। যদিও দেকার্তকে 'আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের জনক' রূপে স্বীকার করা হয় তবুও বলা যায় যে 'মানুষ যুক্তিচালিত জীবনযাপন করলে সে আদর্শ জীবনযাপন করতে পারবে' ধরনের কথা আমরা প্লেটোর রিপাবলিকেও পেয়েছি। প্লেটো বলছেন আমাদের 'অ্যাপেটইট' বা জৈবিক প্রয়োজনকে যুক্তির বশে রাখা শ্রেয়।

'যুক্তি' বলতে কী বোঝায় তার আরো স্পষ্ট রূপ আমরা পেলাম অ্যারিস্টটলে এসে। তিনি চিন্তনের বিধি বা লজ অব থট-এর কথা বলছেন।[১] এই ট্র্যাডিশন দেকার্তে এসে শেষ হয়নি, পরবর্তীকালে কান্টও আমাদের বলছেন যে বিশুদ্ধ যুক্তি-অনুগামী সিদ্ধান্তগুলিই একমাত্র নৈতিক।

আমাদের সমসাময়িক কালে জন রলস-এর (John Rawls 1921—2002) লেখায় পাই যে যুক্তি-অনুসরণ করে চলাটাই ন্যায়নিষ্ঠ হবার একমাত্র উপায়। মানুষ চায় সর্বতোভাবে যুক্তির দ্বারা তার জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে। এটাই লিবারাল ট্র্যাডিশনের মূল কথা, লিবারাল নারীবাদও সেই পথই অনুসরণ করে। তাঁরা মনে করেন সর্বদাই চেষ্টা করতে হবে কোনো একটা প্রিন্সিপল (principle) মেনে কাজ করতে, তাহলেই কাজটা ন্যায্য হবে, পক্ষপাত-দোষ এড়ানো যাবে।

(লিবারাল নারীবাদীরা মনে করেন রিজন বা যুক্তির কোনো লিঙ্গ-পরিচয় নেই। মানুষ যখন যুক্তি ব্যবহার করে তখন সে তার ব্যক্তিগত লিঙ্গ-পরিচয়কে অতিক্রম করে যায়। যদি কেউ লিঙ্গ-পরিচয় বলবৎ রেখে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নেবার চেষ্টা করে তবে সেটা অন্যায় হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে 'নারী'/'পুরুষ' এই পরিচয়ের অতিরিক্ত আমাদের প্রত্যেকের আর একটা পরিচয় আছে—যেখানে আমরা মানুষ। এবং সেই মানুষ পরিচয়ে আমাদের অনুগত সামান্য ধর্ম এই যে আমরা র‍্যাশনাল অ্যানিমাল (rational animal) বা যৌক্তিক জীব।

লিবারাল নারীবাদীদের মতে আমরা সবাই তিনটি পরিচয় বহন করি: প্রথমটি আমাদের যৌন-পরিচয়, দ্বিতীয়টি আমাদের লিঙ্গ-পরিচয়, এবং আমাদের তৃতীয় পরিচয় হল আমরা মানুষ। তৃতীয়টি এই প্রথম দুটিকে অতিক্রম করে যায়।

তত্ত্ব-নির্মাণ করার সময় ও বিধি প্রণয়নের সময় আমাদের চেষ্টা করতে হবে যাতে 'মানুষ' পরিচয়ের অতিরিক্ত কোনো পরিচয় আমাদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত না করে। এইভাবে লিবারাল নারীবাদীরা চান একটা বিশুদ্ধ ইতিহাস-অনপেক্ষ (history-neutral) তত্ত্বের কোটি নির্মাণ করতে যেখানে বিশুদ্ধ যুক্তিই হবে একমাত্র চালিকা শক্তি। দৈনন্দিন জীবনযাপনে কখনও কোথাও যদি লিঙ্গ-বৈষম্য দেখা যায় তবে বুঝতে হবে যে সেখানে হয় বিশুদ্ধ যুক্তি তার নিয়ামক ভূমিকা হারিয়েছে অথবা সেখানে কোনো তত্ত্বের অপপ্রয়োগ ঘটেছে। তত্ত্বের নিজস্ব কোনো লিঙ্গ/পক্ষপাত নেই।)

Scanned with

বিভিন্ন শাস্ত্রে এমন কতকগুলি তত্ত্ব থাকতে পারে যেখানে লিঙ্গ-সমস্যাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তত্ত্বের ক্ষেত্রেও এ জাতীয় ত্রুটিকে তত্ত্বের অনবধান দোষ বা 'এরর অব অমিশন' (error of omission) বলা যেতে পারে। লিবারাল ফেমিনিস্টরা মনে করেন যে তত্ত্ব সক্রিয়ভাবে কোনো লিঙ্গ-রাজনীতিতে লিপ্ত হতে পারে না। অর্থাৎ তত্ত্বের ক্ষেত্রে 'এরর অব কমিশন' (error of commission) ঘটতে পারে না। নারীর অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত কোনো সমস্যার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন হলে এর জন্য প্রচলিত যে কোনো তত্ত্ব কাঠামো বেছে নেওয়া যেতে পারে। যেমন লিঙ্গ-বৈষম্যের মার্কসীয় ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে, অথবা ফ্রয়েডের তত্ত্ব-কাঠামো বেছে নিয়ে সেই অনুযায়ী লিঙ্গ-বৈষম্যের ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এই প্রকল্পটিকে বলা হয় অন্তর্ভুক্তির প্রকল্প বা 'মেথড অব ইনক্লুশন' (method of inclusion)।

লিবারাল নারীবাদীরা ইনক্লুশনের প্রকল্পটিকে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে থাকেন। যে অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন হয়নি তার তাত্ত্বিক পর্যালোচনার জন্য অন্তর্ভুক্তির প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন 'অ্যাবর্শন' ধ্রুপদী নীতি-দর্শনে আলোচ্য বিষয়ই ছিল না। এবার নারীর অভিজ্ঞতাকে তত্ত্ব কাঠামোতে অন্তর্ভুক্তির প্রকল্পরূপে 'অ্যাবর্শন' নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে, নারীর অভিজ্ঞতার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। যদি দেখা যায় যে একটি অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণের এবং ব্যাখ্যার অযোগ্য তাহলে মনে করা হয় যে তা তাত্ত্বিক পরীক্ষারও অযোগ্য।

অপর এক অনুষঙ্গেও অন্তর্ভুক্তির কথা লিবারাল নারীবাদীরা বলেন—সামাজিক অধিকারের ক্ষেত্রে। তাঁরা চান মেয়েদের যেন মূল সামাজিক কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাঁদের যেন পুরুষদের সমান শিক্ষার অধিকার দেওয়া হয়, কর্ম-নিযুক্তির অধিকার দেওয়া হয়।

এই উদ্দেশ্যে লিবারাল নারীবাদীরা আমেরিকায় ১৯৬৬-তে একটি সংগঠন (NOW—National Organization for Women) তৈরি করে তাঁদের দেশের রিপাবলিক এবং ডেমোক্র্যাটিক পার্টির কাছে আট দফা দাবি পেশ করেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে যেন নারী-সমাজের এই দাবিগুলিকে রাজনৈতিক দলগুলি অন্তর্ভুক্ত করে:

(১) সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সমান অধিকার প্রদান।

(২) নিয়োগের ক্ষেত্রে লিঙ্গ-বৈষম্য আইন করে নিষিদ্ধ করা।

(৩) কর্মক্ষেত্রে মেটার্নিটি লিভের (maternity leave) অধিকার এবং সোশাল সিকুরিটির (social security) সুবিধা।

(৪) কর্মরত অভিভাবকদের শিশু এবং পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আয়করে ছাড় (income tax relief) দেওয়া।

(৫) শিশুদের দেখাশোনার জন্য কেন্দ্র (créche) নির্মাণ।

(৬) সমান শিক্ষা এবং একই প্রাঙ্গণে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষালাভের অধিকার (co-education)।

(৭) কর্মক্ষেত্রে সমান প্রশিক্ষণের (training) অধিকার এবং দরিদ্র মহিলাদের জন্য ভাতার (allowance/subsidy) ব্যবস্থা।

(৮) মহিলাদের নিজেদের প্রজনন ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের অধিকার (reproductive rights)।

NOW আইনের পরিবর্তনের মাধ্যমে মহিলাদের জীবনে পরিবর্তন আনতে চায়। ওপরের আটটি দাবিই আইনের সাহায্যে আদায় করা যেতে পারে। লিবারাল নারীবাদীরা যখন বাহ্যজগতের মূলস্রোতে অন্তর্ভুক্তির কথা বলেন তখন তাঁরা বাইরের সমাজের প্রচলিত ছাঁচটি বদলের কথা বলেন না। যেমন তাঁরা বলেন না যে, বাজারকেন্দ্রিক অর্থনীতিই (market economy) সমাজে মহিলাদের অনুন্নত অবস্থার জন্য দায়ী; অতএব বাজারকেন্দ্রিক অর্থনীতির বদল করতে হবে। একটি সমাজে কী জাতীয় অর্থনীতি বহাল রয়েছে সেটা তাঁদের বিচার্য নয়, তাঁদের কাছে প্রশ্নটা হল: অর্থনীতির চেহারা যাই হোক না কেন মেয়েরা সেখানে অদৃশ্য কেন? মেয়েদের মূলস্রোতে নিয়ে আসতে হবে —আর এর জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে।

মূলস্রোতে অন্তর্ভুক্তির পাশাপাশি লিবারাল নারীবাদীরা ব্যক্তিজীবনের হেনস্তা নিয়েও সোচ্চার। আশ্চর্যের বিষয় যে, মেয়েরা গৃহস্থালির যে কাজ করে তাকে 'শ্রম' (labour) বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। রান্না, সেলাই, কাপড় কাচা, ছেলে-পড়ানো এগুলি স্বীকৃত শ্রম নয়। কিন্তু এই একই কাজ যখন বড় পুঁজির দ্বারা পুষ্ট হয় তখন কাজটা ছেলেদের হাতে চলে যায় এবং একই কাজ তখন 'শ্রম' বলে বিবেচিত হয়। হোটেলের রান্না, ড্রাইক্লিনিং-এ কাপড় কাচা, দর্জির কাজ স্বীকৃত 'শ্রম'। তখন ছুটিছাটা এবং ভাতাসহ আরো অনেক দাবির প্রশ্ন ওঠে। গৃহস্থালির কাজকে ঘিরে যে রাজনীতি চলে সেটা লিবারালদের ভাবায়। তেমনি ভাবায় বিভিন্ন প্রচার-মাধ্যম ও

Scanned with

বিজ্ঞাপনের ভাষায় ও চিত্রে নারীর অবমাননা। এর প্রতিকার হিসেবে তাঁরা আরো কড়া আইন চান। প্রকারান্তরে এটাও একধরনের অন্তর্ভুক্তির প্রকল্প। যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আইনের অঙ্গনের বাইরে ছিল, দাবি করা হচ্ছে সেই অভিজ্ঞতা আইনের অন্তর্ভুক্ত হোক। ম্যারিটাল রেপ (marital rape) বা বৈবাহিক ধর্ষণ যে আজ-আইনের চোখে অপরাধ বলে গণ্য হচ্ছে এও অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়ার ফলে সম্ভব হয়েছে। যে আচরণকে একান্ত ব্যক্তিগত মনে করা হত সেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও এখন আইনের দৃষ্টিতে বিচার্য বিষয়। বলা যেতে পারে the personal is political, অর্থাৎ যা কিছু ব্যক্তিক তাই রাজনৈতিক, মনে করার এটি একটি কাম্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া।

লিবারাল নারীবাদীদের দ্বারা স্বীকৃত তিন ধরনের অন্তর্ভুক্তির উল্লেখ করা হল: প্রতিষ্ঠিত চিন্তাতন্ত্রে নারীর অভিজ্ঞতার পর্যালোচনার অন্তর্ভুক্তি, দ্বিতীয়ত, সব রকম সামাজিক চর্যায় পুরুষের পাশাপাশি নারীর অন্তর্ভুক্তি, এবং, সব শেষে, আইনের অঙ্গনে একান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্তি।

এই তৃতীয় অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে মনে করা হয় যে, যুক্তি ও বিচার যত প্রসার লাভ করবে ততই অবদমন কমবে আর সেই অনুপাতে নির্যাতনের লাঘব হবে। যুক্তি কোনো গোপন ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, যুক্তি সর্বদাই সর্বজনীন ও সর্বজনগ্রাহ্য। ব্যক্তিগত সমস্যাকে যুক্তির আদালতে পেশ করার অর্থ হল ব্যক্তিগত তখন আর নিছক ব্যক্তিগত থাকে না। এর ফলে লিবারাল নারীবাদীদের একটু অসুবিধে হওয়ার কথা কারণ লিবারাল দর্শনে পাবলিক এবং প্রাইভেট অর্থাৎ 'দেওয়ানি আম' এবং 'দেওয়ানি খাস'-এর মতো এই দ্বিকোটিক ভাগটি অত্যন্ত জরুরি মনে করা হয় অথচ লিবারাল নারীবাদীরা যেভাবে the personal is political কথাটির মোকাবিলা করেন তাতে এই বিভাজনের গুরুত্ব অনেক কমে যায়। অন্তর্ভুক্তির ফলে ধীরে ধীরে পার্সোনাল যেন নৈর্ব্যক্তিক বিধির বিচারাধীন হয়ে যায়। এখানে লিবারালদের যুক্তিটি এরকম, ব্যক্তিগত সমস্যাকে আইনের আওতায় এনে তাঁরা গোপনীয়তা হারাচ্ছেন ঠিকই কিন্তু পরিবর্তে সুবিচারের মাধ্যমে তাঁরা অনেক বেশি লাভবান হচ্ছেন।

প্রচলিত দর্শন, অর্থনীতি ও রাজনীতি কোনোটিকেই বদল না করে লিবারাল নারীবাদীদের অন্তর্ভুক্তির প্রকল্পগুলি র‍্যাডিকাল নারীবাদীরা সুনজরে দেখেন না। তাঁরা মনে করেন নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ কোনো বিক্ষিপ্ত ঘটনা নয়।

সবরকম লিঙ্গ-বৈষম্যের মূলে রয়েছে পিতৃতন্ত্র। পিতৃতন্ত্রকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে না পারলে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ কোনোদিন দূর হবে না। লিবারাল নারীবাদীরা যে রাষ্ট্রের, যে আইন-ব্যবস্থার কাছে সুবিচার প্রত্যাশা করছেন সেটা নিজেই একপেশে এবং পিতৃতন্ত্রের মদতপুষ্ট। মূলস্রোতের বৈধতা সম্বন্ধে প্রশ্ন না তুলে মূলস্রোতে অন্তর্ভুক্ত হতে চাইলে নারী স্বয়ং পিতৃতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠবে।

লিবারাল নারীবাদীদের কাছে র‍্যাডিকাল নারীবাদীদের প্রশ্ন: সুবিচারের আশায় যখন ব্যক্তিগত কোটিকে আইনের আওতায় আনার চেষ্টা হচ্ছে তখন কি নারী গৃহস্বামীর পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি পেয়ে আরো বৃহৎ পটভূমিতে রাষ্ট্ররূপী পিতৃতন্ত্রের কাছে নিজেকে সমর্পণ করছে না?

আমেরিকায় র‍্যাডিকাল নারীবাদের জন্ম 1967-তে। একদল মহিলা NOW-এর সদস্যপদ ত্যাগ করে একটি বিকল্প গোষ্ঠি রচনা করেন। এঁরা মনে করতেন NOW-এর সদস্যরা অত্যন্ত বেশি রক্ষণশীল। র‍্যাডিকাল ফেমিনিস্টদের অনেকে তথাকথিত 'নিউ লেফট' (New Left) বা নব্য-বামপন্থী ছিলেন, এঁদের অনেকের সঙ্গে আবার উত্তর-আধুনিকদের (post-modern) সরাসরি যোগ ছিল।

র‍্যাডিকাল নারীবাদীরা মনে করেন না যে anatomy is destiny। তাঁরা শারীরিক বৃত্তিকে সম্পূর্ণ যুক্তির নিয়ন্ত্রণে আনার প্রস্তাবও খারিজ করে দেন। তাঁরা দেকার্তের মতো বলতে রাজি নন যে মন শরীর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁদের মতে, আমাদের যৌন-পরিচয় যেমন আমাদের লিঙ্গ-পরিচয়কে প্রভাবিত করে, তেমনি আবার আমাদের লিঙ্গ-পরিচয় আমাদের যৌন-পরিচয়ে বিবর্তন ঘটায়। অর্থাৎ, আমাদের জন্মগত স্বরূপ বা নেচার (nature) এবং আমাদের রচিত স্বরূপ বা জেন্ডারের (gender) মধ্যে একটা উভয়মুখী সম্বন্ধ রয়েছে। এই দুই-এর মধ্যে সম্পর্কটা একরৈখিক নয়।

র‍্যাডিকাল নারীবাদীরা লিবারাল নারীবাদীদের মতো অন্তর্ভুক্তির প্রকল্প সমর্থন করেন না। একটা নৈর্ব্যক্তিক, নিরপেক্ষ সাধারণীকরণের (impersonal, neutral generalisation) সম্ভাব্যতা তাঁরা খারিজ করে দেন। তাঁদের মতে মানুষের কোনো লিঙ্গ-অনপেক্ষ, ইতিহাস-অনপেক্ষ অবস্থান থাকা সম্ভব নয়। লিঙ্গমোচন করা কখনই সম্ভব নয় তবে লিঙ্গ-পরিচয়ের মধ্যে সাম্যভাবনা আনা যেতে পারে। এই নারীবাদীরা

Scanned with

লিঙ্গ-অনপেক্ষ একটা বিশুদ্ধ তত্ত্বের স্তর স্বীকার করেন না। সেই সঙ্গে বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার সম্ভাবনা বা এ প্রায়ওরাই রিজন-এর (a priori reason) সম্ভাবনা তাঁরা স্বীকার করেন না।

রিজনের ইতিহাস-সাপেক্ষতা স্বীকার করতে হলে রিজনও অনেকটা ধূসর ও অস্পষ্ট হয়ে যেতে পারে; তখন ফাজি (fuzzy) লজিক, ভেগ (vague) লজিক, মেনি-ভ্যালুড (many-valued) লজিক, প্যারা-কনসিসটেন্ট (para-consistent) লজিক, ইত্যাদি ধ্রুপদী দ্বিকোটিক লজিকের চেয়ে বেশি আকর্ষণ করে।[২] র‍্যাডিকাল নারীবাদীরা এভাবে প্রচলিত তন্ত্রে অন্তর্ভুক্তি নয়, প্রচলিত তন্ত্রের পুনর্বিন্যাসের কথা বলেন। তারই ফলস্বরূপ ধ্রুপদী দ্বিমাত্রিক লজিকের তাঁরা বিকল্প খোঁজেন।

নিছক পরিবর্তন আনতে হবে বা সংস্কার করতে হবে বলে যে তাঁরা বিকল্পের খোঁজ করছেন তা নয়। বিকল্প অনুসন্ধানটা একটা ফ্যাশন নয়, এটার একটা তাগিদ তাঁরা আন্তরিকভাবে অনুভব করেন। র‍্যাডিকাল নারীবাদীরা মনে করেন যে কোনো কোনো চিন্তাতন্ত্র ও লজিকের ঘরানা ক্ষমতার মেরুকরণে প্রশ্রয় দেয়। র‍্যাডিকাল নারীবাদীরা যেহেতু তত্ত্ব ও প্রয়োগকে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত করে বোঝেন তাই তাঁরা মানতে রাজি নন যে একটা তত্ত্বের সঙ্গে একাধিক চর্যার রীতি সংবদ্ধ থাকতে পারে। তাঁরা মনে করেন যে প্রতিটি লজিকের সিস্টেমের (logical system) সঙ্গে একটা করে র‍্যাশনাল প্র্যাকটিস (rational practice) যুক্ত রয়েছে। ফলে চর্যায় লিঙ্গ-সাম্য (gender equality) আনতে গিয়ে একই সঙ্গে সেই চর্যার নিয়ামক চিন্তাতন্ত্রে বদল আনতে হবে। র‍্যাডিকাল নারীবাদীরা সবসময় বৈষম্যের মূল কারণ খুঁজে বার করার চেষ্টা করেন। তাঁরা লিবারালদের মতো মনে করেননা যে সব জায়গায় সঠিক প্রিন্সিপলের অভাবেই লিঙ্গ-বৈষম্য দেখা দেয়। তাঁদের মতে স্বার্থপরতা (self-interest) এবং ক্ষমতার (power) আস্ফালন বৈষম্যের জন্য দায়ী।

র‍্যাডিকাল নারীবাদীরা মনে করেন যে সমাজের লিঙ্গ-বৈষম্যের বীজ লুকিয়ে আছে নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্কের মধ্যে। যেখানে একটা অসম ক্ষমতার বণ্টন, অবদমন ও বৈষম্য বাসা বেঁধে আছে—পরবর্তীকালে সেখান থেকেই লিঙ্গ-বৈষম্যকারী আচরণ সমাজের সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ে। র‍্যাডিকালদের মতে লিবারালরা যখন আইনের সাহায্যে the personal is political-এর গণ্ডিতে সুরাহা চান তখন তাঁরা সমস্যার মূলে না গিয়ে মূল থেকে সরে যান। বৃহত্তর সমাজে যা দেখি তার বীজ

লুকোনো আছে ব্যক্তিগত সম্পর্কে অবস্থিত অবদমনে। ব্যক্তিগত সম্পর্কের টানাপোড়েন, আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে কাজ করে চলেছে পিতৃতন্ত্রের ক্ষমতার কাঠামো।

পিতৃতন্ত্রে সর্বদাই ক্ষমতার একটা কেন্দ্র এবং সেই কেন্দ্রের পরিপ্রেক্ষিত থেকে একটা প্রান্ত আছে বলে মনে করা হয়। এর ফলে পিতৃতন্ত্রে ক্ষমতার সমবণ্টন কখনই সম্ভব হয় না। মনে করা হয় যে ক্ষমতার কেন্দ্রে যে আছে তার সম্পূর্ণ বিপরীতে প্রান্তিক সমাজের অবস্থান। কেন্দ্রের প্রেক্ষিতটি যদি উত্তম হয়, সঠিক হয়, তাহলে প্রান্তের প্রেক্ষিতটি অধম এবং বেঠিক। প্রান্তের উন্নতিকল্পে প্রান্তকে কেন্দ্রে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

লিবারালদের এই ব্যাখ্যা র‍্যাডিকালরা মানতে প্রস্তুত নয়। তাঁরা মনে করেন, যে তন্ত্রে কেন্দ্র আর প্রান্তের দুটি স্পষ্ট মেরু কল্পনা করা হয় সেখানে প্রান্ত কেন্দ্রে অন্তর্ভুক্ত হবার পরে নতুন প্রান্ত সৃষ্টি হবে। কারণ ক্ষমতার দুটি বিপরীত কোটি কল্পনা না করলে তন্ত্রটি একেবারেই টেকে না। র‍্যাডিকাল নারীবাদীরা এমন একটা তন্ত্র রচনা করার চেষ্টা করছেন যেখানে কেন্দ্র ও প্রান্তের দুটি স্পষ্ট কোটি নেই। তাঁরা বলেন দুটি পক্ষ ভিন্ন হয়েও সমান মূল্যবান হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, তাঁরা মনে করেন দুটি পক্ষ ভিন্ন হয়েও খুব গুরুত্বপূর্ণ অর্থে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। তাঁরা, লিবারালদের মতো, ব্যক্তিকে একটি বিচ্ছিন্ন সত্তারূপে দেখতে চান না। র‍্যাডিকালরা বলেন প্রতিটি ব্যক্তি অপরাপর ব্যক্তির দ্বারা প্রভাবিত এবং এই পারস্পরিকতার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিক-সত্তা গড়ে ওঠে। র‍্যাডিকালদের কাছে selfhood construction বা ব্যক্তিক-সত্তা গঠনটা অত্যন্ত জরুরি ধারণা। লিবারালদের সেলফ বা ব্যক্তিকে atomic self বা আণবিক সত্তা বলা হয়; আর র‍্যাডিকাল বলেন hyphenated self বা সম্পর্কিত-সত্তার কথা। একটি সত্তা যদি অপর একটি সত্তার ওপর তার ব্যক্তিস্বরূপের জন্য নির্ভর করে, এবং এই নির্ভরশীলতার বোধ যদি পারস্পরিক হয়, তা হলে আর একের ওপর অপরের ক্ষমতার আস্ফালনের জায়গাটাই থাকে না।

ব্যক্তিক-সত্তা গঠনকে কীভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে তার ওপরই নির্ভর করে যৌন-পরিচয় ও লিঙ্গ-পরিচয় কীভাবে ব্যাখ্যাত হবে। নারী-পুরুষের যৌন-পরিচয় ও লিঙ্গ-পরিচয়ের ধারণা থেকে জন্ম নেয় ব্যক্তিগত সম্পর্কের বিভিন্ন 'রাজনীতি'। ভাষা প্রয়োগ, প্রবাদ, ইত্যাদি ব্যবহারে প্রতিফলিত হয় আমাদের যৌন এবং লিঙ্গ-

ধারণা। যখন বলা হয় 'পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য, নহিলে খরচ বাড়ে', বা 'নারী নরকের দ্বার', তখন একটা সমাজের চিন্তার পরিমণ্ডলের পরিচয় পাওয়া যায়। চিন্তার পরিমণ্ডল নতুন করে ঢেলে সাজাতে না পারলে ব্যক্তিগত সম্পর্কে লিঙ্গ-বৈষম্য থেকেই যাবে।

র‍্যাডিকাল নারীবাদীরা যে আইনের পরিবর্তন চান না বা মূলস্রোতে নারীর প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে চান না, তা নয়। অন্তর্ভুক্তির প্রকল্প পুরোপুরি খারিজ করলে বিকল্প স্থান রচনা করতে সমর্থ না হওয়া অবধি র‍্যাডিকাল নারীবাদীদের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিষ্ক্রিয় থাকতে হবে। নিজের মতো করে পিতৃতন্ত্রের ছত্রছায়ার বাইরে কথা বলতে হলে নতুন বাগ্‌বিধি অনুশীলন করতে হবে। র‍্যাডিকাল নারীবাদীরা মূলস্রোতকে পাশ কাটিয়ে যেতে চান না। নারী-পুরুষ যুগ্ম সহযোগে কাজ করুক সেটাই তাঁরা চান। অথচ এই যৌথভাবে কাজ করাটা পিতৃতন্ত্রের চৌহদ্দির ভেতরে থেকে তাঁরা করতে সম্মত নন। লিবারাল নারীবাদীরা যখন নারীপুরুষের মিলিত প্রচেষ্টার কথা বলেন তখন তাঁরা দুটি বিচ্ছিন্ন সত্তার মিলিত প্রয়াসের কথা বলেন। তাঁদের জোরটা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ফলে মিলনের স্থলটা হয়ে দাঁড়ায় প্রয়োজনভিত্তিক। সব মিলিত প্রয়াসে ধীরে ধীরে দেখা যায় একটি ক্ষমতার মেরুকরণ গড়ে ওঠে। তাছাড়া প্রতিটি সম্পর্কে চেষ্টা করা হয় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে সম্পর্ক স্থাপন করার। এই সম্পর্কগুলিকে ধরে রাখে প্রয়োজন, স্বার্থ, একমুখী নির্ভরশীলতা, চুক্তি, ইত্যাদি। সম্পর্কের প্রতিটি মাত্রাই যেন প্রিনসিপল-বিধি-আইন দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায় বা বহাল রাখা যায়। লিবারালরা মনে করেন যে সম্পর্ক রচনারও যেমন আইন আছে, তেমনি সম্পর্ক ভাঙারও আইন আছে। র‍্যাডিকাল নারীবাদীরা এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত রূপে দেখেন। তাঁরা মনে করেন সম্পর্ক ছাড়া একক অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। এর ফলে স্বাতন্ত্র্য বলতে তাঁরা বোঝেন সম্পর্কিত থেকেও নিজের ব্যক্তিগত স্বর প্রতিষ্ঠা করতে পারা। এইভাবে সম্পর্কের স্বরূপ যদি নতুন করে ব্যাখ্যা করতে হয় এবং সম্পর্কের মাধ্যমে যদি পারসোনাল আইডেনটিটি (personal identity) বা ব্যক্তিক-স্বরূপ গড়ে ওঠে, সেই সঙ্গে স্বকীয়তার অর্থও যদি পুনর্বিবেচনা করতে হয় তাহলে চিন্তার পরিমণ্ডলে একটা আমূল পরিবর্তন ঘটানো প্রয়োজন।

র‍্যাডিকাল ফেমিনিস্টরা মনে করেন যে আইনের মাধ্যমে মেয়েদের অবস্থার আপাত-উন্নতি সাধিত হলেও মূল সমস্যাটা অপরিবর্তিত থেকে যায়। তাই এঁদের

আন্দোলনের একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে সচেতন হয়ে ওঠার প্রকল্প বা কনশাসনেস-রেজিং প্রোগ্রাম (consciousness-raising program)। ছোট ছোট গোষ্ঠিতে মেয়েরা তাদের অনুভবের কথা পরস্পরকে বলে। মনে করা হয় এটাও একধরনের সক্রিয় রাজনীতি। পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে তারা বুঝে নেবার চেষ্টা করে যে কোনটা মুক্তির স্বর আর কোনটা পিতৃতন্ত্রের শেখানো বুলি। কবিতা, গল্প, পথনাটিকা, সাহিত্যসভা, ইত্যাদির মাধ্যমে তারা জনমানসেও পরিবর্তন আনার চেষ্টা করে।

র‍্যাডিকাল নারীবাদ শুধু যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ওপর খুব গুরুত্ব দেয় তা নয়। ক্রমে তারা জাতি-বর্ণভেদে নারীর অভিজ্ঞতার প্রভেদ নিয়েও বিচার করে। ইদানিং কে যে লিবারাল নারীবাদী আর কে যে বিশুদ্ধ র‍্যাডিকাল নারীবাদী তা বলা মুশকিল। কারণ উত্তর-আধুনিকদের সমালোচনার মুখে পড়ে উভয়েই প্রতিনিয়ত তাঁদের মতবাদের বদল করে চলেছেন। এর ফলে অনেক সময় লিবারালরা র‍্যাডিকালদের অনেক কাছাকাছি চলে এসেছেন। আবার কখনও উত্তর-আধুনিকদের তুলনায় র‍্যাডিকালদের রক্ষণশীল বলে মনে হয়।

লিবারাল ও র‍্যাডিকাল নারীবাদের বিতর্কটি নৈতিক ও রাজনৈতিক মতাদর্শের বিবাদ। নৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থানের সঙ্গে সবসময় যুক্ত হয়ে থাকে একটা লজিক ও একটা জ্ঞান-তাত্ত্বিক (epistemological) প্রেক্ষিত। লিবারাল মতবাদের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রেক্ষিতেরও রদ-বদল হয়।

ধ্রুপদী লিবারাল প্রেক্ষিতের অনুগত লজিকের পরিচয় পাওয়া যায় রাসেল ও ফ্রেগের লেখায় এবং তার অনুগত জ্ঞান-তত্ত্বের ছবি পাওয়া যায় দেকার্ত ও কান্টের দর্শনে। এই ট্র্যাডিশনের ভেতর থেকে উত্তর-আধুনিকতার প্রতিবাদী স্বর কী করে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করল তার একটা একরৈখিক ইতিহাস এর পরের অধ্যায়ে ('নির্মাণ থেকে বিনির্মাণ'-এ) দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

উত্তর-আধুনিকতা শুধু আধুনিক মতবাদ খণ্ডনের মাধ্যমে জন্ম নেয়নি। এর মূলে আছে অবভাস তত্ত্ব (phenomenology), অস্তিত্ববাদ (existentialism) ও সাংগঠনিকবাদ (structuralism)। অর্থাৎ সব মিলিয়ে যাকে ইউরোপীয় দর্শন বা কন্টিনেন্টাল ফিলজফি (continental philosophy) বলে তার একটা বড় অবদান।

আধুনিকদের সঙ্গে উত্তর-আধুনিকদের তর্কের বিস্তারিত রূপ পরিশিষ্টে আলোচিত হয়েছে।

Scanned wit

সূত্র-নির্দেশ

(১) অ্যারিস্টটলের 'লজ অব থট' (Laws of Thought) নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য এই বই-এর চতুর্থ অধ্যায় 'উত্তর-আধুনিকতা ও নারীবাদ' দ্রষ্টব্য।

(২) বিভিন্ন ব্যতিক্রমী তর্কশাস্ত্রের আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: Tushar Sarkar, 'Some Systems of Deviant Logic', in *Foundations of Logic and Language*, ed. Pranab Kumar Sen. Allied Publishers Ltd. in collaboration with Jadavpur University, Kolkata, 1990, pp. 122-81.

তৃতীয় অধ্যায়

নির্মাণ থেকে বিনির্মাণ

বিদ্বৎসমাজে 'বিনির্মাণ' কথাটা প্রায়ই শোনা যায়। ভারতের দার্শনিক সমাজে অবশ্য বিনির্মাণ নিয়ে চর্চা কমই হয়। তাই দেখে অনেকে এমনও সিদ্ধান্তে পৌঁছে যান যে ভারতের দার্শনিকরা বড়োই রক্ষণশীল—এইসব নতুন হাওয়া তাঁদের প্রাকার ভেদ করে ঢুকতে পারে না। এখনও তাঁরা আঁকড়ে আছেন পুরোনো যুগকে, যে-যুগকে কোনো একসময় আধুনিক বলা হত। নবীনরা পরিহাস করেন এইসব জ্ঞানপ্রবর দার্শনিকদের। উচ্চগ্রামে ঘোষণা করেন তাঁরা : পৃথিবী আধুনিক যুগ থেকে আধুনিকোত্তর যুগের দিকে ছুটে চলেছে। এই পরিবর্তনে আজ যাঁরা শামিল না হবেন, কাল তাঁদের এই পরিবর্তন গ্রাস করবে। যেমন তা গ্রাস করছে দুনিয়ার অনেক অচলায়তনকে। উদাহরণস্বরূপ প্রথমেই বলা হয়, রুশ দেশের কথা; মনে করিয়ে দেওয়া হয়, এখন খুলে-দেওয়ার যুগ, কোনো ভৌগোলিক এলাকাকে আগলে আলাদা করে রাখলে চলবে না; বার্লিন প্রাচীর ভেঙে গেছে; চীনের প্রাচীর চিচিং ফাঁকের মন্ত্রে বিদেশী পুঁজির কাছে খুলছে। অতএব, মননের রাজ্যেই বা কেন চিন্তার গোঁড়ামি থাকবে? রাজনীতি বা অর্থনীতিতে যেসব ধারণাকে মৌলিক ও অকাট্য মনে হত, এক-এক করে সবগুলোই যখন চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়িয়ে ভেঙে পড়ছে তখন কোথাও কোনো মৌলিক ধারণা থাকা কি সম্ভব? না কি থাকতে দেওয়া উচিত? যা-কিছু চিরকালীন বা ধ্রুব বলে মনে হত, তাও চোখের সামনে নস্যাৎ হয়ে যাচ্ছে; যেন এমন হওয়ারই কথা ছিল, না হওয়াই ছিল অস্বাভাবিক।

এতদিন দর্শনের জগতে এই ঘটনা না ঘটবার দুটো কারণ দেখানো হয়। প্রথম কারণ: স্বার্থবুদ্ধি। আর দ্বিতীয় কারণ: সেই স্বার্থবুদ্ধিকে প্রচ্ছন্ন রাখার যৌক্তিক ক্ষমতা। নবীনদের অভিযোগ: বিভিন্ন সময়ে আধুনিকতার নামে দার্শনিকরা নানা মৌল ধারণার বনিয়াদ (ফাউন্ডেশনাল কনসেপচুয়াল স্কিম) নির্মাণ করেছেন আর সেইসঙ্গে যুক্তির জাল বিস্তার করে লোককে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন। লোককে

Scanned with

বোঝানো হয়েছে যে এই ধারণাগুলি পরম সত্য, মৌল, অপরিহার্য। নব্যরা মনে করেন, এই ভাঁওতাটুকু বুঝে নিতে পারলে আমাদের প্রধান কাজ হবে এইসব মৌল ধারণার প্রবক্তাদের চিহ্নিত করা এবং জনসাধারণকে দেখিয়ে দেওয়া যে প্রতিটি তথাকথিত মৌল ধারণাই আসলে নির্মিত ধারণা—কোনো একটি প্রেক্ষিতে, কোনো একটা প্রয়োজনে, এই ধারণা তৈরি করা হয়েছে। এই ধারণাগুলির কোনোটিই নিত্য, ধ্রুব, সংশয়াতীত নয়। সব অচলায়তনেরই আবেষ্টন (ক্লোজার) মনগড়া—তা সে আবেষ্টন ধারণারই হোক, আদর্শেরই হোক অথবা তত্ত্বেরই হোক। এ থেকে বেরোতে হবে। আর এর থেকে বেরোতে গেলে চাই : বিনির্মাণ। অর্থাৎ নির্মিত ধারণাগুলিকে এক-এক করে বিনির্মাণ করতে হবে। তখনই দেখানো যাবে এই ধারণাগুলির কোনোটিই শাশ্বত ছিল না, প্রতিটি ধারণার প্রাগভাব ছিল, এবং প্রতিটি ধারণাই ধ্বংসযোগ্য। কোনো ধারণার জন্ম একটা স্বয়ম্ভূ ঘটনা নয়। কোনো একটা প্রেক্ষিত থেকে, কোনো একটা অনুষঙ্গে, ধারণার জন্ম হয়। সেই কারণেই বিনির্মাণবাদীরা মনে করেন, কোনো ধারণাই কালাতীত নয়। পরিপ্রেক্ষিত বদল আর অনুষঙ্গ বদলের সঙ্গে ধারণার বদল হয়। ধারণামাত্রের একটা পরিপ্রেক্ষিত আছে, আছে প্রাসঙ্গিকতা। এর কোনোটাই কালাতীত হতে পারে না।

নির্মাণ থেকে বিনির্মাণে যাওয়াই যদি আধুনিকোত্তরতার অন্যতম প্রকল্প হয়ে থাকে তবে এই প্রকল্পে অধিকাংশ দার্শনিকের উৎসাহ না থাকাটাই স্বাভাবিক। তাঁরা মনে করতেই পারেন যে এই প্রকল্পে শামিল হওয়া মানেই নিজেদের পায়ে কুড়ুল মারা। তার চেয়ে আধুনিক থাকাই মঙ্গল, আধুনিকোত্তর হয়ে কাজ নেই। এই নব্যবিপ্লবের অনেক উৎসাহী প্রবক্তা প্রথাগত দর্শনচর্চার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। তাঁদের পরামর্শ হল বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে দর্শনচর্চাকে পাঠক্রমে স্বতন্ত্র স্থান না দেওয়া। দর্শনের পঠনপাঠন অন্য কোনো শাস্ত্রের অনুগামী হয়ে বড়োজোর টিকে থাকতে পারে।

তার মানে অবশ্য এই নয় যে দর্শনের পঠনপাঠন এযাবৎ অপরাপর শাস্ত্র থেকে বিযুক্ত ছিল। ভাষাদর্শন, সমাজদর্শন, ইতিহাসদর্শন, ন্যায়দর্শনের মতো সমাসবদ্ধ নামপদ আমরা অনেকদিন যাবৎই ব্যবহার করে আসছি। তা হলে কি ধরে নেওয়া যায় না যে ইতিপূর্বেও দর্শনশাস্ত্র অন্যান্য শাস্ত্রের সহকারী হয়েই সহযোগিতা করে এসেছে? বিনির্মাণের প্রবক্তারা বলবেন, দর্শনের সহযোগিতা ছিল খানিক দূরে থেকে, ভিন্ন আসনে বসে। এই সহযোগিতা সহগামিতাও নয়, অনুগামিতাও নয়। দার্শনিক

যেন অপরাপর শাস্ত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, একটা উচ্চাসন থেকে সহযোগিতার হাত বাড়ান—অনেকটা ঠিক সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির মতো। প্রতিটি শাস্ত্রবিদ যেন এক-একটি হাইকোর্ট। স্বক্ষেত্রে অতি নিপুণভাবে তাঁরা নিজস্ব প্রক্রিয়ায় কতকগুলি সিদ্ধান্তে এসে যান। পরবর্তী পর্যায়ে দার্শনিকের কাজ হল এই প্রক্রিয়ার উপযোগিতা, প্রাসঙ্গিকতা, বৈধতা বিচার করা আর সেইসঙ্গে এঁদের সিদ্ধান্তটিকেও বিচার করা। প্রথম পর্যায়ে প্রতিটি শাস্ত্র তার নিজ নিজ বিচার সেরে নিলে পরবর্তী পর্যায়ে দার্শনিক তাঁর বিচারে বসেন; এই কারণেই দার্শনিকের বিচারকে বলা যায়, মেটাডিস্‌কোর্স বা অতিবর্তী বিচার। অর্থাৎ দর্শনের যেন নিজস্ব কোনো বিষয় নেই; অপরের গবেষণার সিদ্ধান্তের ওপর খবরদারি করাই তার কাজ।

এ-হেন শ্রমবণ্টন ভারি অন্যায় মনে হতে পারে। কেউ ভাবতেই পারেন : আমার শাস্ত্র সম্বন্ধে আমি যতটা জানি একজন দার্শনিক তার চেয়ে বেশি জানেন কি? উত্তরে বলতে হয়, কোনো একটি শাস্ত্র সম্বন্ধে দার্শনিক কখনোই বেশি জানেন না—দার্শনিকের কারবার ওই 'জানা' ক্রিয়াটাকে নিয়ে। দার্শনিক যেসব বিষয় নিয়ে চর্চা করেন তার একটা মুখ্য বিষয় হল জ্ঞানতত্ত্ব বা এপিস্টিমোলজি। সহজ কথায় বলতে গেলে দার্শনিক চর্চা করেন জ্ঞান-সংশয়-বিশ্বাসের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে, এদের স্বরূপ এবং লক্ষণ নিয়ে।

দর্শনচর্চার এই ব্যাখ্যান শোনার পরেও বিস্ময় থেকে যেতে পারে। অভিযোগের সুরে প্রশ্ন করাই যায়, 'তা বলে দার্শনিককে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির সঙ্গে তুলনা করা হবে? দার্শনিক কি দণ্ডমুণ্ডের কর্তা? তাঁর নিজের কি ভুল হতে পারে না? তাঁর বিচার কে করবে?' দার্শনিক অবশ্যই ভুল করতে পারেন,—মানুষমাত্রেই ভুল করতে পারে—তবে দর্শনতত্ত্বে ভুল থাকলে চলবে না। দার্শনিকের তত্ত্ব কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ আশ্রয়-বাক্যের ওপর ভর করে গড়ে উঠবে। অন্তত আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের জনক আমাদের তাই শিখিয়েছেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়াতেই ফরাসি দার্শনিক দেকার্ত আমাদের শিখিয়েছেন যে আমরা যদি সতর্ক থাকি এবং ঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করি তা হলে আমরা সংশয়াতীত সত্যজ্ঞান অবশ্যই পাব। শুধু তাই নয়, কোন জ্ঞান সংশয়াতীত তা চিনে নেওয়ার চিহ্নও দেকার্ত আমাদের চিনিয়ে দিলেন। কোনো একটি জ্ঞান সংশয়াতীত হওয়া মানে এই নয় যে জ্ঞাতার মনে কোনো সংশয় নেই। সেভাবে দেখলে দেখা যাবে কোনো মৌলবাদীই তাঁর জ্ঞান সম্বন্ধে সংশয় পোষণ করেন না। সংশয়াতীত জ্ঞান

Scanned with

হবে যুক্তির দ্বারা সমর্থিত আর তাই অকাট্য; তার বিপক্ষে কখনোই কোনো বিরুদ্ধ যুক্তি দাঁড় করানো যাবে না।

এখানেই বিনির্মাণবাদীদের আপত্তি। তাঁরা যেহেতু জ্ঞানের আপেক্ষিকতা স্বীকার করেন, সেহেতু, কোনোরকম বনিয়াদি বা ফাউন্ডেশনাল জ্ঞান তাঁরা মানতে রাজি নন। সবরকম বনিয়াদি তত্ত্ব এবং তথ্যকে তাঁরা সন্দেহের চোখে দেখেন এবং চেষ্টা করেন বিনির্মাণ করতে। দার্শনিকরা নানা ধরনের বনিয়াদি ধারণাকে সমালোচনা করেছেন : কান্ট আক্রমণ করেছেন দেকার্তকে, হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইন বর্জন করেছেন ফ্রেগের অনেক কথা। এইসব বাদ-প্রতিবাদকে বিনির্মাণবাদীরা দেখেন ঘরোয়া কোঁদল হিসেবে। সত্যিকারের ঘর ভেঙে বেরিয়ে আসার ঝুঁকি নিয়ে এঁরা পরস্পরের সমালোচনা করছেন বলে তাঁরা মনে করেন না। এঁদের সবারই ঘর যুক্তির নিগড়ে বেষ্টিত। এঁরা যাই বলেন যুক্তি দিয়ে বলেন এবং মনে করেন যুক্তির সমর্থন থাকা মানে তা সত্য হওয়া।

আমরা এখানে পাশ্চাত্য দর্শনের যে ভাবনার ইতিহাস সাজাবার চেষ্টা করব তা বিশ্লেষণাত্মক যুক্তিবাদী দার্শনিকদের ভাবনার ইতিহাসের খণ্ডাংশ। এই আলোচনার ভেতর দিয়ে বোঝা যাবে কীভাবে যুক্তির সাহায্যে পূর্বপক্ষ খণ্ডন করা হয়েছে এবং যুক্তি দিয়েই কীভাবে আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করা হয়েছে। এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি বার বার ঘটায় বিনির্মাণবাদীরা জোর পাচ্ছেন : ঢালাও ফতোয়া তাঁরা জারি করছেন সব বনিয়াদী ভাবনার বিরুদ্ধে। যুক্তিবাদী দর্শন দেকার্ত থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর শেষ অবধি অনেক ঘাত-প্রতিঘাত অনেক আত্মসমালোচনার মধ্যে দিয়ে এসেছে, তা সত্ত্বেও তা বিনির্মাণবাদীদের আস্থাভাজন হতে পারছে না, কেন পারছে না, তা দেখা এই আলোচনার অন্যতম উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল দেখানো যে যুক্তিবাদী দর্শনের বিরোধিতা করলেও বিনির্মাণবাদীরা দর্শনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারছেন না। আমরা দেখব কেমন করে বনিয়াদি দর্শনের একটা পাল্টা প্রতিক্রিয়া বিনির্মাণের রূপ নিয়েছে। ইতিহাসের একটা একরৈখিক চালে কখনোই দর্শনভাবনা নির্মাণ থেকে বিনির্মাণে এসে পৌঁছোয়নি—ঠিক যেমনটি এই লেখায় হয়তো আভাস দেওয়া হচ্ছে। নানা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চাপের ভেতর দিয়ে গত চারশো বছরের ইতিহাস গড়ে উঠেছে। আমরা খুব মোটা দাগে এখানে নির্মাণ থেকে বিনির্মাণের যাত্রাপথ অনুসরণ করার চেষ্টা করছি। দেকার্তকে যেহেতু আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের জনক মনে করা হয় সেহেতু

আধুনিকোত্তরদের মনোযোগ ওঁর ওপরেই বেশি। দেকার্ত মনে করতেন, সংশয়াতীত জ্ঞানের পরিচয় হবে তার স্বচ্ছতা ও স্পষ্টতা। তিনি এও মনে করতেন যে এই স্বচ্ছতা ও স্পষ্টতার নিরিখেই সব জ্ঞানের গ্রহণযোগ্যতা বিচার করা যাবে। দেকার্ত তাঁর 'ডিসকোর্স অন মেথড' *(Discourse on Method)* বইটিতে সংশয়াতীত জ্ঞানের ওপর জ্ঞানের ইমারত গড়ার পন্থা-পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেন। জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনাকে দর্শনের কেন্দ্রে এনে দেকার্ত পাশ্চাত্য দর্শনের অভিমুখ বদলে দিলেন। এযাবৎ দর্শনের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল পরাবিদ্যা বা মেটাফিজিক্‌স। দার্শনিক সরাসরি জানতে চাইতেন, জগতের স্বরূপ কী? ঈশ্বরের সঙ্গে সৃষ্টির সম্পর্ক কী? ইত্যাদি। দেকার্ত বললেন, আমাদের শুরু করতে হবে 'আমি কী জানতে পারি?'—এই প্রশ্ন দিয়ে। আমাদের দেখতে হবে সংশয়াতীতভাবে আমি কী জানি। আমরা যা সংশয়াতীতভাবে জানি তা-ই হবে সত্য। সত্যজ্ঞানই হবে জগতের সঠিক প্রতিবিম্ব। তিনি মনে করলেন, মানুষের মন যেন জগতের আয়না, তাকে যত ঘষে মেজে স্বচ্ছ করা যাবে জগতের প্রতিবিম্ব তত নিখুঁত হয়ে তাতে ধরা পড়বে। দেকার্তের মতে মনকে স্বচ্ছ করার উপায় হল বিশুদ্ধ যুক্তির ওপর নির্ভর করা। প্রত্যক্ষণ, আবেগ, ইত্যাদির প্রভাবে আমাদের মন আবিল হতে পারে। আমাদের জ্ঞান যত যুক্তিনির্ভর হবে ততই তা স্বচ্ছ আর স্পষ্ট হবে; ততই জগৎকে আমরা সঠিকভাবে বুঝতে পারব।

দেকার্ত মনে করতেন, স্বচ্ছ ও স্পষ্ট জ্ঞান আমাদের হতে পারে। যাতে মানুষের স্বচ্ছ ও স্পষ্ট জ্ঞান হতে পারে তার জন্য ঈশ্বর নানাভাবে মানুষকে সাহায্য করেছেন। প্রথমত, ঈশ্বর মানুষকে স্বচ্ছ ও স্পষ্ট ধারণার অধিকারী হওয়ার ক্ষমতা দিয়েছেন কারণ ঈশ্বর দয়ালু। দ্বিতীয়ত, ঈশ্বর প্রতারক নন, সেহেতু তিনি আমাদের স্বচ্ছ ও স্পষ্ট ধারণার অনুরূপ জগৎ সৃষ্টি করেছেন; জগতের মধ্যে কোনো অন্তর্নিহিত অস্পষ্টতা (ইনট্রিনসিক ভেগনেস)-কে ঈশ্বর ঠাঁই দেননি। তাছাড়া, আমরা বিশ্বাস করতে পারি যে আমাদের বোধের অনধিগম্য করে ঈশ্বর কখনোই জগৎ সৃষ্টি করবেন না।

ঈশ্বরের এত সাহায্য সত্ত্বেও কিন্তু একটা সমস্যা থেকে যায়। জগৎকে সচরাচর আমরা অভিজ্ঞতা দিয়েই জেনে থাকি আর দেকার্তের মতে আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান নির্ভরযোগ্য নয়। তা হলে কি পার্থিব জগৎকে আমরা প্রত্যক্ষণ দিয়ে জানি না, যুক্তি দিয়ে জানি? দেকার্তের মতে জগতের মধ্যে তার মূল সূত্র গাণিতিক পরিভাষায়

Scanned with

বিধৃত হয়ে আছে আর ঈশ্বর আমাদের যে যৌক্তিক ক্ষমতা দিয়েছেন তা দিয়ে আমরা এই রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারি।

তা হলে দেখা যাচ্ছে মানুষের স্বচ্ছ ও স্পষ্ট জ্ঞান হওয়ার জন্য যেসব শর্ত বা কারণাংশ মুখ্যত প্রয়োজন তা দেকার্তের মতে ঈশ্বর আমাদের মঞ্জুর করেই রেখেছেন। তিনি আমাদের সঠিকভাবে জানার ক্ষমতা দিয়েছেন আর সেইসঙ্গে জগৎকে সঠিকভাবে জানার উপযোগী করে গড়েছেন। দেকার্তের এই ব্যাখ্যার দরুন জ্ঞানতত্ত্বের চর্চা দর্শনের কেন্দ্রস্থলে এল। জ্ঞানতত্ত্বের চর্চা প্রাধান্য পেলেও মানুষ জ্ঞাতা হিসেবে সম্পূর্ণ স্বনির্ভর হয়নি। স্বচ্ছ ও স্পষ্ট ধারণা পাওয়ার জন্য পরোক্ষভাবে তাকে ঈশ্বরের কৃপার ওপর ভরসা করতে হল। দেকার্তের কথা যদি ঠিক হয়, তা হলে ঈশ্বরের দয়ার ওপর মানুষের স্বচ্ছ ও স্পষ্ট জ্ঞানলাভ নির্ভর করে।

দেকার্তের প্রায় একশো বছর পরে কান্ট জ্ঞানতত্ত্বকে দর্শনের মুখ্য আলোচনার বিষয় হিসেবে স্বীকার করেও মানুষকে তার অপেক্ষাকৃত গৌণ ভূমিকা থেকে মুখ্য ভূমিকায় নিয়ে এলেন। কান্ট মনে করলেন, মানুষের সক্রিয় অবদান ছাড়া কোনো জ্ঞানই সম্ভব নয়। দেকার্তের জ্ঞাতার মতো মানুষ শুধু সত্য উন্মোচন করে চলে না, বিশ্বের মতো মানুষ জ্ঞানের নিষ্ক্রিয় গ্রহীতা নয়, মানুষ সক্রিয়ভাবে জগৎকে বুদ্ধিগ্রাহ্য করে তোলে। মানুষের দেওয়া বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাখ্যার ফলে জগতের প্রকৃত স্বরূপ বিকৃত হতে পারে, তবু মানুষ নিরুপায়; তাকে তার মতো করে জগৎকে বুঝে নিতে হয়। জগতের প্রকৃত স্বরূপ কী, আমরা জানি না, কোনোদিন জানতেও পারব না। আমরা চিরকাল জগৎকে জানব আমাদের আরোপিত কতকগুলো গঠন ও বিন্যাসের মধ্যে দিয়ে। জগৎকে ব্যাখ্যা করা বা বোঝার জন্য আমরা আমাদের মতো করে যুক্তি দিয়ে আমাদের জগৎকে বিন্যস্ত করি। এই বিন্যাস কিন্তু আমাদের কল্পনার ফসল নয়। কবিকে সমর্থন করে কান্ট কখনোই বলবেন না 'আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ, / চুনি উঠল রাঙা হয়ে'।

কান্ট মনে করেন, আমাদের সমস্ত জ্ঞানজ ক্রিয়ায় যুক্তি জাল বিস্তার করে আছে। ফলে আমাদের যুক্তি জগতের বিভিন্নতাকে নির্দিষ্ট কতগুলি বিন্যাসে নির্দিষ্ট নিয়মমাফিক সাজায়। আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়-উপাত্ত থেকে পাওয়া বৈচিত্র্যকে দেশ ও কালের মাত্রা দিয়ে বিন্যস্ত করি (দেশ ও কাল আমরা পাই ইনটুইশন থেকে)। এরপর এক-এক করে পরিমাণ, গুণ, সম্বন্ধ, ইত্যাদি কনসেপ্ট বা ধারণা প্রয়োগ করে

অভিজ্ঞতালব্ধ জগৎকে বুঝি। যে ধারণা বা কনসেপ্ট (কান্টের পরিভাষায় এগুলি 'ক্যাটিগরি') প্রয়োগ করে আমরা আমাদের অভিজ্ঞতাকে বুঝি সে ধারণাগুলি কিন্তু আমরা অভিজ্ঞতা থেকে পাই না, এগুলি অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ ধারণা। মানুষ বৌদ্ধিক জীব হওয়ার দরুন এই ধারণাগুলি তার থাকে। কান্ট মনে করেন, এই ধারণাগুলির সঙ্গে অ্যারিস্টটলের লজিকের ফর্মের আশ্চর্য মিল রয়েছে। তাঁর মতে প্রতিটি লজিকের ফর্মের অনুরূপ আমাদের একটি করে ধারণা আছে, আর প্রতিটি ধারণার অনুরূপ একটি করে লজিকের ফর্ম রয়েছে।

কান্টের কাছে একটিই লজিক গ্রাহ্য ছিল; অ্যারিস্টটলের দ্বিমাত্রিক ধ্রুপদী লজিক। দ্বিমাত্রিক, কারণ এই লজিকে একটি বচনের দুটিমাত্র সম্ভাব্য মাত্রা থাকতে পারে—রচনাটি হয় সত্য নয় মিথ্যা হবে, এই দুটি কোটি ছাড়া আর কোনো যৌক্তিক দেশ নেই। কাজেই জগতের বিভিন্নতাকে যখন বিভিন্ন ক্যাটিগরিতে সাজানো হবে তখন স্পষ্ট সাদা-কালো রেখা দিয়ে বর্গ-বিভাজনের সীমা টানতে হবে। অর্থাৎ যে-কোনো বস্তু 'ক' সম্বন্ধে আমরা বলতে পারি যে 'ক'-এর স্থান 'ঙ'-এর কোটিতে অথবা 'ঙ'-এর বিপরীত কোটিতে। এই দুই-এর মাঝামাঝি আর তৃতীয়-চতুর্থ-পঞ্চম কোনো স্থান নেই। এই জায়গায় ন্যায়-বৈশেষিকদের সঙ্গে কান্টের একটা সাদৃশ্য রয়েছে। বৈশেষিকরা যখন পদার্থ বিচার করেন তখন সাংকর্য স্বীকার করেন না। সাংকর্য স্বীকার করলে গোত্ব ও অশ্বত্বের একত্র সমাবেশ স্বীকার করতে হয়। একটা সাম্প্রতিক উদাহরণ নিলে বলতে হয় : বাঘ (টাইগার) আর সিংহ (লায়ন) মিলে যখন টাইগন জন্মায় তখন তা একটা নতুন জাতি বলে গণ্য হওয়া উচিত—দুই সামান্যের বা জাতির সমাবেশ এটা নয়। আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে কোনো কোনো দার্শনিক vague object স্বীকার করেন, এই অবজেক্ট-কে কোনো একটি বিশেষ কোটিতে ফেলা যায় না। দুই কোটির সীমাবর্তী অঞ্চলে তাদের অধিষ্ঠান। আংলকারিক অর্থে বলা যায়, এদের অবস্থান সাদা আর কালোর মধ্যবর্তী এক ধূসর অঞ্চলে। এমন একটা ধূসর অঞ্চল মানলে দ্বিমাত্রিক লজিকের অসুবিধে হয়।

লজিকের নিয়ম আর আমাদের জগৎকে সাজানোর নিয়মের মধ্যে কান্ট কোনো পার্থক্য দেখতে পান না। লজিকের নিয়মানুসারে আমরা আমাদের জগৎকে বিন্যস্ত করি ওই লজিকানুগ কতগুলি ক্যাটিগরি দিয়ে। শুধু তা-ই নয়, এই ক্যাটিগরি বাদ দিয়ে আমরা চিন্তা করতে পারি না। যাতে কোনো ক্যাটিগরি লাগে না—যার গুণ নেই,

Scanned with

পরিমাণ নেই, সম্বন্ধ নেই—এমন কিছুর কথা আমরা চিন্তা করব কী করে? তাকে বুঝব কী করে? তাই কান্ট বলেন অভিজ্ঞতাকে বোধগম্য করার জন্য আমাদের ক্যাটিগরি প্রয়োজন: 'We need categories to make the experience of an object thinkable.'

বিভিন্ন ক্যাটিগরির মধ্যে কান্ট একটি অন্তর্লীন সম্পর্ক বা ইন্টার্নাল রিলেশন স্বীকার করেন। এই অন্তর্লীন সম্পর্কযুক্ত ক্যাটিগরিমণ্ডলকে ক্যাটিগরিয়াল ফ্রেমওয়ার্ক বা ক্যাটিগরি-কাঠামো বলা হয়। এই ক্যাটিগরি বা তাদের অন্তর্লীন সম্পর্ক কোনোটাই আমরা অভিজ্ঞতা থেকে পাই না, পাই অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষভাবে। এগুলি সর্বজনীন ও আবশ্যিক ক্যাটিগরি। কান্ট মনে করেন যে অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ ধারণামাত্রই আবশ্যিক এবং ক্ষেত্রনির্বিশেষে সত্য; প্রতিতুলনায় বলা যায়, অভিজ্ঞতা-নির্ভর ধারণামাত্রই সম্ভাব্য; এগুলি ক্ষেত্রবিশেষে সত্য বা মিথ্যা হতে পারে। অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ ধারণা এবং অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ ধারণার মধ্যে প্রথম পার্থক্য করেছিলেন দেকার্ত। সাম্প্রতিককালে এই দ্বিবিভাজনের কথা বললেই কান্টের প্রসঙ্গ চলে আসে।

পাশ্চাত্য দর্শনের আধুনিক পর্ব শুরু হয় দেকার্ত আর কান্টের অবদান দিয়ে। আধুনিকরা মনে করলেন, সচেতনভাবে দর্শনচর্চার একটা নির্দিষ্ট অন্বেষণের পদ্ধতি ছকে দেওয়াই দার্শনিকের কাজ। এই অন্বেষণের গোড়াতে থাকবে সংশয়, তারপর এক-এক করে প্রতিটি বিষয়ের কার্য-কারণ বুঝতে হবে; বুঝে নিয়ে প্রতি বিষয়ের একটা যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিতে হবে। এককথায়, কোনো সিদ্ধান্তে আসার আগে গোটা বিষয়টাকে যাচাই করে নেওয়া চাই। সুকুমার রায়ের মতো 'গোড়ায় তবে দেখ্‌তে হবে কোত্থেকে আর কী করে।'

আধুনিকদের শত্রু দুজন: যারা অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে কখনোই প্রশ্ন তোলে না; আর যারা প্রশ্ন করা থেকে কখনোই বিরত হয় না। অর্থাৎ 'ডগ্‌ম্যাটিকরা' আর 'স্কেপ্‌টিকরা'। এই দুই বিপরীত চাপ সামলাতে গিয়ে আধুনিকদের মনে হল দর্শনচর্চা আরম্ভ করতে হবে জিজ্ঞাসা দিয়ে আর শেষ করতে হবে সমে এসে। সব সংশয়ের নিরসন হলেই একমাত্র ইতি টানা যাবে, তার আগে নয়। এমন পরিকল্পনার কথা ভাবতে ভালোই লাগে; তবু প্রশ্ন থেকেই যায়—এটা কি সম্ভব? যাঁরা সংশয়ের চূড়ান্ত নিরসনের কথা বলেন, তাঁরা উত্তর খোঁজেন কোনো আধিভৌতিক স্তরে অথবা

কোনো অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ যুক্তির কোটিতে। বিনির্মাণবাদীরা মনে করেন, সত্যিই কোনো তত্ত্বের বা ব্যাখ্যার এমন চূড়ান্ত বৈধতা (লেজিটিমেশন) থাকতে পারে না। দার্শনিকরা তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়ার নামে একটা গল্প ফাঁদেন আর সেই গল্পের বৈধতা জোগাতে গিয়ে আর-এক গল্প ফাঁদেন। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের গল্পটি একটি মেটা-ন্যারেটিভ (meta-narrative)। বিনির্মাণবাদীরা মনে করেন, মেটান্যারেটিভ দেওয়ার চেষ্টা যাঁরা করেন তাঁরা আধুনিক আর এই দ্বিতীয় স্তরের ব্যাখ্যার ফাঁকি যাঁরা ধরিয়ে দিতে চান তাঁরা আধুনিকোত্তর বা পোস্ট-মডার্ন।

আমরা বলছিলাম কান্টের কথা। কান্টের অব্যবহিত পরে এল একটা কান্ট-বিরোধী প্রকৃতিবাদী ঢেউ। ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে একদল মনোবিজ্ঞানী প্রস্তাব করলেন যে দার্শনিকদের মূল আলোচ্য বিষয় যদি হয়ে থাকে 'নিশ্চিত জ্ঞান পাওয়া সম্ভব কিনা' বা 'নিশ্চিত জ্ঞান পাওয়ার উপায় কী', তা হলে দার্শনিকরা অনধিকারচর্চা করছেন। এ সমস্যার সমাধানের জন্য দার্শনিকের দ্বারস্থ হয়ে লাভ নেই, এর জন্য আসতে হবে মনোবিজ্ঞানী বা নৃতাত্ত্বিকের কাছে, তাঁরাই এইসব প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিতে পারেন। কান্ট যে এই দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন না তা নয়। তবু তিনি মনে করতেন যে তাঁর জ্ঞানজ প্রক্রিয়ার আলোচনা আদ্যন্ত দার্শনিক আলোচনা, তার সঙ্গে মনস্তত্ত্বের যোগ তেমন নেই। মনোবিজ্ঞানের কোটিতে জ্ঞানজ প্রক্রিয়ার আলোচনা চলে গেলে আমাদের নিজ নিজ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার চর্চা করা ছাড়া উপায় থাকবে না, তখন দেশ-কালের প্রেক্ষিতে জ্ঞানের ব্যাখ্যা দিতে হয়। জ্ঞানজ প্রক্রিয়ার কোনো অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ সামান্য ধর্ম আছে বলে আর দাবি করা যাবে না। তার মানে, আবারও, আমরা কী জানি? এবং কীভাবে জানি? এইসব প্রশ্নের আবশ্যিক নিশ্চিত ব্যাখ্যা পাব না। কতকগুলো তাৎক্ষণিক আর আপেক্ষিক ব্যাখ্যা নিয়ে আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে অনেকে কান্টের বিরোধিতা করলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে আবার কান্ট-চর্চার ঝোঁক ফিরে এল। ১৮৬৫-তে অটো লাইব্‌ম্যান ধুয়ো তুললেন 'কান্টে ফিরে চলো' (ব্যাক টু কান্ট)। কান্টের দর্শনে কেউই কোনোদিন পুরোপুরি ফিরে যাননি। তবে তাঁর দর্শনের কয়েকটি মৌলিক ধারণা, বিতর্কিত হলেও, আজও আমাদের ভাবনায় রয়ে গেছে—বিশেষ করে, তিনি যেভাবে আমাদের অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ বিচার আর অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ বিচারের

Scanned with

মধ্যে পার্থক্য করতে শিখিয়েছেন বা যেভাবে বলেছেন কোনো জ্ঞানই মনন-নিরপেক্ষ নয়।

কান্টের 'ক্রিটিক অব পিওর রিজন' (*Critique of Pure Reason*) লেখা হয় ১৭৮১-তে, তার প্রায় একশ বছর পরে ১৮৭৯-তে জার্মান দার্শনিক গট্‌লব ফ্রেগে (Gottlob Frege 1848-1925) তাঁর *Begriffschrift* লেখেন। সাম্প্রতিক পাশ্চাত্য দর্শনের রূপকারদের মধ্যে ফ্রেগে অন্যতম। দেকার্ত বা কান্টের মতোই গুরুত্বপূর্ণ তাঁর অবদান। দেকার্তকে যেমন আধুনিক দর্শনের জনক বলা হয়, তেমনি ফ্রেগেকে মনে করা হয় ইঙ্গ-মার্কিন বিশ্লেষণাত্মক দর্শনের জনক। কী করে তিনি জার্মান মুলুকে বসে, জার্মান ভাষায় দর্শনচর্চা করে ইংরেজিভাষী দার্শনিকদের প্রভাবিত করলেন তার ইতিহাস কিঞ্চিৎ জটিল। ফ্রেগের দর্শনভাবনার নিয়তি বিচিত্র ও আপাতবিরোধী। তাঁর দর্শনভাবনা যুগপৎ উপেক্ষিত এবং প্রভাবশালী। উপেক্ষিত, কারণ তাঁর অনেক লেখার জন্য তিনি প্রকাশক পাননি; নিজের দেশে তাঁর লেখার তীব্র সমালোচনা তাঁকে সহ্য করতে হয়, আর এইসব মিলিত কারণেই হয়তো তিনি কর্মজীবনে উন্নতি করতে পারেননি। ব্রিটিশ দর্শনমহলে ফ্রেগে পরিচিতি লাভ করেন বার্ট্রান্ড রাসেলের (Bertrand Russell 1872-1970) মধ্যস্থতায়। তাঁর লেখা পড়ে সবিশেষ উত্তেজিত হয়ে রাসেল তাঁকে চিঠি লেখেন ১৯০২-তে। তারপর চিঠির মাধ্যমে চলে তাঁদের লজিকের নানা কূট প্রশ্নের চুলচেরা বিচার। রাসেল তাঁর 'প্রিন্‌সিপিয়া ম্যাথেমাটিকা' (*Principia Mathematica*) গ্রন্থে ১৯১০ সালে লেখেন 'লজিকের সব প্রশ্নে আমরা মুখ্যত ফ্রেগের কাছে ঋণী'। এর পর তাঁর ছাত্র হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইনকে (Ludwig Wittgenstein 1889-1951) লজিক শেখার জন্য তিনি ফ্রেগের কাছে পাঠান। হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইন অনেক জায়গায় ফ্রেগের কাছে তাঁর ঋণ স্বীকার করেছেন, যেখানে করেননি সেখানেও ফ্রেগের প্রভাব সুস্পষ্ট। শুধু হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইন আর রাসেল নন, এঁদের মাধ্যমে বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে আজ অবধি ব্রিটেন ও আমেরিকার দার্শনিকদের ওপর ফ্রেগে প্রভাব বিস্তার করেই চলেছেন।

ছাত্রাবস্থায় ফ্রেগের মুখ্য অনুশীলনের বিষয় ছিল গণিত, গৌণ বিষয় হিসেবে তিনি রসায়ন ও দর্শনের পাঠ নেন। গণিতের পথ দিয়েই তাঁর দর্শনে প্রবেশ। গণিতের জন্য তিনি খুঁজছিলেন একটা অকাট্য ভিত্তি বা চূড়ান্ত বনিয়াদ। তাঁর মনে হল গণিত তার নিজের চূড়ান্ত বনিয়াদ জোগাতে পারবে না ; এর জন্য লজিকের সাহায্য লাগবে।

সে যুগে মূলত অ্যারিস্টটলের লজিকের প্রচলন ছিল। ফ্রেগে দেখলেন, এই লজিক দিয়ে তাঁর কাজ চলবে না; কারণ অ্যারিস্টটলের লজিকে যে-জাতীয় অনুমানের পদ্ধতি স্বীকার করা হয়েছে তা আমাদের দৈনন্দিন লৌকিক প্রয়োগের উপযোগী হলেও গণিতের পক্ষে অনুপযোগী। অ্যারিস্টটলের লজিকে কথ্যভাষার প্রভাব অত্যন্ত বেশি। কথ্যভাষায় আমরা যেভাবে শব্দবিন্যাস করি বা শব্দবিন্যাসের যেসব বিধি ব্যবহার করি সেইসব বিধি-ই যেন তাঁর লজিকের নিয়মের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

ফ্রেগে মনে করলেন যে কথ্যভাষার কাঠামো আর গণিতের কাঠামো এক নয়; তাই তাঁকে তৈরি করতে হল তাঁর নিজের লজিক আর সেইসঙ্গে ফ্রেগে দিলেন এই লজিকের উপযোগী একটি স্ক্রিপ্‌ট্ বা লিপি। এই স্ক্রিপ্‌টের উদ্দেশ্য আমাদের বিভিন্ন ধারণা লিপিবদ্ধ করা। এই লিপির পারিভাষিক নাম জার্মান ভাষায় 'বেগ্রিফ্‌শ্রিফ্‌ট' যার ইংরেজি অনুবাদ করা হয়েছে 'কন্‌সেপচুয়াল স্ক্রিপ্‌ট্'। বেগ্রিফ্‌শ্রিফ্‌ট বিশুদ্ধ মননের ভাষা (ল্যাঙ্গুয়েজ অব পিওর থট) ; এই ভাষা ধারণাগত বক্তব্যের প্রতিফলন (কন্‌সেপচুয়াল কনটেন্ট অব এ জাজমেন্ট)। 'বেগ্রিফ্‌শ্রিফ্‌ট' লেখার অনেক পরে ফ্রেগে 'বেগ্রিফ্' (কনসেপ্ট বা ধারণা) আর 'গেডাঙ্কে'-র (থট বা মনন) পার্থক্য আলোচনা করেন। ফ্রেগের মতে কনসেপ্ট (বেগ্রিফ্) হল একটি বিধেয়ের রেফারেন্স বা নির্দেশ; আর থট (গেডাঙ্কে) হল একটি সম্পূর্ণ বাক্যের সেন্স বা অর্থ। এটিও একটি পারিভাষিক শব্দ যা মনস্তত্ত্বের পরিচিত 'থট' থেকে পৃথক। ফ্রেগের 'থট' বিশুদ্ধ মনন ভিন্ন কিছু নয়, এর কোনো মানসিক অনুষঙ্গ নেই। তিনি মনে করতেন, লজিকের সম্পর্ক থটের ফর্ম বা স্বরূপের সঙ্গে। থটের ফর্ম থেকে আমরা সব সত্যের বিধি ('লজ্ অব ট্রুথ'), পেয়ে যাই এবং এই বিধি সর্বত্র প্রযোজ্য (ইউনিভার্সালি অ্যাপ্লিকেব্‌ল্)। ফ্রেগে বলেন, সব বিজ্ঞানই সত্যের অন্বেষী কিন্তু লজিক সত্যের নিয়ামক-বিধির অন্বেষী। একবার এই সত্যের বিধি বুঝে নিতে পারলে বিভিন্ন প্রসঙ্গ আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে। যেমন, আমরা বুঝব কী করে একটি ভাষার অর্থনির্ণয় করতে হয়। বুঝে যাব, ভাষাগত অর্থ (সেন্স) ও ভাষাগত নির্দেশ (রেফারেন্স)-এর পার্থক্য কী, তাদের মধ্যে সম্পর্কই বা কী। বুঝব, বিভিন্ন ধারণার অন্তর্লীন সম্পর্ক ; যেমন, সত্যের সঙ্গে অর্থের সম্পর্ক এবং উভয়ের সঙ্গে আবশ্যিকতার সম্পর্ক, ইত্যাদি। এইভাবে আমরা যুগপৎ গণিতের ভিত্তি কী তা বুঝব আর জগতের স্বরূপ কী তা-ও বুঝতে পারব।

Scanned with

ফ্রেগেই প্রথম ভাষাচর্চার দিকে দর্শনের অভিমুখ ঘুরিয়ে দিলেন। একদিক থেকে দেখতে গেলে এই পদক্ষেপ যুগান্তকারী ঠিকই; আবার আর-এক দিক থেকে দেখলে বোঝা যায়, দর্শনের মূল প্রশ্ন একই থেকে যাচ্ছে; 'স্বচ্ছ আর স্পষ্টভাবে আমরা কী জানতে পারি?' আধুনিক যুগের প্রথম পর্বে দেকার্ত আর কান্ট মনে করেছিলেন, এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে জ্ঞানের স্বরূপ বিচার করে; ফ্রেগে এবং ফ্রেগের পরের দার্শনিকরা মনে করলেন, এই প্রশ্নের উত্তর ভাষার দিকে মনোযোগ দিলে পাওয়া যাবে। কারণ ভাষা যুগপৎ মন ও বাহ্য জগতের প্রতিবিম্ব। ভাষারূপী প্রতিবিম্ব সত্যনিষ্ঠ হোক বা না-হোক, ভাষার ওপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই। ভাষার মাধ্যমেই একমাত্র জগৎকে জানার চেষ্টা করা যায়। দেকার্ত বলেছিলেন, মানুষের মন জগতের প্রতিবিম্ব। মানুষের মন বড়ো রহস্যময়। এ নিয়ে ঠিক সাবলীলভাবে সর্বজনগ্রাহ্য দর্শন হয় না। প্রতিবিম্বের উপমা বজায় রেখে, ভাষাকে মনের স্থলাভিষিক্ত করে আলোচনাটাকে যেন লোকচক্ষুর অন্তরাল থেকে লোকচক্ষুর সম্মুখে আনা গেল—চলে আসা হল মনোজগৎ থেকে ভাষার রাজ্যে। এতে করে পরিবেশ বদল হলেও পরিস্থিতির বড়ো একটা বদল হয়নি।

কান্ট জগৎটাকে দেখছিলেন ধারণার ভেতর দিয়ে। ফ্রেগে, রাসেল এবং গোড়ার দিকে হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইন মনে করছেন, ভাষাই কনসেপ্টের বাহক ; ফলে, এঁরা জগৎটাকে দেখছেন বা চিনছেন ভাষার ভেতর দিয়ে। তলিয়ে দেখতে গেলে এঁরা সকলেই কনসেপ্টের জাল বিস্তার করে জগৎটাকে বুঝবার চেষ্টা করছেন। জালের উপমাকে আর একটু এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। জালের ফুটোগুলো যদি গোল-গোল হয় তা হলে তার ভেতর দিয়ে জগৎ একরকম দেখাবে; আর যদি বরফির মতো হয় আর-এক রকম দেখাবে জগৎ। দেকার্ত, কান্ট, ফ্রেগে এবং এই ঘরানার পূর্ববর্তী দার্শনিকরা—যেমন, প্লেটো, অ্যারিস্টটল—ও সাম্প্রতিক কালের নব্য কান্টপন্থীরা—যেমন, কার্নার, স্ট্রসন,—নানারকম যুক্তির জাল বা কনসেপ্টের জালের কথা বলেছেন। কেউ বলতেই পারেন, দেশ ও কালকে নিউটনের মতো করে ভাবতে হবে; কেউ বলতে পারেন, আইনস্টাইনের মতো করে দেশ-কালকে সাপেক্ষধর্মী ভাবতে হবে। কল্পনার ডানা মেললে অনেক কিছুই সম্ভব মনে হতে পারে।

প্রশ্ন হচ্ছে : এদের মধ্যে কোন ব্যাখ্যাটা ঠিক? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারলে কোনো বিষয়ে চূড়ান্ত ব্যাখ্যা মিলবে না। গোড়ায় আমরা প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলাম

দার্শনিক আমাদের দেখাবেন কী করে ব্যাখ্যার সমে এসে থামতে হয়; অথচ বাস্তবে আমরা যেন এক অনন্ত অনেকান্তের অবস্থা স্বীকার করে যাচ্ছি। এই পরিস্থিতি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার বহুলপ্রচলিত একটা সমাধান হল: আপাত-স্বরূপ আর প্রকৃত-স্বরূপের মধ্যে প্রভেদ টেনে বলা, যেখানে আপাত-বিভেদ চোখে পড়ে সেখানে আদতে পার্থক্য নেই। ঠিক যেমন একটি বাক্যকে আপাতদৃষ্টিতে যে-জাতীয় মনে হয় প্রকৃতপক্ষে বাক্যটি সে-জাতীয় না-ও হতে পারে, একটি বাক্যের আকার দেখে মনে হতে পারে তা প্রশ্নসূচক অথচ তলিয়ে দেখলে হয়তো দেখা যাবে তা বর্ণনাত্মক বাক্য।

হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইন তাঁর *Tractatus Logico-Philosophicus* (১৯২১) গ্রন্থে খুব জোর দিয়ে এই মত পোষণ করেন। তিনি বলেন, সব ভাষার একই যৌক্তিক আকার বা লজিকাল ফর্ম—সেটা প্রচলিত ভাষাই হোক, বা কাল্পনিক কোনো ভাষাই হোক। কারণ তাঁর মতে ভাষা জগতের প্রত্যয়িত প্রতিচ্ছবি : সে জগৎ বাস্তব জগৎই হোক, বা সম্ভাব্য-জগৎই হোক। সব জগতের উপাদান এক; উপাদান বিন্যাসের নিয়মও এক। জগতের প্রতিটি উপাদানের নিজস্ব ধর্ম আছে, যার দ্বারা পূর্ব-নির্ধারিত হয়ে থাকে কোন উপাদানের সঙ্গে কোন উপাদান যুক্ত হবে। যেমন : যে-উপাদানের রঙ আছে, তা যুক্ত হতে পারে দেশ-যুক্ত উপাদানের সঙ্গে; সুর-যুক্ত উপাদানের সঙ্গে নয়। কোনো বাস্তব বা কল্পিত জগতে কখনোই আমরা এমন উপাদানের সংযোজন পেতে পারি না যার ফলে আমরা পেয়ে যাব 'লাল গানে নীল সুর হাসি হাসি গন্ধ'। হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইন বলবেন, এমন জগৎ কল্পনা করারও প্রশ্ন ওঠে না; কারণ এমন জগৎ সম্ভবপর নয়। সব জগতের একই ফর্ম।

হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইনের মতে ফর্ম হল গঠন বা স্ট্রাকচরের সম্ভাবনা ('ফর্ম ইজ দ্য পসিবিলিটি অব স্ট্রাকচর') আর গঠন বা স্ট্রাকচর হল ফর্মের বাস্তবায়ন (স্ট্রাকচর ইজ দ্য অ্যাকচুয়ালাইজেশন অব ফর্ম)।

একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটাকে আর-একটু স্পষ্ট করা যায় : দুটো বাক্য তুলনা করা যাক : 'রাম যদুকে মেরেছে' আর 'যদু রামকে মেরেছে'। হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইন বলবেন, দুটো বাক্যের ফর্ম এক। দুটিতেই একটি কর্তা, একটি কর্ম ও একটি ক্রিয়াপদ আছে; অথচ বাক্য দুটির স্ট্রাকচর ভিন্ন, একটিতে রাম কর্তা, অন্যটিতে যদু কর্তা। হ্বিট্‌গেনস্টাইন যখন বলেন, বাস্তব জগৎ আর সম্ভাব্য জগতের যৌক্তিক ফর্ম এক, তখন দুটি জগৎ হুবহু এক তা বলছেন না। ফর্ম এক হয়েও স্ট্রাকচর ভিন্ন হতে পারে।

এর সঙ্গে আমাদের চিন্তার বা কল্পনার সীমাবদ্ধতার কোনো সম্পর্ক নেই—এমন জগৎ হতে পারে না যেখানে লাল গানে নীল সুর লাগে।

এখানে কান্টের সঙ্গে হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইনের মতপার্থক্য লক্ষণীয়। কান্ট বললেন, জগতের প্রকৃত স্বরূপ আমরা কখনোই জানি না, জানতেও পারব না। আমরা আমাদের চিন্তার কাঠামোর কথা বলতে পারি—সেই কাঠামো অপরিবর্তনীয়। আমাদের চিন্তার কাঠামোর মধ্যে দিয়ে আমরা জগতের স্বরূপ বোঝবার চেষ্টা করি কিন্তু আমাদের এই বোঝাটাই ঠিক কিনা আমরা জানতে পারি না। অন্য পক্ষে, হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইন বলছেন, জগতের যে গঠন, সেই গঠনই আমাদের ভাষারও গঠন এবং আমাদের চিন্তারও গঠন।

জগৎ, ভাষা ও মননের সাযুজ্যের কথা বলে অনেককে সন্তুষ্ট করতে পারলেও সংশয়বাদীদের সন্তুষ্ট করা যাবে না। জগৎ, ভাষা আর মনন এক সূত্রে গাঁথা রয়েছে এবং তিনেরই গঠন এক বললেই সংশয়বাদীরা তা মেনে নেবেন না, প্রমাণ চাইবেন। হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইন নিজেও এই মত বেশি দিন মানতে পারেননি। তিনি টের পেলেন যে সকলের চিন্তার কাঠামো এক নয়। এমন কি, এক ভাষায় কথা বললেও একের ভাষা অপরে বুঝতে পারে না। ভিয়েনা থেকে যুদ্ধের পরে ইংল্যান্ডে এসে তাঁর এই তিক্ত অভিজ্ঞতা হল (তাঁর অন্যতম জীবনীকার রে মঙ্ক ব্রিটেনপ্রবাসী হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইনের এই তিক্ত অভিজ্ঞতার অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য ছবি তুলে ধরেছেন)।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে গিয়ে ১৯৩০ নাগাদ হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইন বলতে আরম্ভ করলেন, সব কথারই একটা উপযুক্ত অনুষঙ্গ আছে, কোনো কথারই অনুষঙ্গ-নিরপেক্ষ অর্থ নেই। এইজাতীয় কথা আমরা এর আগে ফ্রেগের অনুষঙ্গ-ধারণা বা কনটেক্সট প্রিন্সিপ্‌ল্‌-এর মধ্যে পেয়েছি। গোড়ার দিকে হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইনও এই মত পোষণ করতেন। ফ্রেগে-হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইনের অনুষঙ্গ-ধারণা খুব সীমিত ছিল। তাঁদের বক্তব্য ছিল, একটি পদের স্বতন্ত্রভাবে কোনো অর্থ নেই, একমাত্র বাক্যের অনুষঙ্গে পদ তার অর্থ খুঁজে পায়; 'অনুষঙ্গ' বলতে কেবল এইটুকুই বোঝাতেন তাঁরা। 'ট্র্যাক্‌টেটাস' লেখার পরে হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইনের ধারণা পাল্টাতে থাকে। তিনি মনে করতে শুরু করেন, অর্থ-সঞ্চারের ন্যূনতম বাহন বাক্য হতে পারে না, বাক্যেরও অনুষঙ্গ জানতে হবে। প্রতিটি বাক্যকে আমাদের সমগ্র জীবন-যাপনের প্রেক্ষাপটে (ফর্ম অব লাইফ-এ) রেখে বুঝতে হবে। সমগ্র জীবন-যাপনের প্রেক্ষাপটের ধারণা

হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইনের একান্ত নিজস্ব। 'জীবন-যাপনের প্রেক্ষাপট' একটা বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেন তিনি। 'জীবন-যাপনের প্রেক্ষাপট' আমাদের সমস্ত চিন্তা, ভাবনা ও ভাষাপ্রয়োগের প্রেক্ষাপট হিসেবে কাজ করে, প্রতিটি প্রয়োগকে এর নিরিখে বুঝতে হয়। অনেকটা ঠিক প্রতিমার চালচিত্রের মতো।

'জীবন-যাপনের প্রেক্ষাপটের' উল্লেখ করা মানেই ভাষার প্রয়োগের দিকে তাকানো; ফ্রেগের মতো ভাষার প্রয়োগ-নিরপেক্ষ ধারণার দিকে তাকানো নয়; ভাষার ব্যবহারের দিকে নজর দেওয়া। হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইন তাঁর ফিলসফিকাল ইনভেস্টিগেশনস-এ বললেন, ভাষার প্রয়োগ-নিরপেক্ষ কোনো রূপ নেই। নানা প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে ভাষা তৈরি হয়। ফলে দেকার্তের মতো কোনো স্বতঃসিদ্ধ সত্য বা ফ্রেগে-কান্টের মতো কোনো অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ ধারণা থাকতে পারে না। ভাষা নিয়ে এই নতুন ভাবনাচিন্তার কথা হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইন তাঁর কেম্ব্রিজের ছাত্রদের ক্লাসে বলেন, ইতস্তত লিখেও রাখেন, কিন্তু ছাপতে রাজি হননি। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর ছাত্রছাত্রীরা এইসব লেখা অনুবাদ করেন ও ছাপেন। তাঁর এই মরণোত্তর প্রকাশনের মধ্যে প্রথম মুদ্রিত হয় 'ইনভেস্টিগেশন্স' (*Philosophical Investigations*, 1953)। এখানে যেন আমরা এক নতুন হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইনকে পাই। তিনি এখন বলেন, ভাষাকে ঘষে মেজে একটা স্পষ্ট বিম্বের রূপ দেওয়া যাবে না; ভাষা আর ভাষার ব্যবহার ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। ব্যবহার-নিরপেক্ষ কোনো লজিক আমাদের নেই; লজিকের নিয়মাবলি তৈরি হয় ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে। ভাষা আমরা কেমন করে ব্যবহার করি বোঝাতে গিয়ে উনি খেলার উপমার সাহায্য নিয়েছেন। প্রতিটি খেলার নিয়মাবলি আলাদা, খেলার প্রয়োজনে নিয়ম তৈরি হয়। প্রতিটি পৃথক পৃথক খেলার কোনো সামান্য-ধর্ম নেই।

'ইনভেস্টিগেশনস'-এর এইসব চিন্তাভাবনা বিশেষ সাড়া জাগায়। মনে করা হয়, স্বচ্ছ ও স্পষ্ট ধারণার সৌধ নির্মাণের দায়িত্ব থেকে দর্শন মুক্তি পেল, মুক্তি পেল দেকার্ত, কান্ট, ফ্রেগে, রাসেল, 'ট্র্যাক্‌টেটাস'-এর পরম্পরা থেকে। হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইনের 'ট্র্যাক্‌টেটাস' বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে-প্রভাব বিস্তার করে ঠিক সেই একই প্রভাব বিস্তার করে তাঁর 'ইনভেস্টিগেশনস' বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে। এই দুই পর্যায়ের হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইনকে পৃথক করা হয় যথাক্রমে 'নবীন হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইন' আর 'প্রবীণ হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইন' বলে। 'প্রবীণ হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইনের' কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে দার্শনিকরা তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বর্জন করে তথ্যের বর্ণনার দিকে মনোযোগী হলেন। দর্শনের এই

Scanned with

পরিবর্তিত কর্মসূচীর সমর্থনে তাঁরা হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইনের উক্তি কাজে লাগান: 'ব্যাখ্যা চেয়ো না, বর্ণনা করো'। ওঁর প্রভাবে অনুষঙ্গের ধারণাও একটা বিশেষ দ্যোতনা পেল। দার্শনিকরা এখন বলতে আরম্ভ করলেন অনুষঙ্গ-নিরপেক্ষভাবে কিছু বলা যাবে না, আমরা যাই বুঝি-না কেন; তা বুঝতে হবে একটা বিশেষ অনুষঙ্গে।

'ইনভেস্টিগেশন্‌স' গ্রন্থে হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইন যখন জীবন-যাপনের প্রেক্ষাপটের কথা বলেন, তখন একক ব্যক্তির স্বতন্ত্র-যাপনের কথা বলেন না, গোষ্ঠীর জীবন-যাপনের কথা বলেন। অনেক ভাষ্যকার মনে করেন, উনি সমগ্র মানুষের যাপনের কথা বলছেন। এই জীবন-যাপনের একটা ইতিহাস যেমন আছে তেমনি স্থায়িত্বও আছে। লৌকিক ভাষার মধ্যে লোকব্যবহার বিধৃত থাকার মানে এই নয় যে তার ব্যাকরণ, তার লজিক বা সাধারণভাবে ভাষাব্যবহারের নিয়মাবলি মুহুর্মুহু পালটাতে থাকে। সব নিয়ম আবশ্যিক অথবা সব নিয়ম আপতিক—এই দুই বিকল্প ছাড়াও একটা তৃতীয় বিকল্প থাকতে পারে। হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইন যেন বলতে চাইছেন যে অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ আবশ্যিকতা আর অভিজ্ঞতা-নির্ভর আবশ্যিকতার মাঝামাঝি আর-একটা জায়গা আছে, যেখানে আমরা এমন কিছু সংজ্ঞা পাই, যা আবশ্যিক অথচ আত্যন্তিক রূপে আবশ্যিক নয়। 'জীবন-যাপনের পরিপ্রেক্ষিত' থেকে কথা বলা মানে এমনই একটা জায়গা থেকে কথা বলা।

যেমন: আমরা যখন যাপনের পরিপ্রেক্ষিতে স্থির করতে চাই 'সংজ্ঞা' শব্দের সংজ্ঞা কী? বা 'ব্যাখ্যা' বলতে আমরা কী বুঝি? কিংবা লজিক বা গণিতে বিচার করার সময় আমরা যে শর্ত ব্যবহার করি তা নিরূপিত হয় কী করে? তখন এই প্রশ্নগুলির উত্তর এইসব শব্দের (যেমন, 'সংজ্ঞা', 'ব্যাখ্যা', 'শর্ত') প্রয়োগ থেকেই পাই। ধরা যাক্, কেউ জানতে চায়, 'সংজ্ঞা' কাকে বলে, তখন হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইনের পরামর্শ হবে, লৌকিক ব্যবহার দেখে আমরা শব্দটির মানে জেনে যাব। এই পরামর্শ পেয়ে কেউ দমে যেতে পারে। তার মনে হতে পারে, প্রয়োগের কোনো ঠিক আছে নাকি? নানা জনের নানা প্রয়োগ, কার কথা মানব? কোন প্রয়োগটা ঠিক? হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইন বলছেন, আবশ্যিক ও পর্যাপ্ত লক্ষণ কোনো ক্ষেত্রেই দেওয়া সম্ভব নয়। বিভিন্ন ব্যবহারের মধ্যে আমরা 'সাদৃশ্য' পেতে পারি, 'সাজাত্য' পেতে পারি না। ঠিক যেমন একটি পরিবারের বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে সাদৃশ্য থাকে, কোনো সামান্য-ধর্ম থাকে না, তেমনি 'সংজ্ঞা'

শব্দের বিভিন্ন প্রয়োগের মধ্যে আমরা সাদৃশ্য খুঁজে পাব, তার বেশি কিছু নয়। এই সাদৃশ্যকে বলা যায় ফ্যামিলি রিজেমব্লেন্স বা পরিবারোপম সাদৃশ্য।

'জীবন-যাপনের প্রেক্ষাপট' হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইনের পরের দিকের লেখায় একটা মুখ্য ও মৌলিক স্থান অধিকার করে থাকলেও তিনি কোথাও এই ধারণার বিস্তারিত ব্যাখ্যা বা উদাহরণ দেননি। মোটামুটিভাবে বলা যায়, আমরা যে-কথাগুলি বিশ্বাস করি, যে-আদর্শ মেনে চলি, যেভাবে কাজ করি, তার একটা নকশা বা প্যাটার্ন আছে। ইতিহাসের কোনো এক সময়ে দাঁড়িয়ে মানুষ সেই সময়ের জ্ঞানের, বিশ্বাসের মূল্যবোধের সমন্বিত নকশা সম্বন্ধে সচেতন থাকে : এই সচেতনতা সে তার জীবন-যাপনের ভেতর দিয়ে, তার পরিবেশ থেকে পেয়ে যায়। এর কোনো ফর্মুলা নেই, এটা কাউকে শেখানো যায় না : যে জানে সে আপনি জানে। এই জানা কোনো একটা বিশেষ ভাষা জানা বা সেই ভাষার ব্যাকরণ জানা নয়। একটা ভাষা জানলেই তার জীবন-যাপনের পরিমণ্ডল জানা হয়ে যায় না। যে-কারণে হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইন বলেন, একটি সিংহ কথা বললেও তার কথা আমরা বুঝব না, কারণ তার জীবন-যাপনের প্রেক্ষাপট আমাদের অজানা।

আত্যন্তিক আবশ্যিকতার ধারণাটিকে প্রবীণ হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইন যেমন প্রশ্নবিদ্ধ করেন তেমনি ওই ধারণাটিকে মার্কিন দার্শনিক কোয়াইনও (W.V.O. Quine 1908-2000) সমালোচনা করেন। হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইন-এর মৃত্যুর বছরে (১৯৫১) কোয়াইন তাঁর "টু ডগমাস অব এম্পিরিসিজম" ('Two Dogmas of Empiricism') প্রবন্ধটি লিখে একটা ছোটখাটো বৌদ্ধিক বিপ্লব রচনা করেন।

প্রথম দিকে 'ইনভেস্টিগেশনস'-এর প্রকাশনা তেমন সাড়া জাগাতে পারেনি। বইটা সূত্রাকারে লেখা কয়েকটি বিক্ষিপ্ত বক্তব্যের সংকলন—যার অর্থ উদ্ধার করা কঠিন। মোটামুটি সত্তরের দশকের পরে এটি একটি ক্লাসিকের স্থান পেয়ে যায়। তুলনামূলকভাবে কোয়াইনের লেখা সহজবোধ্য। প্রতিটি বক্তব্য বিশ্লেষণ করে, টুকরো টুকরো যুক্তি দিয়ে তিনি তাঁর আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যান। অনেকেই মনে করেন, সাম্প্রতিককালে মার্কিন দেশের বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের দার্শনিক মহলে প্রভাবশালী দার্শনিকদের মধ্যে কোয়াইন অন্যতম প্রধান ছিলেন। পাশাপাশি আরও দুজনকেও তাঁরা প্রাধান্য দেন : রিচার্ড রোরটি আর কোয়াইনের ছাত্র ডোনাল্ড ডেভিড্‌সন। রোরটি মনে করেন যে কোয়াইন আর ডেভিড্‌সন হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইনের

Scanned with

বক্তব্যকে তার অনিবার্য সিদ্ধান্তে নিয়ে গেছেন এবং রোরটি তাঁর নিজের কাজকেও সেই একই ঘরানার অন্তর্ভুক্ত করে দেখেন। তিনি মনে করেন এটাই মার্কিন দর্শনের মূল ঘরানা। তিনি এটাকে জন ডিউই (1859-1952) প্রবর্তিত ঘরানা হিসেবে চিহ্নিত করেন।

'টু ডগমাজ...' প্রকাশের মধ্যে দিয়ে কোয়াইন খ্যাতি লাভ করতে শুরু করেন। তিনি ওই প্রবন্ধে দাবি করেন, আধুনিক দর্শন কান্টের একটি ভ্রান্ত ধারণার শিকার হয়েছে—আমরা ভুল করে ভাবি যে অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ বচন এবং অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ বচন দুটি ভিন্ন কোটির বচন। আমাদের সব বচনের মধ্যেই কিছু তত্ত্ব ও কিছু ইন্দ্রিয়-উপাত্ত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মিশে থাকে। এই মিশ্রণের কোনো নির্দিষ্ট অনুপাত নেই, কোনো কোনো অংশে তত্ত্বের ভাগ বেশি হতে পারে, কোনোটাতে ইন্দ্রিয়-উপাত্ত বেশি।

কোয়াইন মনে করেন, জগতের যে-ব্যাখ্যাই আমরা দিই-না কেন, তা সর্বদাই কোনো বিশেষ পরিপ্রেক্ষিত থেকে দিই। হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইনের মতে পরিপ্রেক্ষিত স্থির হয় 'জীবন-যাপনের পরিমণ্ডল' দিয়ে আর কোয়াইন বলেন পরিপ্রেক্ষিত স্থির হয় আমাদের 'ওয়েব অব বিলিফ' বা 'বিশ্বাসের পরিমণ্ডল' দিয়ে। মাকড়সার জালের মতো আমাদের প্রতিটি বিশ্বাস অপরাপর বিশ্বাসের সঙ্গে কোনো একটা সম্পর্কের ছকে বাঁধা থাকে। মাকড়সার জালের যেমন একটা কেন্দ্র থাকে আর থাকে প্রান্তিক দেশ যা গাছের ডাল বা অন্য কোনো বস্তুকে ছুঁয়ে থাকে, আমাদের বিশ্বাসের পরিমণ্ডলেও তেমনি একটি কেন্দ্রীয় দেশ আর প্রান্তীয় দেশ আছে—কেন্দ্রে আছে তত্ত্ব-প্রধান বিশ্বাস আর প্রান্তে আছে অভিজ্ঞতা-প্রধান বিশ্বাস।

প্রান্তীয় বিশ্বাসগুলি সংবেদনাত্মক উদ্দীপকের সঙ্গে কার্য-কারণ সম্পর্কে যুক্ত। যেমন : আমি যখন বলি 'পাঁচ সংখ্যাটি দুই সংখ্যাটির চেয়ে বড়ো', তখন আমি আমার তাত্ত্বিক বিশ্বাসের কথা বলছি আর যখন বলি 'বৃষ্টি পড়ছে' তখন আমি আমার প্রত্যক্ষণের কথা বলি। আরও গভীরে যদি যেতে চাই, যদি জানতে চাই 'সংখ্যা' মানে কী? বা 'বৃষ্টি' কাকে বলে? তখন এক-এক জনের বিশ্বাসের পরিমণ্ডল-সাপেক্ষে এর উত্তর এক-এক রকম হবে। বিজ্ঞানী তাঁর পরিমণ্ডল থেকে একরকম উত্তর দেবেন; দার্শনিক কথা বলবেন তাঁর নিজস্ব বিশ্বাসের পরিমণ্ডল থেকে ; কোনো আদিম মানুষ আর-এক পরিমণ্ডল থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা বলতে পারেন।

কোয়াইন মনে করেন, আধুনিক যুগে আমরা সচরাচর বিজ্ঞানীর বিশ্বাসের পরিমণ্ডলকেই গ্রহণযোগ্য মনে করি। বিশেষত পদার্থবিজ্ঞানীর ব্যাখ্যাকে আমরা নির্ভরযোগ্য মনে করি। আর তাই বিজ্ঞানের ছকে আমরা আমাদের বিশ্বাসের কাঠামোকে গড়ার চেষ্টা করি। সমস্যা হল সব বিজ্ঞানী এক তত্ত্ব স্বীকার করেন না। এর কারণ বোঝাতে গিয়ে কোয়াইন বলছেন যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সম্পূর্ণত তথ্যের দ্বারা নিরূপিত হয় না : সর্বদাই তথ্যের অকুলান থাকে। এই সমস্যাটাকে উনি বলেন, 'আন্‌ডারডিটারমিনেশন' (underdetermination)-এর সমস্যা। এর ফলে নানা বিকল্প ব্যাখ্যার সুযোগ থেকে যায়। একাধিক ব্যাখ্যা যেখানে দেওয়া যায় সেখানে কোনো ব্যাখ্যাই যে ঠিক নয়—এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। অনেক বিকল্প ব্যাখ্যার মধ্যে একটা ব্যাখ্যা আমাদের বেছে নিতে হয়। এই নির্বাচনের পদ্ধতি বা শর্ত নিয়ে সমস্যা দেখা দিতে পারে। সেখানে আমাদের নানা দিক দেখে তুল্যমূল্য বিচার করতে হয় : দেখতে হয় কোন ব্যাখ্যাটি বেশি ব্যাপক, কোনটি আমাদের অন্যান্য দৃঢ়মূল বিশ্বাসের সঙ্গে বেশি খাপ খায়, কোনটি অপেক্ষাকৃত সরল, ইত্যাদি।

একটু ভাবলেই বোঝা যাবে কোয়াইনের এই বক্তব্য স্বীকার করা মানে আপেক্ষিকতার দিকে ঝোঁকা। হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইনের 'ইনভেস্টিগেশনস'-এর ভেতর দিয়ে আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন একবার আপেক্ষিকতার দিকে ঝুঁকল; আবশ্যিকতার কোনো দেশ-কাল-নিরপেক্ষ পরিচয় রইল না—আবশ্যিকতা মাত্রই জীবন-যাপনের পরিপ্রেক্ষিত-সাপেক্ষ একটা ধারণা হয়ে গেল। সেইসঙ্গে কোয়াইনের কথা যদি ঠিক হয়, যদি অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ সত্য আর অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ সত্যের বিভাজন বাতিল করতে হয় আর সেইসঙ্গে যদি ধ্রুব সত্য, শাশ্বত সত্য, সামান্য জ্ঞান, ইত্যাদি বিজ্ঞানও না দিতে পারে, তা হলে আর পায়ের তলায় মাটি থাকে কই? থিয়োরির তলায় বনিয়াদ? সবই হয়ে যায় কোনো-না-কোনো থিয়োরি-সাপেক্ষ বীক্ষণ।

বিনির্মাণবাদীদের এটাই সন্দেহ : শাশ্বত সত্য বলে কিছু নেই, সব সত্যই আপেক্ষিক। তবে তো তাঁদের পূর্বসূরি গ্রিক সফিস্টরা অন্যায় কিছু বলেননি, যখন তাঁরা বললেন 'হোমো মেন্‌সুরা'—মানুষই সত্য-মিথ্যার মানদণ্ড ঠিক করে। গ্রিক যুগে এই বক্তব্যকে আশ্রয় করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল এক উগ্র ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা। এক শ্রেণী মনে করতে আরম্ভ করল, কোনো যুক্তিই যখন অকাট্য নয়, কোনো আদর্শ যখন শিরোধার্য নয়, কোনো প্রত্যক্ষণই যখন চূড়ান্তভাবে নির্ভরযোগ্য নয়, তখন

Scanned with

যা-হোক একটা ব্যাখ্যা দিলেই হয়; যা-হোক একটা আদর্শ স্বীকার করলে বা না করলে কী এসে যায়। এই কি চিন্তার আসল মুক্তি?

এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের 'চিন্তার স্বরাজের' ধারণা কারো কারো মনে পড়তে পারে। কিন্তু বিনির্মাণবাদীদের চিন্তামুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'চিন্তার স্বরাজের' ধারণার তুলনা করা যায় না। কৃষ্ণচন্দ্র আপত্তি করছিলেন নির্বিচার বিদেশী প্রভাবের বিরুদ্ধে ; তিনি চাইতেন, নিজের জীবন-যাপনের পরিপ্রেক্ষিত থেকে ধ্রুবত্বের অন্বেষণ করতে। তাঁর জেহাদ ছিল চিন্তার দাসত্বের বিরুদ্ধে; কোনো আবশ্যিক সত্য নেই—এমন কথা তিনি মানতেন না।

বিনির্মাণবাদীরা বিনির্মাণকে দেখছেন চিন্তার গণতন্ত্রীকরণের চূড়ান্ত সোপানরূপে। এতে নারীবাদীরা বিশেষ আশান্বিত, তাঁরা বিনির্মাণকে দেখছেন পুরুষশাসিত অচলায়তন থেকে মুক্তি-পাওয়ার হাতিয়ার হিসেবে। দেরিদা মনে করেন, পাশ্চাত্য দর্শনের যুক্তিকেন্দ্রিকতার সঙ্গে পুরুষ-প্রাধান্যের একটা প্রত্যক্ষ যোগ আছে।[১]

আপেক্ষিকতা মানার ফলে যে সমস্যাগুলি মার্কিন দার্শনিকদের সবচেয়ে বেশি ভাবাচ্ছে সেগুলির দিকে এবার তাকানো যাক।

আপেক্ষিকতার মূল সমস্যাকে কোয়াইন অনুবাদের সমস্যা বলে মনে করেন। এই জাতীয় সমস্যার ইঙ্গিত আমরা 'ইনভেস্টিগেশনস'-এ পাই যখন হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইন বলেন, 'একটি সিংহ কথা বললেও তার কথা আমরা বুঝব না'। কোয়াইন একটি উদাহরণের সাহায্যে সমস্যাটিকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। ধরা যাক, একজন আদিবাসী (যার ভাষা আমরা জানি না) মাঠের মধ্যে একটি সাদা বস্তুর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে 'গাভাগাই' আর একজন ইংরিজিভাষী একই বস্তুর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, 'র‍্যাবিট'। সমস্যা হচ্ছে এরা পরস্পরের কথা বুঝবে কী করে? এরা কি ধরে নিতে পারে যে তারা একই বস্তুর সম্বন্ধে একই কথা বলছে? এই সমস্যাটিকে পারিভাষিক শব্দে বলা হয় : 'দ্য প্রবলেম অব র‍্যাডিকাল ট্র্যানস্লেশন' বা 'নিরালম্ব অনুবাদ'-এর সমস্যা। এখানে এমন একটি অনুবাদের পরিবেশের কথা বলা হচ্ছে যেখানে উভয় অনুবাদকারীর কারো কাছেই অনুবাদ-সহায়ক কোনো নিয়মাবলি বা ট্র্যানস্লেশন ম্যানুয়াল নেই, তাদের কোনো দোভাষী নেই, তাদের কোনো অভিধান নেই, তারা একই পরিবেশে মানুষ হয়নি। আপাতদৃষ্টিতে তারা একই বস্তু সম্বন্ধে কথা

বলছে মনে হলেও তা জানার কোনো উপায় নেই। 'গাভাগাই' শব্দটি উচ্চারণের দ্বারা একাধিক মানে সূচিত হতে পারে : এর মানে র‍্যাবিটের গায়ের রঙ হতে পারে, একটি বিশেষ বয়সের র‍্যাবিট হতে পারে, গোটা র‍্যাবিটের একটা অংশের কথা বুঝিয়ে থাকতে পারে, ইত্যাদি। তা হলে কি আদিবাসীটির কথা কোনোদিনই আমরা অনুবাদ করতে পারব না? এই উদাহরণ আপাত-নিরীহ কিন্তু আসলে তত নিরীহ নয়।

এবার এই অনুবাদের স্থান, কাল, পাত্র বদল করে একটা আধুনিক পরিস্থিতি ভাবা যাক, যেখানে দুই বিশ্বাসের পরিমণ্ডল থেকে এসে দুজন ব্যক্তি আন্তর্জাতিক কোনো সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে চায়। আমরা কি ধরে নেব পরস্পরের ভাবা আমরা অনুবাদ করতে পারব না? কোয়াইন মনে করছেন, পারব, তবে এই জাতীয় আর সব স্থলের মতো এখানেও আমাদের একাধিক অনুবাদ সম্ভব বলে মনে হবে, হলফ করে বলতে পারব না : এটাই ঠিক। কারণ আমরা অনুবাদ করব আমাদের পরিপ্রেক্ষিত থেকে অথচ অন্যজন কথা বলছে তার নিজের বিশ্বাসের পরিমণ্ডল থেকে এবং মাঝখানে যে প্রত্যক্ষণলব্ধ তথ্যটুকু পাব তা চূড়ান্ত ও সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর জন্য কখনোই যথেষ্ট হবে না—তথ্য সবসময় তত্ত্বের প্রয়োজন অনুপাতে 'আন্ডারডিটারমিন্ড' বা 'অপর্যাপ্ত' বলে। তবু আমাদের অনুবাদ করতে হয়। এ ক্ষেত্রে কোয়াইনের পরামর্শ হল: অনুবাদ করার সময় অন্য পক্ষের আচরণ আর অঙ্গভঙ্গি বা সে আর যা-কিছু করছে তা একাধিক অনুষঙ্গে লক্ষ্য করা (যে-কোনো বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের তথ্য সংগ্রহ করার সময় যেমন হয়ে থাকে)।

এইসঙ্গে আমাদের একটা সূত্র মেনে চলতে হবে—উদারম্মন্যতার সূত্র বা প্রিন্সিপ্‌ল অব চ্যারিটি; অর্থাৎ আমাদের ধরে নিতে হবে : যে লজিকের নিয়ম অনুসারে আমরা আমাদের বিশ্বাসের পরিমণ্ডলে একটা বিশ্বাসের সঙ্গে আর-একটা বিশ্বাসকে সম্বন্ধ-সূত্রে গাঁথি, আদিবাসীটিও আমাদের মতো, একই লজিক ধরেই, তার সব যুক্তিগুলিকে সাজিয়েছে। আমাদের বিশ্বাস ভিন্ন হতে পারে কিন্তু আমাদের বিশ্বাস-সমন্বয়ের সূত্র ভিন্ন নয়। যেমন: আমরা কেউই কোনো বিরোধাভাসকে বিশ্বাস করি না কারণ ল অব কন্‌ট্রাডিক্‌শনের বৈধতা আমরা সকলেই স্বীকার করি; যার ফলে কোনো বচনকে একসঙ্গে আমরা সত্য এবং মিথ্যা বলে স্বীকার করব না। তাই আমাদের উদাহরণের আদিবাসীর ওপর আমরা যে বিশ্বাসই আরোপ করি-না

Scanned with

কেন তার ওপর পরস্পরবিরোধী বিশ্বাস আমরা আরোপ করতে কখনোই পারি না। আমাদের অনুবাদের ফলে যদি কখনো মনে হয়, আদিবাসীটি বিরোধাত্মক বিশ্বাস পোষণ করছে তাহলে বুঝতে হবে আমাদের অনুবাদে কোথাও ভুল হয়েছে। লজিকের আর সব সূত্র, যেমন, কনজাংশন, ডিসজাংশন, ইমপ্লিকেশনও অনুরূপভাবে আদিবাসীটির বিশ্বাসপুঞ্জ সংগঠনের নিয়ামক বলে মনে করতে হবে। এটাই প্রিন্সিপ্‌ল্ অব চ্যারিটি বা উদারম্মন্যতা নীতির নিহিত অর্থ। এই নীতি প্রয়োগের ফলে কোন অনুবাদটি ঠিক তা না বলা গেলেও অন্তত কয়েকটি যে ঠিক নয়, তা নিশ্চিতভাবে বলা যাবে।

দেখা যাচ্ছে, আপেক্ষিকতা মানলেও কোয়াইন লজিকের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিচ্ছেন। তিনি মনে করেন, দ্বিমাত্রিক লজিকের সাহায্য নিয়ে আমরা অনুবাদ করি আর এই দ্বিমাত্রিক লজিক বর্জন করার কোনো কারণ তিনি এখনই দেখছেন না; ভবিষ্যতের কথা বলা যায় না। ভবিষ্যতে কোনো বিকল্প লজিকের প্রয়োজন হতে পারে কিন্তু লজিকের বিকল্প কখনোই থাকবে না। কান্ট-অ্যারিস্টটলের মতো কোয়াইন বলছেন না যে লজিকের পরিবর্তন অসম্ভব তবে কান্ট-অ্যারিস্টটলের মতো উনি লোগোসেন্ট্রিজম বা যুক্তিকেন্দ্রিকতা অবশ্যই স্বীকার করেন। আমরা চিরকাল জানি মার্কিনমুলুক ইয়োরোপকেন্দ্রিকতার বাইরে। আমেরিকাকে জানি প্র্যাগমাটিজমের পীঠস্থান রূপে। চার্লস স্যান্ডার্স প্যার্স, জন ডিউই, উইলিয়াম জেমস-এর দেশের লোক হয়ে কোয়াইন কি না শেষে এইসব যুক্তিবাদীদের জালে পড়ে গেলেন? বিনির্মাণবাদীদের দৃষ্টিতে এটা জানই। তাঁদের অভিযোগ : আমরা বিভিন্ন ধারণার জাল বুনি, তারপর সেই জাল জগতের ওপর ফেলি। জালের খোপ গোল গোল হলে জগৎ একরকম দেখায় আর জালের খোপ তিনকোণা হলে জগৎ আমাদের কাছে আর-একরকম রূপ নেয়। দার্শনিকরা গত একশো বছর ধরে এই—জাতীয় কাজের জন্য জালরূপে ভাষাকে ব্যবহার করছেন। ফলত যুক্তিবাদী দর্শন ত্যাগ করেও ভাষাকে যুক্তিবাদীদের মতো করে ব্যবহার করা হচ্ছে অর্থাৎ ভাষাকে দেখা হচ্ছে একটা কনসেপচুয়াল নেট হিসেবে। কোয়াইন যেমন; যুক্তিবাদী দার্শনিক না হয়েও ভাষাকে এইভাবে দেখছেন। যখন মনে করা হবে এই জাল জগৎ থেকে পাওয়া তখন ভাবা হবে আমাদের ভাষার গঠন আর জগতের গঠন মিলে যাচ্ছে—দেকার্ত যেমন আশা করতেন—ভাষা তখন জগতের প্রতিবিম্ব।

ভাষা আর জগতের সম্পর্ককে আর-এক ভাবেও দেখা যায়। মনে করা যায়, ধারণার জাল মানুষ জোগায়: এই জাল জগতের সঙ্গে মিলতেও পারে, না-ও পারে। দুই-এর মধ্যে মিল আছে কি নেই জানার কোনো উপায় নেই। কান্ট আর কোয়াইন এই দ্বিতীয় মত পোষণ করেন। ভাষাকে ধারণার জাল হিসেবে দেখার ফলে তার বর্ণনাত্মক ভূমিকা মুখ্য হয়ে যায়। বর্ণনা করতে গেলে বর্ণনার একটা বিষয় চাই আর সেই বিষয় সম্বন্ধে কিছু পরিচয় দিতে হয়। বিষয়ের একটা পরিচয় দেওয়া মানে সেই পরিচয়ের বিপরীত পরিচয় অস্বীকার করা বা সেই বিপরীত পরিচয়ের প্রতিবন্ধক হওয়া। যেমন, আমি যদি বলি, ক সাদা, তার দ্বারা এ-ও বলা হল যে ক অ-সাদা নয় (কালো নয়, হলুদ নয়, লাল নয়, ইত্যাদি)। প্রতিটি বর্ণনাকে এমন স্পষ্ট মোটা দাগে দুটো কোটিতে ভাগ করে ভাবতে দার্শনিকরা আমাদের শিখিয়েছেন, অন্তত বিনির্মাণবাদীদের অভিযোগ তা-ই। এটাকেই তাঁরা নিন্দার্থে বলেন, লজিক-কেন্দ্রিকতা বা লোগোসেন্ট্রিজম।

সব লজিক অবশ্য এ কথা বলে না, দ্বিকোটিক লজিক ছাড়াও বহুকোটিক লজিক আছে। তবে এটা ঠিকই, কোয়াইন যখন উদারম্মন্যতা নীতির কথা বলেন তখন উনি দ্বিকোটিক লজিকের নিয়মের সর্বজনীনতার কথাই বলেন। কোয়াইন এই একটা জায়গায় এসে রক্ষণশীল হয়ে রইলেন। মানুষে-মানুষে ভাষার মাধ্যমে ভাববিনিময়ের সম্ভাবনাকে সম্ভবপর করতে গিয়ে তিনি এটা করলেন। ইতিহাসের এপার থেকে ওপার বা এক সংস্কৃতি ও পরিবেশ থেকে আর-এক সংস্কৃতি ও পরিবেশে ভাষা দিয়ে পৌঁছোনোর কোনো সুনির্দিষ্ট উপায় তিনি দেখতে পান না। একটি ভাষা থেকে আর-একটি ভাষায় অনুবাদ যে হয় না তা কোয়াইন মনে করেন না। সমস্যা হচ্ছে, একটা ভাষার বহু অনুবাদ হতে পারে—বিভিন্ন অনুবাদের মধ্যে কোন অনুবাদটা ঠিক তা জানার কোনো উপায় নেই।

কোয়াইনের চিন্তাধারার ওপর কান্টের সুস্পষ্ট প্রভাব আমরা দেখতে পাই যখন তিনি একদিকে ইন্দ্রিয়-উপাত্ত ও অন্যদিকে বিশ্বাসের পরিমণ্ডলের কথা বলেন। তাঁর লেখা থেকে কখনো কখনো মনে হয় তিনি ইন্দ্রিয়-উপাত্ত আর বিশ্বাসের পরিমণ্ডলের মধ্যে একটা যোগসূত্র দেখতে পাচ্ছেন; আবার কখনো মনে হয় দুই-এর মধ্যে সম্পূর্ণ পার্থক্য স্বীকার করছেন। ডেভিড্‌সনের (Donald Davidson 1917–2003) মনে হয়েছে, কোয়াইন দুই-এর মধ্যে পার্থক্য বজায় রাখতে চাইছেন। ডেভিড্‌সন

Scanned with

খানিকটা আইরনির সুরে একে বলেন 'কোয়াইনের থার্ড ডগমা'। এর আগে কোয়াইনই আমাদের দুটো ডগমার কথা শিখিয়েছেন। থার্ড ডগমার প্রতিবাদে ডেভিড্‌সন বলেন, আমাদের মনে করা উচিত নয় যে একদিকে আমাদের ধারণার জালরূপী স্কিম বা ছক রয়েছে আর একদিকে আমাদের অব্যাখ্যাত জগৎ বা কন্‌টেন্ট পড়ে আছে। ডেভিড্‌সনের মতে দুই-ই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

আপেক্ষিকতাবাদ কোয়াইনের মতো ডেভিড্‌সনও স্বীকার করেন যদিও তাঁর মতে আপেক্ষিকতার মূল সমস্যা অনুবাদের সমস্যা নয়; ইন্টারপ্রিটেশন বা ব্যাখ্যার সমস্যা। পরস্পরের ভাষা অনুবাদ করেও পরস্পরের ভাষা আমরা না-ও বুঝতে পারি। ঘুরেফিরে যেন আবার আসে হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইনের সেই সিংহ! ডেভিড্‌সন ব্যাখ্যার এই সমস্যাকে বলেছেন, প্রবলেম অব র‍্যাডিকাল ইন্টারপ্রিটেশন বা নিরালম্ব ব্যাখ্যার সমস্যা। ব্যাখ্যার সাফল্যের জন্য ডেভিড্‌সনও মনে করলেন প্রিন্সিপ্‌ল অব চ্যারিটি বা উদারম্মন্যতা-নীতি অনুসরণ করা দরকার।

ডেভিড্‌সনের উদারম্মন্যতা-নীতি অবশ্য কোয়াইনের চেয়ে ব্যাপক। তিনি বলেন, শুধু লজিকের নিয়মের বেলায় নয়, প্রায় সব ব্যাপারেই, সব মানুষের অধিকাংশ বিশ্বাসই এক। শুধু তা-ই নয়, প্রতিটি মানুষের প্রায় অধিকাংশ বিশ্বাসই ঠিক এবং প্রত্যেকে যেটাকে যৌক্তিক মনে করে সেটাকে বিশ্বাস করে, অযৌক্তিক মনে হলে বিশ্বাস করে না। অপরের কথা আমাদের বুঝতে হবে এইরকম উদার মনোভাব নিয়ে। ডেভিড্‌সনের মতে শব্দ, শব্দার্থ ও বিশ্বাস এই তিনটিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন করে ভাবা যায় না। মানুষের একটি মাত্র বিশ্বাসকে তার অপরাপর বিশ্বাস থেকে বিচ্ছিন্ন করে বোঝা যায় না : এক-একটি বিশ্বাস বুঝে নিয়ে গোটা বিশ্বাসের পরিমণ্ডল বোঝার চেষ্টা বৃথা। অপরের বিশ্বাসের পরিমণ্ডল সম্বন্ধে আমাদের যা-কিছু জানা আছে তার সবটুকুর সাহায্য নিয়ে তাকে বুঝতে হবে, সেইসঙ্গে ধরে নিতে হবে যে তার বিশ্বাসের জগতে একটা নিহিত সংগতি রয়েছে ।

একটি উদাহরণের সাহায্যে ডেভিড্‌সন আমাদের প্রতিটি বিশ্বাসের এই জড়িয়ে থাকার ব্যাপারটা বুঝিয়েছেন। বরফ গলে যায়—এই বিশ্বাস আমরা কারো ওপর আরোপ করতে পারি না, যদি-না সেইসঙ্গে আরও অনেক বিশ্বাস তার ওপর আরোপ করি, যেমন : বরফের সঙ্গে জলের সম্পর্ক, তাপমাত্রার সম্পর্ক, জমা আর গলার পার্থক্য সম্বন্ধে ধারণা, ইত্যাদি অনেক কিছু। মানুষের বিশ্বাসের জগতের সংবাদ পাই

অবশ্য তার ভাষার ব্যবহার দেখে, সরাসরি আমরা কারো মনোজগতে পৌঁছতে পারি না; সরাসরি বহির্জগতেও পৌঁছতে পারি না, ভাষার মাধ্যমেই যেতে হয়।

আমরা পরস্পরকে কোনো অবলম্বন ছাড়া বুঝি কী করে? নিরালম্ব ব্যাখ্যাই বা কী করে দিই? বোঝানোর জন্য ডেভিড্‌সন বিশেষ করে দুটি ধারণার ওপর নির্ভর করেছেন। প্রথমটি হোলিজম (holism) বা অখণ্ডতার ধারণা, অর্থাৎ তথ্য, তথ্যগত অর্থ ও সে-বিষয়ে বিশ্বাসের মধ্যে একটা অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে—এর কোনোটিকে বিচ্ছিন্নভাবে জানা যাবে না। দ্বিতীয়টি সংগতি বা কোহিয়ারেন্সের (coherence) ধারণা। কোহিয়ারেন্স বলতে ডেভিড্‌সন যৌক্তিক সংগতি বোঝেন। তথ্য, তার অর্থ, আর সেই বিষয়ে বিশ্বাসের মধ্যে একটা যৌক্তিক সংগতি থাকে ; যেমন থাকে একটা বিশ্বাসের সঙ্গে আর-একটা বিশ্বাসের। নেতিবাচকভাবে বলতে গেলে যৌক্তিক সংগতি মানে অযৌক্তিকতার অভাব আর ইতিবাচকভাবে বললে বলতে হয় যৌক্তিক সংগতি মানে যৌক্তিক অনুধারণ বজায় রেখে বিচার করা—'মেকিং জাজ্‌মেন্টস্ অ্যাকর্ডিং টু লজিকাল ইমপ্লিকেশন'।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা অনেক সময় আমাদের নজর এড়িয়ে যায়। আমাদের প্রতিটি বিশ্বাস পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত বলতে যা বোঝায়, প্রতিটি বিশ্বাস পরস্পরের সঙ্গে যৌক্তিক সম্পর্কে সম্পর্কিত বলতে তা বোঝায় না। মনে হয়, ডেভিড্‌সন দ্বিতীয় সম্পর্কের কথা বলছেন : বিশ্বাসে বিশ্বাসে সম্পর্ক বলতে তিনি যৌক্তিক সম্পর্কের কথা ভাবছেন। এই ভাষ্যের সমর্থন আমরা পাই প্রণবকুমার সেনের লেখা "দ্য কন্‌সেপ্ট অব র‍্যাশনালিটি" প্রবন্ধে।[২] প্রথম ভাষ্যের সমর্থন পাই মল্‌পাস-এর লেখার মধ্যে।[৩] মল্‌পাস মনে করেন, যদিও প্রথমদিকের বেশির ভাগ লেখায় ডেভিড্‌সন সংগতি বলতে যৌক্তিক সংগতির কথা বলেছেন, ইদানীং উনি বিশ্বাসের সঙ্গে কামনা, বাসনা, ভীতি, আশার সম্পর্কের কথাও বলছেন। মল্‌পাস-এর মতে বিশ্বাসে বিশ্বাসে সম্পর্ক থাকলেই যে তা যৌক্তিক হতে হবে তার কোনো মানে নেই। সংগতির এমন প্রসারিত ব্যাখ্যার মাধ্যমে মল্‌পাস ডেভিড্‌সনের সঙ্গে হাইডেগারের (Martin Heidegger 1889—1976) সাদৃশ্য দেখতে পান।

মনে হতে পারে, কী করে ডেভিড্‌সনের মতো কট্টর অ্যানালিটিক ঘরানার দার্শনিকের সঙ্গে বিপরীত মেরুর অস্তিবাদী দার্শনিকের তুলনা করলেন মল্‌পাস। এই সাদৃশ্য মল্‌পাস একা দেখেন না। জেনে আশ্চর্য লাগতে পারে যে ১৯৯০-এ

Scanned with

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সেমিনার হয় যেখানে আলোচনার বিষয় ছিল 'ডেভিডসন ও হাইডেগার: কার্টেজীয় চিন্তাধারার সমালোচক' ('ডেভিড্‌সন অ্যান্ড হাইডেগার: ক্রিটিক্‌স অব কার্টেজিয়ানিজম')। ডেভিড্‌সনের দর্শনের এই দুইজাতীয় ভাষ্যের (সেন ও মল্‌পাস) মধ্যে কোন্‌টা স্বীকার করা হবে তার ওপর নির্ভর করছে ডেভিড্‌সনের নিয়তি। যদি তিনি কোহিয়ারেন্স বা সংগতি বলতে নিছক সাযুজ্যের কথা বলে থাকেন তবে তিনি বিনির্মাণবাদীদের রোষ থেকে আপাতত রেহাই পাবেন। অপরপক্ষে, সংগতি বলতে তিনি যদি যৌক্তিক সংগতির কথা বলে থাকেন তবে বিনির্মাণবাদীরা তাঁকে 'লোগোসেন্ট্রিক ক্লোজার' বা 'যুক্তিকেন্দ্রিক আবেষ্টনের' দায়ে অভিযুক্ত করবেন। দ্বিতীয় সম্ভাবনাই বেশি, কারণ কোয়াইনের সঙ্গে ডেভিড্‌সনের ঘোষিত সম্পর্ক বড়ই নিকট, তার ওপর রোরটি সোৎসাহে ডেভিড্‌সনকে দেরিদার বিরুদ্ধে যখন সাক্ষী মানছেন তখন ডেভিড্‌সনকে হাইডেগারের দলে ফেলা সত্যিই শক্ত।

লোগোসেন্ট্রিক ক্লোজার ব্যাপারটা কী, আর সেটা কতখানি দূষ্য তা একটু বুঝে নেওয়া দরকার। বিনির্মাণবাদীদের মতে ক্লোজার বা আবেষ্টন থাকা মাত্রই দূষ্য, তা সে লজিকের বৃত্তেই হোক বা জ্ঞান-মীমাংসার বৃত্তেই হোক, অথবা আদর্শ বা বিজ্ঞানের কোনো বৃত্তে হোক। ব্যাখ্যার যে-কোনো একমাত্রিকতাই অগণতান্ত্রিক, তথা দূষ্য। ইতিহাস আমাদের দেখিয়েছে যে ধ্রুবত্বের দাবি বারে বারে করা হয়েছে; কিন্তু কোনো দাবিই ধোপে টেকেনি, তবু দার্শনিক একটা কোনো শাশ্বত ধ্রুব সত্য যুক্তি বা বিজ্ঞান বা মতাদর্শের মধ্যে দিয়ে জগতের ব্যাখ্যা খুঁজেই চলেন—এমন কোনো ধ্রুব সত্য যা দর্শনকে একটা সুপ্রতিষ্ঠিত চেহারা দিতে পারে।

দেরিদা (Jacques Derrida 1930–) মনে করছেন, যখনই আমরা আমাদের বক্তব্যকে এমন কতকগুলি স্বচ্ছ ও স্পষ্ট ধারণার নিরিখে সাজিয়ে ফেলতে চাই, আমরা এমন কিছু বিষয় দেখতে পাই যা আমাদের নিটোল ব্যাখ্যার গোলকের মাপে খাপ খেতে চায় না, তখন এগুলিকে সামলাতে গিয়ে আমাদের কল্পিত গোলকটিকে আর নিটোল রাখতে পারি না, হয় খোঁচা বেরিয়ে থাকে, নয়তো কোথাও কিছু বাদ পড়ে যায়। তবু যেন সব দার্শনিক বলতে চান, 'কোনো বাক্য বোধগম্য হবে না যদি না অমুক, অমুক, অমুক স্বীকার করা হয়'। এই শূন্যস্থানে কান্ট বসালেন ইনটুইশন আর ক্যাটিগরি-কাঠামো। অর্থাৎ 'কোনো বাক্যই বোধগম্য হবে না যদি না তা মানুষের

ইনটুইশন আর ক্যাটিগরি-কাঠামোর দ্বারা বিন্যস্ত হয়'। ফ্রেগে আর হুইটগেন্‌স্টাইন বলছেন, কোনো বাক্য বোধগম্য হবে না যদি না বাক্যটি তাঁদের দেওয়া লজিকের কাঠামো বা ফর্মের মধ্যে পড়ে। আর ডেভিড্‌সন বলেন, কোনো বাক্য বোধগম্য হবে না যদি না বাক্যটি তাঁর দেওয়া কোহিয়ারেন্স বা সংগতির শর্ত পূরণ করে।

এভাবে একটা মাত্রা দিয়ে গোটা জগৎকে দেখতে চাওয়াটা দেরিদার মতে একটা ক্লোজার বা আবেষ্টন। এঁরা প্রত্যেকে মনে করছেন, তাঁরা যা বলছেন তা-ই শেষ কথা এবং আর যে যা বলছে তার নির্গলিতার্থ যদি তাঁদের বক্তব্যের সঙ্গে মিলে যায় ভালো, নয়তো সেটা প্রলাপ। দার্শনিকরা যখন বলেন, 'কোনো বাক্য বোধগম্য হবে না যদি না অমুক, অমুক, অমুক স্বীকার করা হয়' তখন কোনো বাক্য বলতে সব বাক্যকেই বোঝানো হচ্ছে; এমন-কি, যে বাক্যের মাধ্যমে এই রায় দেওয়া হচ্ছে (ওপরের উদ্ধৃত বাক্য, 'কোনো বাক্যই বোধগম্য হবে না...') তার ক্ষেত্রেও এই রায় প্রযোজ্য। এভাবে কথা বলাটা দূষ্য, যখন একটি বাক্য অন্য বাক্য সম্বন্ধে কথা বলে তখন প্রথম বাক্যটি নিজের সম্বন্ধে কোনো কথা বলতে পারে না। দার্শনিকরা যখন তাঁদের দর্শনের সৌধ রচনা করেন তখন যে আশ্রয়-বাক্যের ওপর সেই সৌধ ভর করে থাকে তার সম্বন্ধে—সেই আশ্রয়-বাক্যটি সম্বন্ধে—যেন আর কোনো সংশয় ঘোষণা করা যাবে না বলে তাঁরা মনে করেন : ওটা যেন স্বতঃসিদ্ধ। একটি রূপক ব্যবহার করে বলা যায় যে এই দার্শনিকদের ব্যাখ্যায় যেন আছে শুধু আশ্রয়-বাক্য আর তার থেকে নিষ্কাশিত কতকগুলি সিদ্ধান্ত, আর বাদবাকি চারপাশে যেন সাদা মার্জিন। মনে করা হয় এই আশ্রয়-বাক্য আর তার থেকে নিষ্কাশিত সিদ্ধান্ত অনন্য, বিকল্প কোনো ব্যাখ্যা আর কোনো শাস্ত্র জোগাতে পারে না; এই ব্যাখ্যা যেন সর্বব্যাপ্য, এর বাইরে আর বোঝার কিছু থাকে না; দাবি করা হয়, এই ব্যাখ্যা চূড়ান্ত, এর কোনো নড়চড় হতে পারে না। পাশ্চাত্য বিনির্মাণের পরিভাষায় দার্শনিকরা আমাদের দিচ্ছেন একটি অদ্বিতীয়, সমগ্র, বদ্ধ শব্দতালিকা (ইউনিক্, টোটাল, ক্লোজড ভোকাবুলারি)।

দেরিদা বলতে চান, এমন আশ্রয়-বাক্যের সাহায্য নেওয়া মানে একধরনের মেটাফর বা উৎপ্রেক্ষার সাহায্য নেওয়া—কোনো মেটাফরই অনৈতিহাসিক নয়, যদিও এই কথাটা আমরা অনেক সময় স্বীকার করতে চাই না। ইতিহাস বদলের সঙ্গে আমাদের মেটাফরও বদলায়, পালটে যায় দর্শন। এই সত্যটুকু অস্বীকার করলেই আমরা কোনো-না-কোনো ক্লোজার বা আবেষ্টন সৃষ্টি করে ফেলি। দেরিদার এই বক্তব্যের সঙ্গে রোরটি একমত।

Scanned with

দার্শনিকরা যদি হতাশ হয়ে জানতে চান, তাঁদের এতদিনের গড়ে তোলা সব দার্শনিক সাধন বাতিল করে দিলে তাঁরা জগতের ব্যাখ্যা দেবেন কী করে? রোরটির উত্তর খুব সোজা। উনি মনে করেন, দার্শনিকদের নিটোল ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের সঙ্গে মানিয়ে তাৎক্ষণিক ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত। উনি বলেন, আমাদের সামনে একাধিক বিকল্প সবসময় থাকে; দার্শনিকদের ব্যাখ্যাই একমাত্র নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা এটা মনে করার কোনো কারণ নেই। অনেক সময় দার্শনিকদের ব্যাখ্যার চেয়ে কবির দেওয়া ব্যাখ্যা আমাদের বেশি ফলপ্রসূ মনে হতে পারে। আবার কখনো প্রযুক্তিবিদদের ব্যাখ্যা প্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। প্রয়োজনমতো আমরা ব্যাখ্যা বেছে নিতে পারি।

মনে রাখতে হবে যে আধুনিক থেকে আধুনিকোত্তর হওয়া মানে: সর্বকালজয়ী ব্যাখ্যা আমরা আর খুঁজব না, দার্শনিকরা যদিও এই সর্বকালজয়ী ব্যাখ্যাই দিতে চান। এজাতীয় ব্যাখ্যা অদরকারি হলে রোরটি মনে করছেন, দর্শনের ওপর নির্ভরশীলতাও হয়ে উঠবে আপেক্ষিক। তাঁর এই নব্য-প্রয়োগবাদকে তিনি কোনো নির্দিষ্ট ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত করতে চাইছেন না, এমন কি কোনো রাজনৈতিক মতের সঙ্গেও না। তিনি মনে করেন, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি মূলত গণতান্ত্রিক, যেখানে একাধিক মত ও পথকে আশ্রয় দেওয়া হয়। আমরা জানি গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে চলে আর সংখ্যাগরিষ্ঠের মত সবসময় যে ন্যায্য তা নয়। রোরটির অভিধানে ন্যায্য-অন্যায্যের ধারণাও অবশ্য আপেক্ষিক।

আধুনিকোত্তর যাত্রায় রোরটির একসময় দেরিদাকে সহযাত্রী মনে হয়েছিল—তিনি চেয়েছিলেন প্রয়োগবাদ আর বিনির্মাণের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটাতে। দেরিদা-ভক্তদের এতে বিশেষ আপত্তি। আপত্তি যাঁরা জানাচ্ছেন তাঁদের পুরোভাগে রয়েছেন ক্রিস্টোফর নরিস, জোনাথন কুলার, রোডল্‌ফ গার্শে প্রমুখ। এঁদের মতে বিনির্মাণবাদীরা নব্য-প্রয়োগবাদীদের মতো দার্শনিকদের সৌধ ভাঙার খেলা খেলছেন না। বিনির্মাণবাদীরা খেলায় মাতেননি; দার্শনিক সৌধ বিনির্মাণে তাঁরা যথোপযুক্ত যুক্তি ব্যবহার করে চলেছেন। গার্শে মনে করেন, দেরিদা একদিকে যেমন কান্টের কড়া সমালোচক, অন্যদিকে তিনি কান্টের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। নরিস মনে করছেন মার্কিন দেশে রোরটির প্রভাবে বিনির্মাণ মূলত একটা মজাদার ভাঙা-গড়ার খেলার রূপ নিয়েছে; এর ফলে বিনির্মাণ দর্শনের কোটি থেকে সরে

গিয়ে সাহিত্য-সমালোচনার হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাহিত্যিকেরা সর্বত্র রূপক দেখে বেড়াচ্ছেন, সবই যেন নির্মাণ, সব তত্ত্বই যেন গল্প বা ন্যারেটিভ, তাই তা সাহিত্য-সমালোচনার এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে। নরিস এটাকে বলেন, সাহিত্যিকের সাম্রাজ্যবাদ, যা অত্যন্ত বিপজ্জনক। কুলার মনে করছেন, দর্শন ও সাহিত্যের পার্থক্য বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। এমনও হতে পারে যে সাহিত্য-সমালোচনার নিরিখে আমরা দর্শনকে দেখব, আর দর্শনের সমালোচনার নিরিখে দেখব সাহিত্যকে।

এইজাতীয় সব মন্তব্য শুনে রোরটি হতাশ। ওঁর মতে দেরিদা এবং দেরিদার এই ভক্তেরা এখনও কান্ট-হাইডেগারের ধারায় চিন্তা করে যাচ্ছেন। তাঁরা চাইছেন, যুক্তির সাহায্য নিয়ে যুক্তির আবেষ্টন খুলে দিতে। তাঁরা বলেন কী! যুক্তিকেন্দ্রিকতার বিরোধিতা করার যুক্তি! তা হলে কি এঁরা যে-ডাল কাটতে যাবেন, সেই ডালেই বসার জায়গা খুঁজছেন? রোরটি যেন কিছুটা করুণা করে বলছেন, বিকল্প পন্থাই বা এঁদের কী হতে পারে? যুক্তিকেন্দ্রিকতার শেকড় এমন ছড়িয়েছে যে তার বাইরে দাঁড়িয়ে লড়াই করার জন্য যুক্তিনিরপেক্ষ কোনো জায়গা পাওয়া ভার।

এমতাবস্থায় তা হলে কী করা যায়? রোরটির সমাধান খুব সহজ। তিনি পালটা প্রশ্ন করেন: যুক্তিকেন্দ্রিকতার ছিদ্র অন্বেষণ করেই বা লাভ কী? এই অসম্ভব প্রকল্প হাতে না নিলেই হয়। পূর্বপক্ষ খণ্ডন করে কোনো সাম্প্রতিক সমস্যার সমাধান কখনো হয় না। পূর্বতন মত খণ্ডন করার পরিশ্রম করার চেয়ে পুরোনোকে বাতিল করলেই হয়। ইতিহাস ঘেঁটে কী হবে?[৪] নরিস আমাদের বলেন, এই আপাত-সারল্যের পেছনে মারাত্মক রাজনীতি কাজ করে যাচ্ছে—আমাদের বলা হচ্ছে ইতিহাসের পাপকে ভুলে যেতে আর সেই পাপের স্রোতকে উপেক্ষা করতে। কেবল বর্তমানকে দেখতে এবং তা-ও আবার সর্বসম্মতির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে। দেশব্যাপী বা জগৎব্যাপী এই সর্বসম্মতি নিশ্চয় কোনো স্বয়ম্ভূ ঘটনা নয়—আমরা জানি কী জাতীয় চাপের মধ্যে দিয়ে সব শেয়ালের এক রা শোনা যায়। নরিস জানতে চান গণতন্ত্রের মহান বাণীর অন্তরালে রোরটি ইতিহাসের এই পরিকল্পিত অবজ্ঞার মধ্যে দিয়ে কী রাজনীতি খেলছেন?

সবদিক ভেবে রোরটির মনে হয়েছে তাঁর কাছে কোয়াইন-ডেভিড্‌সন আঁতাতই ভালো। ওঁরাই সত্যিকারের আধুনিকোত্তর দার্শনিক। কোয়াইন আর ডেভিড্‌সন-এর উদারম্মন্যতার নীতিতে যে যুক্তিনির্ভরতা প্রতিফলিত হয়েছে তাতে এই আঁতাতে

Scanned with

অসুবিধে হবে বলে রোরটির মনে হচ্ছে না। এটাও তাঁর একটা প্র্যাগ্‌মাটিক সিদ্ধান্ত কিনা কে জানে?

রোরটি যতই মনে করুন দর্শনের পরিমণ্ডল থেকে না বেরোলে আধুনিকোত্তর হওয়া যায় না, দেরিদা তবু দর্শনচর্চা ছাড়তে রাজি নন। ফরাসি দেশে 'গ্রুপ ফর রিসার্চ ইনটু দ্য টিচিং অব ফিলসফি'-র দেরিদা একজন উদ্যোগী সদস্য। দেরিদাদের চেষ্টায় ফরাসি দেশে স্কুলের পাঠক্রমে দর্শন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই পাঠক্রমে দর্শনের মূল শাখাগুলি—নীতিশাস্ত্র, রাষ্ট্রদর্শন, জ্ঞানতত্ত্ব—বজায় রাখার সপক্ষে দেরিদা বিভিন্ন লেখায় মত প্রকাশ করেছেন।[৫] ১৯৯১ সালে প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারেও দেরিদা বলেছেন, 'আমি তাদের মধ্যে নই যারা বলে দর্শনের পালা শেষ...এটা [দর্শনের এই ক্লোজার বা আবেষ্টন] আমাদের চিন্তার সুযোগ করে দেয়; মৃত্যুর সঙ্গে এটা তুল্য নয়, বা ইতির সঙ্গে, কিন্তু এটা একটা সুযোগ...। ঐতিহ্য বহাল রাখার জন্য, দক্ষতা প্রদানের জন্য, ঐতিহ্যমণ্ডিত লেখা পাঠের জন্য... আমাদের চাই দার্শনিক প্রতিষ্ঠান।'[৬]

দেরিদা চান দর্শনের হাতিয়ার দিয়ে দর্শনকে আঘাত করতে। ওঁর জেহাদ যুক্তির আবেষ্টন বা লোগোসেন্ট্রিক ক্লোজার-এর বিরুদ্ধে। দেরিদা মনে করেন, দর্শন-মাত্রই রূপকাত্মক বা গল্পকথা। তাঁর লেখায় যথেষ্ট দার্শনিক ঋজুতা আমরা দেখতে পাই। দেরিদা কখনোই দর্শন ছেড়ে সাহিত্যের খাতায় নাম লেখানোর কথা বলেননি। তাঁর পরিকল্পনা দ্ব্যর্থহীন, তিনি যেন দার্শনিকদের বলতে চাইছেন: 'তোমারি শিল তোমারি নোড়া, তাই দিয়ে ভাঙি তোমার দাঁতের গোড়া।'

নারীবাদী দার্শনিকদের মধ্যে যাঁরা দর্শনের চর্চাকে বজায় রেখে যুক্তিকেন্দ্রিকতা বর্জনের যুক্তি দেন তাঁরা প্রধানত দ্বিমাত্রিক লজিকের দ্বিমাত্রিকতাকে নানাপ্রকার বৈষম্যের জনক বলে মনে করেন। তাঁরা দেখানোর চেষ্টা করেন লজিক কী করে অগণতান্ত্রিক হতে পারে এবং তা কী করে ক্ষমতার মেরুকরণে সাহায্য করতে পারে। এই নারীবাদী দার্শনিকরাও দেরিদার মতো যুক্তি দিয়েই যুক্তির আবেষ্টন খুলতে চেষ্টা করেন। পরের অধ্যায়ে এমনি একটি নারীবাদী প্রচেষ্টার পর্যালোচনা করা হয়েছে।

[এই রচনায় 'এক্সপ্ল্যানেশন' (explanation) আর 'ইন্টারপ্রিটেশন' (interpretation)—এই দুই অর্থেই 'ব্যাখ্যা' শব্দটি প্রযুক্ত।]

সূত্র-নির্দেশ

১. '...I have attempted to show that logocentrism or phonocentrism which is proper to Western metaphysics, is also a form of phallocentrism'. Raoul Mortly, ed., *French Philosophers in Conversation*, London and New York, 1991, pp. 103-104.

২. Pranab Kumar Sen, 'The Concept of Rationality' in *Reference and Truth*, ICPR and Allied Publishers Ltd., New Delhi, 1991.

৩. J. E. Malpas, *Donald Davidson and the Mirror of Meaning*, Cambridge, 1992.

৪. 'The result of genuinely original thought on my view, is not so much to refute or subvert our previous beliefs as to help us to forget them by giving us a substitute for them.' Richard Rorty, 'Is Derrida A Transcendental Philosopher?' *Yale Journal of Criticism*, 1989, reprinted in *Essays on Heidegger and Others : Philosophical Papers*, vol. II, Cambridge, 1991, p. 121.

৫. Jacques Derrida, 'The Principle of Reason : The University in the Eyes of its Pupils', *Diacritics*, vol. xix, no. 2, 1983.

৬. Raoul Mortley, ed., *French Philosophers in Conversation*, pp.106-7.

Scanned with

চতুর্থ অধ্যায়

উত্তর-আধুনিকতা ও নারীবাদ

'উত্তর-আধুনিকতা ও নারীবাদ' শব্দজোটের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে একটি তত্ত্বের ইঙ্গিত—বলা যেতে পারে তত্ত্ব ভাঙার তত্ত্ব—সেই সঙ্গে একটা তন্ত্রের বিরুদ্ধে জেহাদের আভাসও পাওয়া যায়। যদি প্রশ্ন করি কোন তত্ত্ব ভাঙতে চাওয়া হচ্ছে? উত্তর মিলবে—আধুনিক যুগের যুক্তি বা রিজন-ভিত্তিক সব তত্ত্ব। আর যদি জানতে চাওয়া হয় কোন তন্ত্র এই নারীবাদের কাছে ত্যাজ্য তবে জানা যাবে যে, পুরুষতন্ত্র অপসারণের কথা বলা হচ্ছে।

মনে হতে পারে, নারী-সমস্যা সামাজিক-সমস্যা, তত্ত্ব বা তন্ত্রের সমস্যা নয়। উত্তর-আধুনিক নারীবাদীরা পুরুষতন্ত্রের সঙ্গে আধুনিকতার বিশেষ সম্পর্ক আছে মনে করে বলেন তাঁরা আধুনিকতাকে নাকচ করার মধ্য দিয়ে পুরুষতন্ত্রকে নিষ্ক্রিয় করতে চান। উত্তর-আধুনিকদের পূর্বপক্ষ কারা তা সকলের জানা। কিন্তু উত্তর-আধুনিকতা ও নারীবাদের মধ্যে বিশেষ আন্তর্সম্পর্ক দাবি করা যে হচ্ছে তা নজরে নাও পড়তে পারে। যেমন চোখে পড়ে না পুরুষতন্ত্রের সঙ্গে আধুনিকতার সম্পর্ক। দুই-এর মধ্যে সম্পর্ক সহসা চোখে নাই যদি পড়ে তবে সম্পর্ক যে আছে তা বোঝা যাবে কী করে?

এটা বোঝার জন্য ব্যাখ্যা প্রয়োজন ও সেই ব্যাখ্যার যোগ্য বিচার।

তত্ত্বের স্বঘোষিত আত্মপরিচিতি যদিও বা পাওয়া যায়, তন্ত্রের স্থল স্বতন্ত্র। একটি তন্ত্র অগোচরে কায়েম থাকতে পারে। সমাজে তন্ত্র গড়ে ওঠে যখন অনেকগুলি বিধি, বিধান, আচরণ, প্রতিষ্ঠান সমন্বয়সূত্রে অনুস্যূত হয়। বিধি, বিধান, আচরণ চোখে দেখা যায় কিন্তু যে সূত্রে গ্রথিত হয়ে এই খণ্ডাংশগুলি একটি তন্ত্রের রূপ নেয় সেই সূত্রটি প্রচ্ছন্ন থেকে যায় বলে পাই শুধু 'বিনি সুতোর মালা'। অনুমান দিয়ে, উপলব্ধি দিয়ে, যুক্তি দিয়ে, স্বজ্ঞা দিয়ে যোগসূত্রের অনুসন্ধান করা যেতে পারে। বলাই বাহুল্য এই সন্ধান-প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল। যোগসূত্র স্থাপন করতে গিয়ে 'আপন মনের মাধুরী

মিশায়ে' বিভিন্ন বিধি-বিধানের মধ্যে নানা সম্পর্ক অনুমান করার অবকাশ থাকে। অবশ্য অনুমান করলেই চলে না, সে অনুমান গ্রহণযোগ্য হওয়া চাই। একটি তন্ত্রের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যতটা কঠিন তত্ত্বের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা তার চেয়ে ঢের সহজ। তাই কোন তত্ত্ব আধুনিক আর কোনটি উত্তর-আধুনিক বলা যতটা অবিসংবাদিত, কোন তন্ত্রটি পুরুষতন্ত্র, কোনটা স্বৈরতন্ত্র, কোনটি গণতন্ত্র বলা ততটা অনায়াসসাধ্য নয়।

কোনো কিছুর পরিচয় দেওয়ার আঙ্গিক হিসেবে প্রতিতুলনা ব্যবহারের রীতিটি প্রচলিত। যেমন বলা হয় স্বৈরতন্ত্র হল যা গণতন্ত্র নয়। পুরুষতন্ত্রের বেলায় পরিচিতির এই আদল খাটবে না। তাৎক্ষণিকভাবে মনে হতে পারে, কেনই বা খাটবে না—যদি বলি পুরুষতন্ত্র নারীতন্ত্র নয়? এই উত্তর গ্রাহ্য হবে না, তার কারণ, উভয় তন্ত্রের মধ্যে শক্তির একই বিন্যাস নিহিত আছে, যার জন্যে উভয় তন্ত্রের কাঠামোগত রূপ এক। পুরুষতন্ত্রে পুরুষের গুণকে প্রাধান্য দেওয়া হয় আর নারীতন্ত্রে নারীর গুণ প্রাধান্য পায়। লক্ষণীয় এই যে উভয় তন্ত্রে প্রধান-অপ্রধানের বিভাজন এবং বিন্যাস অবিকল এক।

আপাতত তত্ত্ব আর তন্ত্রকে ঘিরে দার্শনিক কূট-কচালি সরিয়ে রেখে 'আধুনিক তত্ত্ব' বলতে কী বোঝানো হয় দেখা যাক। আধুনিক তত্ত্ব বলতে আক্ষরিক অর্থে বোঝায় একটি কালে সঞ্জাত যাবতীয় তত্ত্ব। আধুনিক-তত্ত্বের কাল বলতে মোটামুটিভাবে ১৬০০ থেকে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কালটিকে বোঝায়। পারিভাষিক অর্থে কিন্তু 'আধুনিক-তত্ত্ব' বা মডার্নিজম একটি কালের যাবতীয় তাত্ত্বিক ফসলকে বোঝায় না, বোঝায় বিশেষ তত্ত্বের বিশেষ তত্ত্বকাঠামোকে।

আধুনিক-তত্ত্বকাঠামোর প্রথম স্বীকার্য হলো যে মানুষের চিন্তন বা 'থট' কতকগুলি আবশ্যিক বিধির নিয়ন্ত্রণে চলে, এগুলো হল চিন্তনের বিধি বা 'লজ অব থট'। চিন্তনের এই বিধি আছে বলেই আমরা অপরের কাছে নিজের মত পৌঁছে দিতে পারি, আর বুঝতে পারি অপরে কী বলতে চাইছে, কী করতে চাইছে। মানুষের চিন্তা-ভাবনার বিচিত্র গতি-প্রকৃতি থাকা সত্ত্বেও চিন্তার কতকগুলি অনুগত ধর্ম আছে, চিন্তা কতকগুলি সাধারণ বিধির অনুজ্ঞা মেনে চলে।

তিনটি মৌলিক বিধির কথা অ্যারিস্টটল আমাদের বলেছেন। এগুলি হল বিরুদ্ধতা বিধি বা 'ল অ কন্ট্রাডিক্শন', নির্মাধ্যম বিধি বা 'ল অব এক্সক্লুডেড মিডল' এবং তাদাত্ম্য বিধি বা 'ল অব আইডেন্টিটি'।

Scanned with

সেই প্রাচীন যুগ থেকে দর্শনের একটি মূল ধারায় এই চিন্তন বিধিগুলি স্বীকৃত হয়ে আসছে, এবং সেগুলির বিরুদ্ধাচরণও অবশ্য নানা মহল থেকে করা হয়েছে, যেমন গ্রীক যুগে সোফিস্টরা চিন্তনের আবশ্যিক বিধির অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন, রোম্যান্টিক যুগেও একটা চেষ্টা চলেছিল পাল্টা কথা বলার। অপেক্ষাকৃত দুর্বল এই প্রতিবাদী স্বরগুলিকে বার বার চাপা দিয়ে বজ্রনিনাদে ঘোষিত হয়েছে অ্যারিস্টটলের বীজমন্ত্র 'মানুষ যৌক্তিক জীব' ('Man is a rational animal')। যৌক্তিক জীব হওয়ার আবশ্যিক লক্ষণ হল যে সব মানুষের চিন্তা-কাঠামো এক, চিন্তা সর্বদাই যুক্তি-চালিত, কারণ চিন্তা এই তিন মৌল নিয়ামক বিধির বাইরে চিন্তন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারে না। তার মানে দাঁড়ায় বিরুদ্ধতা বিধি, নির্মাধ্যম বিধি ও তাদাত্ম্য বিধি মেনে যে চিন্তা অগ্রসর হয় না সে চিন্তা চিন্তাই নয়, তা যে কী আমরা বুঝতে বা বোঝাতে পারব না, কারণ, চিন্তা বা 'থট'-ই আমাদের বোধের একমাত্র সাধন। যে স্থলে চিন্তা অগম্য সেই স্থলে বোধও বারিত। চিন্তাবিধিগুলির গুরুত্ব বোঝা গেল, সুতরাং এবার এগুলির আর একটু বিস্তারিত পরিচয় দেওয়া যাক।

প্রথমে ধরা যাক বিরুদ্ধতা বিধির কথা। প্রতিটি বিধির একটি সাংকেতিক পরিচয় দেওয়ার প্রচলন আছে। এই বিধিটির সাংকেতিক রূপ হল ~ (ক. ~ ক)। এর অর্থ একাধারে 'ক' এবং 'ক-নয়' যদি একটি বচনের স্বীকার্য হয় তবে সেই বচন বিরুদ্ধতা দোষে দুষ্ট হবে। সাংকেতিক পরিচয় বাদ দিয়ে জীবন থেকে উদাহরণ নেওয়া যাক। যদি বলা হয় 'ওই ব্যক্তিটি কালো এবং কালো নয়' এবং এ কথা যদি হেঁয়ালি না করে বলা হয়ে থাকে, তবে বচনটি বিরুদ্ধতা বিধি লঙ্ঘন করেছে বলতে হবে, অর্থাৎ বচনটির মধ্যে বিরুদ্ধতা আছে, যার ফলে এটি বোধগম্য নয়। কারণ 'এই লোকটি কালো এবং কালো নয়' এই বচনটি আক্ষরিক অর্থে দুর্বোধ্য ; ব্যক্তির বা বস্তুর লক্ষণ স্বচ্ছ ও স্পষ্ট না হলে তা বোঝা যায় না।

চিন্তনের দ্বিতীয় বিধিটি হল নির্মাধ্যম বিধি। যার সাংকেতিক রূপ (ক ∨ ~ ক) যার অর্থ 'ক' অথবা 'ক-নয়' এর অতিরিক্ত কোনো বিকল্পের কথা ভাবা যায় না। যা কিছু জগতে আছে তা হয় 'ক' কোটির সদস্য অথবা 'ক-নয়' কোটির সদস্য, অথবা এ কোটিদ্বয়ের দ্বারা নির্মিত কোনো কোটির সদস্য। এই দুটি কোটির বাইরে কোনো তৃতীয় কোটি নেই। 'থট'-এর এই দ্বিতীয় বিধিটিকে উত্তর-আধুনিক নারীবাদীরা একান্তই সন্দেহের চোখে দেখেন। চিন্তনের এই বিধি মেনে নেওয়ার অর্থ হল প্রতিটি

বচন, প্রতিটি মত, সত্য অথবা মিথ্যা হবে। সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে অস্পষ্টতার কোনো তৃতীয় অবস্থান মানা যায় না কারণ আধুনিকরা মনে করেন অস্পষ্টতা একটি মানসিক অবস্থা, চিন্তা যখন নিশ্চিত হতে না পেরে তার রায় মুলতুবি রাখে তখনই অস্পষ্টতা জন্ম নেয়। অস্পষ্টতা জগতের ধর্ম নয়। নির্মাধ্যম বিধি মানলে জগতে আর চূড়ান্ত অনেকান্ত অবস্থা মানা যায় না। এই বিধি মানার সঙ্গে সঙ্গে এটাও মেনে নিতে হবে যে কোনো অবস্থানের প্রকৃত বহুমাত্রিকতা এর ফলে নিষিদ্ধ হল।

চিন্তনের তৃতীয় বিধিটি তাদাত্ম্য বিধি। যার সাংকেতিক রূপ (ক ⊃ ক) অর্থাৎ 'ক' 'ক-এর' সঙ্গে তাদাত্ম্যক। এর মানে ব্যক্তি নিজের সঙ্গে একমাত্র তাদাত্ম্যক হতে পারে— আর কারো সঙ্গে নয়। এতে যে কী অসুবিধে তা আমরা পরে বিচার করব।

আধুনিক দার্শনিকরা দাবি করলেন যে দার্শনিক বিচার শুরু হয় চিন্তনের স্বরূপ বিচার দিয়ে। চিন্তনের যে পূর্বতঃসিদ্ধ নিয়ামক বিধি আছে, এবং সেগুলি যে সার্বত্রিকভাবে প্রযোজ্য, ও ধ্রুবত্বগুণে বিশেষিত সে কথা আধুনিকরা সোচ্চারে বললেন। এই স্বীকার্যটির প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই আধুনিকদের ভাষা দর্শনে, ধারণা গঠনে এবং ব্যক্তির ঐচ্ছিক ক্রিয়া বিচারে। অতএব 'আধুনিকতা' বা 'মডার্নিজম' কথাগুলি যখন তকমারূপে ব্যবহার হয় তখন এই নামের নামী দেশ-কালে সীমাবদ্ধ বিশেষ কোনো তত্ত্ব, তন্ত্র বা জীবন-যাপনের প্রণালী নয়। আধুনিকতা এক ধরনের মনস্কতা যা থেকে জন্ম নেয় এক বিশেষ ধরনের চিন্তাপ্রণালী বা চিন্তার অভ্যাস।

মোটামুটি বলা যায়, আধুনিক মনস্কতায় অভ্যস্ত হলে প্রবণতা জাগে জগৎকে স্পষ্ট দুভাগে ভাগ করার, যথা 'ক' অথবা 'ক-নয়'। এই ভাগ না করা পর্যন্ত বিচার, বিবেচনা, ব্যাখ্যা চলতে থাকে যতক্ষণ না নিটোল দুটি বর্গ পাওয়া যায়—'ক' এবং 'ক-নয়'। শুধু যে ভাগ করা হয় তাই নয়, দুটি বর্গের মধ্যে একটিকে উৎকৃষ্ট ও অপরটিকে তদপেক্ষা নিকৃষ্ট মনে করারও চল আছে। প্রচলিত দুটি বর্গের কথা ধরা যাক—মানব এবং মানবেতর বর্গ। দুটি বর্গের নামকরণের মধ্যে দিয়ে বোঝা যায় কোনটি উৎকৃষ্ট কোনটি নিকৃষ্ট—মানব/মানবেতর (মানব-নয়)। চিন্তনের এই অভ্যাসের ফলে পার্থক্য এবং বৈষম্যের সূক্ষ্ম প্রভেদ লোপ পেয়ে যায়। মনে করা হয় নির্মাধ্যম বিধি যেখানে প্রযোজ্য সেখানে পার্থক্য ও মূল্যায়নের পার্থক্য, উভয়ই উপস্থিত থাকবে। বহু সামাজিক ভেদাভেদ সৃজনের জন্য চিন্তনের এই অভ্যাস দায়ী। আধুনিকদের

Scanned with

চিন্তাধারায় এই অভ্যাস প্রায় একটা সংস্কারের রূপ নিয়েছে। দুটি বর্গের মধ্যে মানগত পার্থক্য রয়েছে ধরে নিয়ে যখন সেইমতো আচরণ করা হয় তখন বৈষম্য ভাবনাও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়ে। চিন্তনের সঙ্গে অনুস্যূত, চিন্তনের আর একটি অভ্যাসবশে যে দুই বর্গের মধ্যে পার্থক্য ও বৈষম্য আছে বলে মনে করা হয়, সেই দুই বর্গকেই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বনির্ভর ভাবা হয়। তথাকথিত উৎকৃষ্ট বর্গটি যেন নিকৃষ্ট বর্গের ওপর নির্ভর না করেই থাকতে পারে।

এই প্রবণতাকে বলা হয় অস্বীকৃত-নির্ভরশীলতা, অর্থাৎ দুটি বর্গের মধ্যে পরস্পর নির্ভরশীলতা থাকলেও ভাষায় বা ব্যবহারে তা ফুটে ওঠে না—নিকৃষ্টের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করাই হয় না। একটি বর্গ যখন উৎকর্ষে ভাস্বর হয়ে দেখা দেয় এবং তার সাহায্যকারী বর্গটি যখন অদৃশ্য থেকে যায় তখন অবস্থাটা অনেকটা আকাশপ্রদীপ ও তার স্তম্ভের মতো। অদৃশ্য হওয়ার অর্থ এক্ষেত্রে নেপথ্যচারী হওয়া। অস্বীকৃত শ্রমের এটাই পরিণতি—সে শ্রমকে মনে করা হয় অকাজ বা নিকৃষ্ট কাজ—এই শ্রমের যেহেতু মর্যাদা নেই এই শ্রমিককেও মনে করা হয় পরাশ্রয়ী—যদিও বাস্তব ঘটনাটা ঠিক বিপরীত। তাহলে দেখা যাচ্ছে নির্মাধ্যম বিধির সূত্র ধরে একটি দ্বিচারী চর্যা পুষ্ট হয়ে ওঠে। বিধির স্তরে যা ছিল প্রভেদ-সূচক, বিধি প্রয়োগের স্থলে তা রূপান্তরিত হল বৈষম্যমূলক ও অস্বীকৃত-নির্ভরতার আচরণে। লক্ষণীয় এই যে এই ধরনের চর্যা চলতে থাকে চিন্তনবিধির সমর্থনপুষ্ট হয়ে। কখনো মনে করা হয় না যে এ স্থলে কোনো স্ববিরোধ আছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে আধুনিকমনস্কতা কেবল অ্যারিস্টটলীয় চিন্তা-বিধির দ্বারা নিরূপিত একটি চিন্তা-কাঠামো নয়, কাঠামোটির মধ্যে একটি চর্যাও যুক্ত হয়ে আছে। এই চর্যার শিকার হয়েছে বিভিন্ন বর্গ, যথা অশ্বেতাঙ্গ মানুষ, আদিবাসী সম্প্রদায়, নারী ও আরো অনেক অবহেলিত বর্গ।

এখানে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, যে বর্গগুলি একই চিন্তা-কাঠামোর চাপে অদৃশ্য, নেপথ্যচারী ও অবহেলিত, যারা প্রত্যেকে প্রকাশের ভাষা খোঁজে, তারা কেন বিভেদের ভাবনা ভুলে গিয়ে একই কর্মসূচিতে শামিল হতে চায় না? এদের মধ্যে এক-দলের 'উত্তর-আধুনিক নারীবাদ' (post-modern feminism) নামে একটি স্বতন্ত্র মতবাদ প্রতিষ্ঠা করে লাভ কী? লড়াই যখন তথাকথিত উচ্চবর্গের বিরুদ্ধে সৃজিত নিকৃষ্ট বর্গের তখন স্ব-স্ব কর্মসূচির দাবিতে আন্দোলনকে বহুধাবিভক্ত করার ফলে নারী কি তার আঘাত হানার শক্তি কমিয়ে ফেলছে না?

উত্তর-আধুনিক নারীবাদীরা তা মনে করেন না। তাঁরা মনে করেন আধুনিকতার চিন্তার অভ্যাসের ফলে যে বৈষম্যগুলি সৃজিত হয়েছে তার মধ্যে লিঙ্গ-বৈষম্যই হল প্রধান এবং দৃঢ়মূল—যার ফলে তা সহজে দূর হবার নয়। এর অপসারণের চেষ্টা একাগ্রভাবে না করলে ফল হবে না। অপরাপর কর্মসূচির সঙ্গে এই আন্দোলনকে জড়িয়ে ফেললে নারীবাদী আন্দোলন লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে দুর্বল হয়ে পড়বে, অতীতে যেমন বহুবার হয়েছে।

সব বৈষম্যের উৎস এক নয়—যদিও অনেক সময় তাই মনে করা হয়। যেমন বলা হয় শিক্ষার প্রসার ঘটলে মনের প্রসার ঘটবে, আর মন প্রসারিত হলে সবরকম বৈষম্য ভাবনা দূর হবে, ফলে শিক্ষার অভাবই হল বৈষম্যের মূল। বাস্তবে কিন্তু দেখা গেছে শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে অনেক প্রকার বৈষম্য দূর হলেও লিঙ্গ-বৈষম্য দূর হয়নি। অনুরূপ প্রত্যাশা জেগেছিল অর্থনৈতিক পরিকাঠামো বদলের বেলায়। অথচ দেখা গেল অর্থনৈতিক পরিকাঠামো বদল হলেও লিঙ্গ-বৈষম্য দূর হয়নি। হয়নি তার কারণ এই বদলগুলির ফলে মূল জায়গাটা অপরিবর্তিত রয়ে গেল।

তবে যে প্রায় ২০০ বছর ধরে দেশে-বিদেশে নারী এককভাবে ও যৌথভাবে তার অর্থনৈতিক ও শিক্ষার অধিকার সম্বন্ধে সোচ্চার হয়েছে তার প্রতিফলন কি কোথাও নেই? আছে বৈকি। নারী নানা অধিকার পেয়েছে, তার বহু অনধিগম্য দেশ অধিগম্য হয়েছে। সবই ঠিক, তবু চিন্তার কাঠামোতে এই পরিবর্তনের প্রতিফলন দেখা যায়নি। বিভেদ আর বৈষম্য ভাবনা এখনও পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত রয়েছে। যার ফলে এক জায়গায় বৈষম্য ভাবনা নির্মূল হলেও নবতর রূপ নিয়ে, প্রভেদকে ঘিরে, বৈষম্যমূলক আচরণ আবার শুরু হয়—সতীদাহ যায়, বধূহত্যা আসে, বধূহত্যা যায় আসে কর্মস্থলে যৌন লাঞ্ছনা। এক্ষেত্রে করণীয় কী? কোনো কোনো নারীবাদী মনে করেন অতন্দ্র প্রহরায় থাকা ছাড়া উপায় নেই—অবহেলা, বৈষম্য, অবদমন দেখলে প্রতিবাদ করতে হবে, যুক্তি দিয়ে দেখাতে হবে কোথায় চিন্তা আচ্ছন্ন হচ্ছে। বোঝাতে হবে কোন আচরণ অবমাননাকর এবং কেন? বোঝাতে হবে যে, ব্যক্তিকে তার স্ব-ভাব প্রকাশ করতে না দেওয়া হল অবদমন ও অবমাননার নামান্তর।

ব্যক্তির স্ব-ভাব বা 'পার্সোনাল আইডেন্টিটি' নির্মাণের নানা দার্শনিক ব্যাখ্যা থাকা সত্ত্বেও আধুনিকদের ঘরানায় স্বীকৃত প্রক্রিয়া একটাই। কোনো ব্যক্তি একাধারে 'ক' এবং 'ক-নয়' এমন দুটি ধর্মের অধিকারী হতে পারে না, ব্যক্তি তার নিজের সঙ্গেই

Scanned with

তাদাত্ম্য সম্বন্ধে যুক্ত, অপর কারোর সঙ্গে নয়। অভিন্নতা প্রতিষ্ঠিত না-হওয়া অবধি ব্যক্তি পরনির্ভর ও অপূর্ণ। একটু ভাবলেই বোঝা যাবে যে ব্যক্তির স্ব-ভাবে প্রতিষ্ঠার এই প্রক্রিয়া কার্যত উৎকট ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তির অনন্যতা প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে। এখানেও উত্তর-আধুনিক নারীবাদীদের আপত্তি। এক ব্যক্তি যদি অপর ব্যক্তি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়, তবে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে সম্পর্ক হয়ে দাঁড়াবে কৃত্রিম ও বাহ্যিক। ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে অন্তর্নিহিত যোগ বজায় রাখার কোনো সূত্র থাকবে না। তখন সহজ হবে বলা যে, 'এই ব্যক্তি "ক" এবং "ক-নয়" নয়'। এরপর সহজতর হবে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে নির্ভরশীলতা অস্বীকার করা। ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে সম্পর্ক এর ফলে বিপন্ন হবে বলে আধুনিকরা মনে করে না। তবে সব সম্পর্ক যে একরৈখিক চালে চলবে তা বোঝা যাচ্ছে।

জগতের সব পারস্পরিক সম্পর্ক আধুনিকদের মতে হয় চুক্তিবদ্ধ সম্পর্ক নতুবা উচ্চ-নীচ স্তরবিন্যাসের সম্পর্ক। নিঃসন্দেহে এতে ক্ষমতার তারতম্য বজায় রাখতে সুবিধে হয়। আর-একবার প্রমাণিত হল যে আধুনিক যুগে স্বীকৃত চিন্তাবিধির সঙ্গে একধরনের চর্যার যোগ আছে যা স্ব-নির্ভরতার সমর্থক। তাতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু অপরের সাহায্যে দাঁড়িয়ে তারপর তা অস্বীকার করা অবশ্যই দোষের। অস্বীকৃত-নির্ভরতার ফলে একটা শ্রেষ্ঠত্ব বোধ জাগে। নির্মাধ্যম নীতির বেলায় দেখলাম পার্থক্য কেমন করে বৈষম্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়, এবার তাদাত্ম্য-নীতি প্রয়োগের বেলায় দেখছি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য কেমন করে বৈষম্যবর্ধক স্তরবিন্যাসের সমর্থক হয়। এইটাই কি অনিবার্য ছিল? এমন একটি সম্ভাবনার কথা কি ভাবা যায় না যেখানে 'লজ অব থট' বা চিন্তার বিধি অনুসরণ করেও সাম্যবাদী চর্যা পালন করা যায়?

উত্তর-আধুনিক নারীবাদীরা মনে করেন তা হবার নয়। এর কারণ একাধিক হলেও প্রথম এবং প্রধানতম কারণ একটি, বাকিগুলি তারই অনুসিদ্ধান্ত মাত্র। এঁদের মতে নিছক আধুনিক তত্ত্ব ও তার অপপ্রয়োগের ফলে নারী-অবদমনের চর্যা জন্ম নেয়নি—সমস্যাটি দেখা দিয়েছে ক্ষমতার অসম বণ্টনের দরুন। নির্মাধ্যম নিয়ম জগৎকে 'ক' অথবা 'ক-নয়' দুটি ভাগে ভাগ করে। এবার এই দুটি কোটির মধ্যে কোনটি মুখ্য, কোনটি গৌণ, কোনটি উৎকৃষ্ট কোনটি নিকৃষ্ট তা ঠিক হয় ক্ষমতার একটি সূক্ষ্ম চালের মধ্যে দিয়ে। এই প্রক্রিয়াটি রাজনৈতিক। 'রাজনৈতিক' পদটি এখানে খুব ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। যে কোনো ক্ষমতার সম্পর্ককেই রাজনৈতিক

সম্পর্ক বলা যায়, যেমন, নারী-পুরুষের সম্পর্কটি রাজনৈতিক। বন্ধুত্বের সম্পর্কটিও রাজনৈতিক। তেমনি আবার পলিটিক্স অব কম্যুনিকেশন বা ভাব আদান-প্রদানের রাজনীতির কথাও বলা হয়।

উত্তর-আধুনিক নারীবাদীরা আপত্তি করেন যে আধুনিকরা গোড়াতেই ফতোয়া জারি করলেন যে 'ইহাই চিন্তার বিধান'; এই বিধানের অন্যতর রূপ বা বিকল্প বিধান অন্বেষণের কোনো সুযোগ দেওয়া হল না। শুধু তাই নয়, ঘোষণা করা হল যে চিন্তার বিধান অমান্য হলে বোধের বিপর্যয় ঘটবে। এককথায় বলতে গেলে যুক্তিশীল চিন্তা আর বোধ বা রিজন অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিংকে সমব্যাপী করা হল। যার ফলে, যে ব্যাখ্যা এই বিধিবহির্ভূত ভাবে করা, যা স্বজ্ঞা বা সহজিয়া উপলব্ধি প্রসূত, তা নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্তরূপে অগ্রাহ্য। ঠিক যেমন অগ্রাহ্য ব্যক্তির স্ব-ভাব নির্মাণের বিকল্প ব্যাখ্যা। বলা যাবে না যে মানুষ স্বরূপত সম্পর্কিত, তার স্বতন্ত্র স্বনির্ভর রূপটিই কৃত্রিম।

আধুনিক দার্শনিকদের কী অসাধারণ আত্মপ্রত্যয়, নির্দ্বিধায় তাঁরা বলে যেতে পারেন কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল, কোনটা সত্য, কোনটা অসত্য, কোনটা সার্থক আর কোনটা নিরর্থক। যেন এক ঐশী শক্তিবলে তাঁরা স্থান, কাল ও পাত্র নিরপেক্ষে বিধান দিয়ে যেতে পারেন : একটুও সংশয়ে বুক কাঁপে না। এঁদের আছে যেন সেই বহুবন্দিত 'গডস-আই ভিউ'। এত নিশ্চিত হতে পারে বলে মনে হয় আধুনিকরা হয় খুব সরলমনা অথবা তাঁরা ধূর্ত। উত্তর-আধুনিকরা মনে করেন তাঁরা ধূর্ত। চিন্তার অনিবার্য বিধির দোহাই দিয়ে বৈষম্য সৃজন করা থেকে শুরু করে সুকৌশলে মতের বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করা পর্যন্ত যে প্রচ্ছন্ন কর্মসূচি অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে উত্তর-আধুনিক মননে তাকে সনাক্ত করা হয়েছে পুরুষতন্ত্রের কর্মসূচিরূপে। একটি বিশেষ ধরনের যুক্তির কাঠামো আর তার মধ্যে বিধৃত একটি বিশেষ চর্যার মাধ্যমে নীরবে কাজ করে যায় পুরুষতন্ত্র।

পুরুষতন্ত্রের প্রবক্তা একটি বিশেষ পুরুষ বা একটি পুরুষ-প্রধান গোষ্ঠী নয়। বলা হচ্ছে জগতে প্রকৃতির নিয়মে স্বাভাবিকভাবে দুটি বর্গ আছে—পুরুষ ও নারী। এদের উভয়ের স্ব-ভাব ভিন্ন। তথাকথিত পুরুষোচিত গুণাবলীকে প্রাধান্য দেওয়ার মধ্য দিয়ে যে গুণ পুরুষোচিত নয় তাকে হেয় করা হয়। প্রক্রিয়াটা অনেকটা এরকম, প্রতিটি সমাজে পুরুষ ও নারীর কিছু নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করতে হয়। এই

Scanned with

ভূমিকাগুলি প্রতিটি সমাজের নিজস্ব সৃজিত ভূমিকা। মনে পড়ে সিমোঁ দা বুভোয়া-র (Simone de Beauvoir 1908-86) বিখ্যাত উক্তি 'ওয়ান ইজ নট বার্ন, বাট রাদার বিকামস, এ ওমান।' (*The Second Sex*) । নারী ও পুরুষ ছাড়া থাকে একটা আদর্শ মানবের কল্পনা। পুরুষ ও নারীর পরিচয় লিঙ্গ-সাপেক্ষে করা হলেও মানব বা হিউম্যান-এর কল্পনা কিন্তু লিঙ্গ-নিরপেক্ষ বলে দাবি করা হয়। যেমন কোনো সমাজে হয়তো পুরুষের চাকরি আর নারীর সংসার করাটা প্রত্যাশিত ভূমিকা, অপর সমাজে হয়ত প্রত্যাশা করা হয় নারী রোজগার করবে না। প্রত্যাশা জাগে সামাজিক কারণে, সমাজে লিঙ্গ-ভেদে ভূমিকা-ভেদ করা হয় বলে। এই পার্থক্য জন্মগত নয়, সমাজের দ্বারা সৃজিত পার্থক্য।

সৃজন-নিরপেক্ষ, লিঙ্গ-নিরপেক্ষ, মানুষের অনুগত সাধারণ ধর্ম তবে কী? এ বিষয়ে প্রায় সর্বজনগ্রাহ্য মতে মানুষের সাধারণ ধর্ম হল, সে যুক্তি বা রিজন দিয়ে সব কিছু বোঝার চেষ্টা করে, সে বিমূর্ত ধারণার অধিকারী, সে অনাসক্ত ও সমদর্শী। মানুষের এই চরিত্রায়ণের ফলে দুটো জিনিস হয়, প্রথমত দেখা যায় পুরুষের সৃজিত লিঙ্গ-সাপেক্ষ ধর্ম আর মানুষের ধর্মের মধ্যে সাদৃশ্য আছে, অথচ নারীর সৃজিত লিঙ্গ-সাপেক্ষ ধর্মের সঙ্গে সাদৃশ্য নেই। নারী স্নেহময়ী, মমতাময়ী, সে স্বাতন্ত্র্য চায় না : আর পাঁচজনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকতে চায়।

ফলে দেখা যাচ্ছে, আদর্শ মানুষ হতে গেলে পুরুষকে যতটা নিজেকে বদল করতে হয় নারীকে তার চেয়ে অনেক বেশি বদল করতে হয়। তাকে সহজিয়া আচরণ ত্যাগ করে রিজন দিয়ে সব কিছু বিশ্লেষণ করার প্রক্রিয়া রপ্ত করতে হয়। দ্বিতীয়ত, পুরুষ আদর্শ মানুষের গুণাগুণ আয়ত্ত করার মধ্যে দিয়ে সমাজে একটা প্রভুত্বের আসন অধিকার করে, আর নারী পায় আশ্রিতের ভূমিকা। সমাজে এগিয়ে থাকা আর পিছিয়ে থাকার বিচার হয় 'মানুষের আদর্শ' অর্জন করতে পারা-না-পারার নিরিখে। এগোতে হলে ব্যক্তিকে চেষ্টা করতে হবে আরো যুক্তিনির্ভর বা র‍্যাশনাল হতে। অর্থাৎ তত্ত্বে ও কর্মে আরো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে 'লজ অব থট' বা চিন্তনের বিধি মেনে চলার কৌশল আয়ত্ত করতে হবে। উত্তর-আধুনিক নারীবাদীরা প্রতিবাদ করেন যে এই প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করলে সর্বক্ষেত্রে দেখা দেবে একটি কৃত্রিম রেষারেষি—চলবে পুরুষের লিঙ্গ-ধর্ম অর্জনে নারীর প্রচেষ্টা আর নারীর সঙ্গে লিঙ্গ-পার্থক্য বজায় রাখায় পুরুষের প্রচেষ্টা।

উত্তর-আধুনিক নারীবাদীরা মনে করেন জগতে সৎবস্তুর 'প্রকৃত প্রকার' বা 'ন্যাচরাল কাইন্ড' নেই, ভাষায়, তত্ত্বে ও আচরণে যে বিভাজন করা হয়, যা না-করলে আমরা জগৎকে বুঝতে পারি না, তা সবই সৃজিত এবং আপেক্ষিক। যার ফলে খুব স্পষ্ট করে কাকে বলব পুরুষ ও কাকে বলব নারী তা বলা যায় না—নারীর কিছু ধর্ম পুরুষের থাকতে পারে আবার পুরুষের কিছু ধর্ম নারীতে থাকতে পারে। জগতের প্রতিটি ক্যাটিগরি বা বর্গের বেলায় তাই হয়। চিন্তার অস্পষ্টতার জন্য যে এমন হয় তা নয়। দেরিদার ভাষায় বলা যায় সিদ্ধান্ত সর্বদাই 'ডেফার' বা মুলতুবি রাখতে হয়। কারণটা এমন নয় যে সংশয়ের নিরসন হয় না, বা মানুষের জ্ঞান সর্বদাই সীমিত—সর্বজ্ঞ হলে সে সঠিক স্বরূপ জানতে পারত। উত্তর-আধুনিকরা নারী-পুরুষের বিশিষ্টতার কথা বলে। সেই সঙ্গে তাদের স্বরূপ নির্দিষ্ট করতে তারা চায় না। এতদসত্ত্বেও উত্তর-আধুনিকরা নিজেদের 'রেলেটিভিস্ট' বা সাপেক্ষবাদী বলেও পরিচয় দিতে চায় না। তাদের যুক্তিটি দেরিদা খুব স্পষ্ট করে বলেছেন। তিনি বলেন—'আমি যদি অপরের বিশিষ্টতা, পরিস্থিতির বিশিষ্টতা, ভাষার বিশিষ্টতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, সেটা কি সাপেক্ষতাবাদ? আমি যদি বলি ইংরেজি ভাষা রয়েছে, ফরাসি ভাষা রয়েছে এবং এগুলির প্রতি মনোযোগ দিতে হবে, এই মনোযোগ দেওয়া কি সাপেক্ষিকতা? না, সাপেক্ষতাবাদ একটি মতবাদ যার নিজস্ব ইতিহাস আছে, এটি এমন একটি মত যেখানে কেবল বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে যার চূড়ান্ত কোনো আবশ্যিকতা নেই বা চূড়ান্ত আবশ্যিকতার প্রতি কোনো ইঙ্গিত নেই। এটা আমার বক্তব্যের ঠিক বিপরীত।... আমি পার্থক্যের কথা বলি কিন্তু আমি সাপেক্ষতাবাদী নই।'[১]

উত্তর-আধুনিক নারীবাদীরাও একথা বলবেন। অপরের মত, অপরের বক্তব্য, মন দিয়ে শুনতে হবে। নিরন্তর আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং সেই সিদ্ধান্ত পুনর্বিচারেরও সুযোগ রাখতে হবে। এরপরও যদি কেউ বলেন, 'সবই মানলাম কিন্তু সব বিচারের শেষে একটা স্পষ্ট সিদ্ধান্ত পাওয়া যাবে তো? বা এটা অন্তত বলা যাবে তো যে দুটো অবস্থান একত্রে সত্য হতে পারে না, যেমন "ক" এবং "ক-নয়"-এর অবস্থান, অথবা অন্যভাবে বলা যাবে যে সিদ্ধান্ত যা-ই হোক সেটা হবে "ক" অথবা "ক-নয়"?' উত্তর-আধুনিকদের কাছে এ প্রস্তাব গ্রাহ্য নয়। তাঁরা মনে করেন প্রকৃত অবস্থাটা অনেক বেশি জটিল, ওরকম স্পষ্ট সাদা-কালো দাগে বিচার

Scanned with

করা যাবে না। একাধিক ব্যাখ্যা যখন একই সঙ্গে মনোযোগ দাবি করে তখন তাদের মধ্যে একটা টানাপোড়েন চলতে থাকে, তবু সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এমন অনিশ্চয় পরিস্থিতিতে বা আনডিসাইডেড অবস্থায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় সমস্যাটির নৈতিক ও রাজনৈতিক মাত্রা অবশ্যই বিচার করতে হয়।

আমরা গোড়ার দিকে নির্মাধ্যম বিধি নিয়ে যে আলোচনা করেছি তার দিকে ফিরে তাকানো যাক। বলা হয়েছিল এই বিধি বিকৃত প্রায়োগিক অভ্যাসকে প্রশ্রয় দেয়। তত্ত্বের দ্বারা সনাক্ত-নিরপেক্ষ প্রভেদ যখন প্রয়োগের স্তরে বৈষম্যসূচক হয় তখন তা নিঃসন্দেহে দোষের। তবে কি তত্ত্ব আর প্রয়োগের ব্যবধান না ঘটলেই আর দোষ থাকে না? ব্যবধান দূরীকরণ কর্মসূচি যে নারীবাদীরা নিয়েছেন তাঁরা আধুনিক দর্শনের তত্ত্ব-কাঠামোর ভেতরে থেকেই কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁরা সচেষ্ট হচ্ছেন আরো নৈর্ব্যক্তিক বা অবজেক্টিভ হতে, যাতে প্রয়োগের স্তরে প্রভেদের ওপর মূল্যের বোঝা আর চাপানো না হয়।

উত্তর-আধুনিক নারীবাদীরা মনে করেন দোষটা নিছক তত্ত্ব আর প্রয়োগের ফারাকের জন্য নয়। গলদ আরো গোড়ায়। প্রভেদ নির্ণয়ের প্রক্রিয়াটাই আধুনিক তন্ত্রে গোলমেলে। 'ক' এবং 'ক-নয়' এমন দুটি স্পষ্ট বিভাজন করা যায় তখনই যখন 'নয়' বা 'নেগেশন'-এর সাহায্যে অন্যোন্যভাব সূচিত হয়। উত্তর-আধুনিকরা মনে করেন না যে নারী/পুরুষ, মানুষ/প্রকৃতির মধ্যে অন্যোন্যভাব রয়েছে। তাঁরা বলবেন উভয়ের মধ্যে ভেদও আছে, প্রাবরণ বা ওভারল্যাপও আছে, এবং দুটি কোটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র না হওয়ায় পরস্পরের ওপর নির্ভরতাও আছে। অস্তিত্বের জন্য নির্ভরতা আছে—স্ব-ভাব সৃজনেও নির্ভরতা রয়েছে। ফলে একটি বর্গকে উৎকৃষ্ট এবং অপরটিকে নিকৃষ্ট বা একটিকে চিন্তার কেন্দ্রে ও অপরটিকে প্রান্তে স্থান দেওয়ার অভ্যাস বদল করতে হবে। এর জন্যে চাই চিন্তনের প্রণালীর বদল—'ক এবং ক-নয়', 'ক অথবা ক-নয়' বা 'ক নিজের সঙ্গে তাদাত্ম্যক বা আইডেন্টিকাল আর কিছুর সঙ্গে নয়' বলার সময় 'নয়' বা 'নেগেশনের' স্বরূপ পরীক্ষা করা দরকার।

নেগেশনকে অন্যোন্যভাবের দ্যোতক না-ভেবে তাকে আরো সম্পর্কিত ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় কি না দেখতে হবে। চূড়ান্তভাবে 'হ্যাঁ' বা 'না' বলা ছাড়াও তো বিকল্প থাকতে পারে। নেগেশনের একটা অনেকান্ত ব্যাখ্যা হতে পারে কিনা ভেবে দেখা প্রয়োজন। এই সমস্যাটিকে নিয়ে চিন্তাভাবনা অনেক দূর এগিয়েছে। বলাই বাহুল্য

আধুনিকদের তত্ত্বকাঠামোর মধ্যে থেকে নেগেশনের এ হেন ব্যাখ্যা সম্ভব নয়—দ্বিমাত্রিক তর্কবিদ্যা নাকচ করে বিকল্প তর্কবিদ্যার উদ্ভাবন করতে হবে।

ভ্যাল প্লামউড এ পথ বেছে নিয়েছেন। দ্বি-মাত্রিক লজিকের বিকল্পরূপে 'রেলিভ্যান্ট লজিক' মানার প্রস্তাব দিয়ে নারীবাদী মহলে প্লামউড একটা ছোটোখাটো বিপ্লব আনছেন। তবু তাঁকে উত্তর-আধুনিক বলা যাবে কিনা সন্দেহ। তর্কবিদ্যার অনুষঙ্গে বৈপ্লবিক প্রকল্প সমর্থন করলেও দর্শনে তাঁর অবস্থান পুরোপুরি উত্তর-আধুনিক নয়। উনি তর্কশাস্ত্রে একটি তত্ত্ব-কাঠামো বর্জন করে অপর একটি তত্ত্ব-কাঠামো বহালের কথা ভাবছেন। তাঁর সিদ্ধান্ত প্রকৃত অর্থে বিনির্মাণানুগ নয়।

লজিকের পুরোপুরি বিনির্মাণের চেষ্টা কোনো নারীবাদী করেছেন বলে আমার জানা নেই, হয়তো উত্তর-আধুনিকদের পক্ষে এমন প্রকল্প নেওয়াও সম্ভব নয়। কারণ একটা তর্কশাস্ত্র ত্যাগ করে একাধিক বিকল্প গ্রহণের সুযোগ আছে। এমনকি একাধারে ভিন্ন-ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন-ভিন্ন লজিক প্রাসঙ্গিক বলে স্বীকার করা যেতে পারে। কিন্তু লজিককে বিনির্মাণের রূপ দেওয়ার অর্থ লজিককে একটা জায়মান রূপ দেওয়া — সেটা কি সম্ভব?

নারীবাদীদের অনেকে মনে করেছেন অ্যারিস্টটলের 'লজ অব থট' নিয়ন্ত্রিত তত্ত্ব-কাঠামোর ভেতরে থেকে আর সেই কাঠামো ভাঙা যাবেই না, উপরন্তু প্রচলিত ভাষার মধ্যে দিয়েও এই বিপ্লব আনা যাবে না। যে ভাষায় আমরা কথা বলতে অভ্যস্ত সে ভাষা আধুনিকদের চিন্তন-বিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। একমাত্র যখন রূপক, উপমা, অলংকার বা নৈঃশব্দ্যের মধ্যে দিয়ে আমরা নিজেকে প্রকাশ করি তখন ভাষার কিছুটা বিনির্মাণ হয়। উপমা, অলংকারাদি বাদ দিয়ে বক্তব্যের নির্গলিতার্থ উদ্ধারের একটা প্রবণতা থেকে যায়। সকল উক্তির মধ্যে যেন একটি স্বচ্ছ ও স্পষ্ট বক্তব্য লুকিয়ে আছে যা চিন্তনের বিধির দ্বারা চালিত এবং যা উদ্ধার করা যায়।

এ এক জটিল অবস্থা। যখনই বলা হয় নতুনভাবে ভাষা ব্যবহার করা হচ্ছে, তর্কশাস্ত্রের অভিনব বিকল্প গড়া হচ্ছে, তখনই যদি সোচ্চারে প্রচার করার চেষ্টা করা হয় যে তথাকথিত নতুন ব্যবহারের সঙ্গে প্রচলিত ব্যবহারের কোনো মৌলিক বিরোধ নেই তাহলে আর নতুন কথা কী করে বলা যায়? নতুন মতকে প্রাচীন মতের অঙ্গীভূত করে নেওয়াটা একটা সুপরিচিত রাজনৈতিক কৌশল, যাকে বলা হয় অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বা অধিগ্রহণ। নতুনকে যদি প্রাচীনের সঙ্গে বিরোধহীন সহাবস্থানে

Scanned with

রাখা যায় বা নতুন যদি প্রাচীনে রূপান্তরিত হয় তা হলে আর আন্দোলন, বিদ্রোহ, বিপ্লবের সুযোগ থাকে না, প্রয়োজনও ফুরিয়ে যায়।

উত্তর-আধুনিকদের একটা বড় অংশ চান সম্পূর্ণ নতুন ভাষা, নতুন ধারণার পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে। তাঁরা চান কিছুতেই যেন আর প্রচলিত তত্ত্ব-কাঠামোর অধিগ্রহণের ফাঁদে পা দিতে না হয়। ফরাসি উত্তর-আধুনিক নারীবাদীরা বিশেষ করে এই কর্মসূচির সমর্থক। মার্কিন দার্শনিক রিচার্ড রোরটি দর্শনের অপ্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করে সাহিত্যচর্চার পরামর্শ দিয়েছেন আর সেই সঙ্গে প্র্যাগম্যাটিক হওয়ার প্রয়োজনের কথাও বলেছেন। ফরাসি নারীবাদী দার্শনিকরা তা বলেন না। এঁদের মধ্যে ইংরেজিভাষী দুনিয়ায় যাঁরা অতি পরিচিত—তাঁদের কাজ ইংরেজিতে অনবরত অনুবাদ হয় বলেই বোধহয়—তাঁরা হলেন হেলেন সিক্সু, জুলিয়া ক্রিস্টিভা ও লুস ইরিগারে। এঁরা তিনজনেই প্রকৃত অর্থে বিনির্মাণের কথা বলেন, শুধু ব্যবহারিক তাগিদে রোরটির মতো তত্ত্ব-বিরোধী কথা বলেন না। দর্শন থেকে সাহিত্যে যাওয়ার তাগিদও এঁদের কাছে নিছক তত্ত্বের নিগড় থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নয়। এঁরা চান সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করতে।

নারীমুক্তির প্রকৃত অর্থ এঁদের কাছে চিন্তার মুক্তি—তার মানে যা ইচ্ছা তাই চিন্তা করতে পারা নয়, তার মানে প্রচলিত চিন্তা-প্রক্রিয়া থেকে মুক্তি। অভিনব এক মিশ্রমাধ্যম তৈরি করে নিয়েছেন তাঁরা। সেখানে তত্ত্বের আলোচনায় মিশে যায় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আর তারই টানে চলে আসে সাহিত্য। নানা অভিজ্ঞতার প্রাবরণ বা ওভারল্যাপ কী অনায়াসে ঘটিয়ে তোলেন এঁরা। সুচিন্তিত রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে এমনটি করা হয়। তাঁরা মনে করেন দেহের তুলনায় মন, আত্মা ও চিন্তনকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ফলে দর্শনে দেহ এবং দৈহিক অভিজ্ঞতা অবহেলিত হয়েছে। সংবেদনশীল ঘনিষ্ঠতার অভিজ্ঞতা বা 'দা এক্সপিরিয়ান্স অব সেনসিটিভ ইন্টিমেসি'-কে ভাষায় প্রকাশযোগ্য করতে হবে। এক্ষেত্রে সাহিত্যই হতে পারে প্রকাশের প্রকৃষ্ট মাধ্যম। প্রশ্ন উঠতে পারে এতে আর আন্দোলন কতটা অগ্রসর হবে? ক্রিস্টিভা বলেন, এই পন্থাকে 'ন্যূনতম বিপ্লবের' পথ মনে হতে পারে। যে (পুরুষ)তন্ত্রে সবরকম বিপ্লবের পথ রুদ্ধ সেখানে ন্যূনতম বিপ্লবের মূল্য কম নয়।

আমরা দেখেছি পুরুষতন্ত্রে কেমন করে লিঙ্গ-ধর্ম সৃজনের মধ্য দিয়ে নারী-পুরুষে বিভেদ ঘটিয়ে চিন্তার রাজ্যে বৈষম্য প্রোথিত হয়। বৈষম্য সৃষ্টির প্রক্রিয়ারই আর

একটা দিক হল কালচার সৃষ্টির দায়িত্ব পুরুষের হাতে ছেড়ে দিয়ে জীবনদায়িনী ও জীবপালিনীর ভূমিকা নারীর জন্য সংরক্ষিত রাখা। এ থেকে কী করে শক্তির অসম বণ্টন ঘটে তা অনায়াসে বোঝা যায়।

ক্ষমতা দখলের কৌশল হিসেবে নারীবাদীরা নানা বিকল্প কর্মসূচি বেছে নিয়েছেন। একদল মনে করেছেন ভূমিকা বণ্টনের নীতিটি মন্দ নয়—নারীর ভূমিকায় নারীকে সম্মান করলেই হল। উত্তর-আধুনিক নারীবাদীরা ভূমিকা বিভাজনের প্রকল্প সম্বন্ধে সন্দিহান। আধুনিকরা নির্মাধ্যম বিধির নিয়ন্ত্রণ মেনেই বিভাজন করবে। এই বিভাজনে ধরে নেওয়া যাক 'ক' হল পুরুষ আর 'ক-নয়' নারী। চিন্তনের অভ্যাস বশে যদি 'ক'-কে উৎকৃষ্ট করা হয় : তখন দেখা যায় কলুষতা থেকে তার জীবপালিনী, জীবনদায়িনী শক্তিকে মুক্ত রাখার জন্য সমাজের অন্যান্য কর্মকাণ্ড থেকে তাকে দূরে রাখা হয় যাতে সে রাজনীতির নোংরামো থেকে গা-বাঁচিয়ে চলতে পারে। কিন্তু তা কি সম্ভব? উত্তর-আধুনিকরা বলেন—'রাজনীতি কোথায় নেই?' 'ও তো সর্বব্যাপী', রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে না দেওয়া মানে নারীকে 'সসম্মানে' শক্তিহীন করে রাখা।

নারীবাদীদের এক বড় অংশ দ্বিতীয় একটি বিকল্প কর্মসূচির সমর্থন করেন—তা হল ক্ষমতার প্রতিষ্ঠিত স্থলগুলিতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা। প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার অংশীদার হলে নারী 'এম্পাওয়ার্ড' (empowered) হবে, অর্থাৎ সে নিজে ক্ষমতাশালী হবে। এই প্রকল্পকে বলা হয় 'অন্তর্ভুক্তির প্রকল্প' — তার মানে একটা ব্যবস্থা চলে আসছে যেখানে রিজনকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, আর সংবেদন, দরদ ও হৃদয়াবেগকে রিজনের নিয়ন্ত্রণে রাখার সুপারিশ করা হয়, সেই সঙ্গে রিজনকে তুলনামূলকভাবে উৎকৃষ্ট মনে করা হয়।

এযাবৎ নারীকে করুণাময়ী, মাতৃরূপিণী, সেবাময়ী মূর্তিতে সৃজন করা হয়েছে, বলা হয়েছে চিন্তন, বোধ, বিমূর্ত ভাবনা, বিশ্লেষণী কৌশলে নারী অপটু। এ হেন বিভেদ তথা বৈষম্যের জন্য নারী অবদমিত হয়ে আছে। মুক্তি পেতে হলে নারীকে প্রমাণ করতে হবে যে সে-ও পারে হৃদয়াবেগকে রিজন-এর দ্বারা নিয়ন্ত্রণে রাখতে। পারে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ মানুষের আদর্শ জীবন যাপন করতে, ক্ষমতার অধিকারী হতে। উত্তর-আধুনিক নারীবাদীর কাছে এই বিকল্প কর্মসূচি সমর্থনযোগ্য নয়।

'অন্তর্ভুক্তির প্রকল্প' পারে না নারীমুক্তি দিতে। 'অন্তর্ভুক্তি' বলতে ক্ষমতার

অন্তর্ভুক্তির কথা বলা হচ্ছে। পুরুষতন্ত্রে ক্ষমতার লীলা বড় বিধ্বংসী—তন্ত্রটি একপক্ষকে ক্ষমতা প্রদান করে, আর অপরপক্ষকে নিঃস্ব করে। এই প্রকল্পের ফলে তার মুক্তি হয়ে ওঠে তার শৃঙ্খল। যে নারী সংসারের চৌহদ্দি থেকে বেরিয়ে কর্মজীবনে যোগ দেয় সে আপাতদৃষ্টিতে মুক্ত। তার খানিকটা অর্থনৈতিক মুক্তিও হয়তো ঘটে। পাশাপাশি তাকে প্রতিনিয়ত প্রতিষ্ঠা করতে হয় যে সে নবার্জিত ভূমিকার যোগ্য, সজাগ থাকতে হয় যাতে ক্ষমতার ভাগ-বাটোয়ারায় তার প্রাপ্তির অংশ কম না হয় এবং তার নিজের ক্ষমতা বলবৎ আছে কি না প্রমাণ করার জন্য তাকে মাঝে মাঝে ক্ষমতা ফলাতে হয়।

তার মানে নারী যে ক্ষমতার শিকার হয়েছিল এখন একই ক্ষমতার বলে সে শিকারি। নতুন ভূমিকা পালনের জন্য তাকে বিসর্জন দিতে হচ্ছে তার এতদিনের লালিত মাতৃত্বের প্রবণতা। যদি ধরেও নেওয়া হয় যে নারীর এই প্রকৃতি সহজাত নয়, অর্জিত, তবুও তো দীর্ঘদিন ধরে মাতৃত্বের ভূমিকা পালন করতে করতে এটাই হয়ে ওঠে তার অর্জিত স্বভাব—যে স্বভাবের সঙ্গে সে নিজেকে একাত্ম করে দেখে। এতটাই একাত্ম যে পুরুষ-শাসিত সমাজে স্বাধিকারে প্রবেশ করেও তার পূর্বের অভ্যাসবশে সে জগতেও এমন ভূমিকাই নিয়ে ফেলে যা তার জীবনপালিনী শক্তির সঙ্গে খাপ খায়। যেমন লব্ধপ্রতিষ্ঠ মহিলা আধিকারিক মনে করেন বাৎসল্য সহকারে সহকর্মীদের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করা তাঁর কর্তব্য। মনস্তত্ত্বের পরিভাষায় একে বলে 'মাদারিং' বা জননীসুলভ ব্যবহার। আশ্চর্যের ব্যাপার হল যে নারীর এই ব্যবহার সহকর্মীদের কাছে কাঙ্ক্ষিত হলেও কর্মক্ষেত্রে তা বিশেষ কৃতির পরিচায়ক নয়, শক্তির প্রতিযোগিতায় এই গুণ কোনো কাজে তো লাগেই না, উল্টে তা নারীর দুর্বলতা প্রতিপন্ন করে।

উত্তর-আধুনিকরা 'অন্তর্ভুক্তির প্রকল্প' সমর্থন করেন না, কারণ এতে শক্তির অসম বণ্টন থেকেই যায়। একদল নারী প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা অর্জন করে ঠিকই কিন্তু এতে (বৈষম্যের) ধারণার স্তরে পরিবর্তন আসে না। ক্ষমতাচ্যুতরা ক্ষমতা পেলেও অপর একদল বঞ্চিত থেকেই যায়। এতে অবস্থানের পরিবর্তন হয়, অবস্থার সংশোধন হয় না। যে ক্ষমতায় আসীন, এবং যে ক্ষমতায় আসীন নয়, এই দুই-এর মধ্যে ক্ষমতার তারতম্য হবেই — আর এর ফলেই বৈষম্য উৎপন্ন হয়। বৈষম্য নারী-পুরুষের মধ্যে হতে পারে, নারীর সঙ্গে নারীর হতে পারে। প্রাতিষ্ঠানিক পরিবারে যেমন শাশুড়ি

বউকে-নির্যাতন করে, বা পুলিশবাহিনীতে নারী যোগ দিলে সে-ও পুরুষতন্ত্রের শরিক হয়, সে-ও একই প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা বলবৎ রাখে। অন্তর্ভুক্তি প্রকল্পের এই ভেতর থেকে ভাঙার কর্মসূচিতে উত্তর-আধুনিকরা উৎসাহী নয়। তাঁরা নারীমুক্তির সংগ্রামকে একটি একদেশীয় প্রতিবাদ রূপে দেখেন না। তাঁদের জেহাদ অনন্য হলেও তাঁদের লক্ষ্য সীমিত নয়—একটা গোটা তন্ত্রকে তাঁরা পাল্টে দিতে চান—তাঁদের সাফল্যের মধ্যে দিয়ে সব শ্রেণীর অবদমিত মানুষ মুক্তির একটা নতুন ভাষা পাবেন, এক সম্প্রদায় আর এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে আদান-প্রদানের নতুন মাত্রা পাবেন—খুলে যাবে চিন্তার এক নতুন দিগন্ত—এই তাঁদের আশা।

আমাদের অভ্যস্ত চিন্তাবিধি এ পর্যন্ত আমাদের দিয়েছে নিটোল কতকগুলি তত্ত্ব, দিয়েছে স্বচ্ছ ও স্পষ্ট ভাবনা প্রতিষ্ঠার মূল মন্ত্র, শিখিয়েছে অবিন্যস্ত ভাবনাকে কী করে সাজিয়ে নিয়মানুগ বীক্ষণ পেতে পারি। নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের প্রতিক্রিয়ার মূলে আছে আধুনিক চিন্তাবিধি।

প্রায়োগিক ক্ষেত্রে আধুনিকদের অবদান কম নয়। প্রতিটি নৈতিক বিধান সর্বজনীন করার প্রয়োজনীয়তার ওপর তাঁরা জোর দিলেন, সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য নৈতিক বিধির আবশ্যিকতাও তাঁরা অনুধাবন করলেন। সব মিলিয়ে তাত্ত্বিক পটভূমি হয়ে উঠল এক দক্ষ নিয়ামক কাঠামো। চিন্তা ও কর্মের স্বচ্ছতা মুগ্ধ করলেও উত্তর-আধুনিকরা মনে করেন রিজনের সার্বভৌমত্বের মধ্যে ফাঁকি লুকিয়ে আছে, তা ধরিয়ে না দেওয়া অবধি বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ তথা প্রাকৃতিক পরিবেশের অবমূল্যায়ন হতেই থাকে।

উত্তর-আধুনিক নারীবাদীরা এমন একটি তাত্ত্বিক কাঠামো খুঁজছেন যা দিয়ে বৈচিত্র্যের বিশিষ্টতা বজায় থাকে। প্রতিতুলনায় বলা যায় আধুনিকরা চাইছেন বৈচিত্র্যের মধ্যে অনুগত সামান্য-ধর্মকে খুঁজে তাকেই ঐক্যসূত্ররূপে তুলে ধরতে। উত্তর-আধুনিকরা মনে করেন জগতে কোনো বিন্যাস আছে কি না আমাদের জানা নেই, বিন্যাস যা দেখি তা প্রক্ষেপণের ফল। এই কাজের জন্য রিজনকেই মনে হয়েছে সবচেয়ে উপযুক্ত হাতিয়ার। নিঃসন্দেহে রিজন ঐক্যসূত্র জুগিয়েছে, গড়ে তুলেছে অত্যন্ত কার্যকরী ধরনের লোক-সংগ্রহ। সুকৌশলে রিজন তত্ত্ব এবং প্রায়োগিক ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করে গেল এতদিন। রিজন-এর পরিচয় দেওয়া হচ্ছে জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ-নিরপেক্ষ, অনুষঙ্গহীন চিন্তনের নিয়ামক বিধি রূপে। বিধিগুলি যেন চিন্তার পূর্ব-

Scanned with

শর্ত। এদের সাহায্যে যেহেতু আমরা চিন্তা করি, বিচার করি, এদের স্বতন্ত্র বিচার তাই আর সম্ভব নয়। এমন কিছু স্বতঃসিদ্ধ স্বীকার্য মানলে স্বচ্ছতা অর্জনের সুবিধে হয় বা চিন্তার বিন্যাসেও সুবিধে হয়।

'লজ অব থট' অনন্য নয়। ধ্রুপদী ল'-এর বিকল্প ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। রিজনের যেমন বিকল্প হতে পারে তেমনি উত্তর-আধুনিকরা দেখিয়েছেন যে রিজন দিয়ে আমরা সবসময় সবকিছু বুঝি তাও নয়। রিজনের আধিপত্যের দরুন—নারীর উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতাকে বোধের উৎস হিসেবে অস্বীকার করা হয়—অন্তত রিজন দ্বারা ব্যাখ্যাত না হওয়া অবধি তা বোধ্য বলে গ্রাহ্য নয়। পুরুষতন্ত্রের একটা প্রবণতা আছে চিন্তনকে একরৈখিক করার এবং কোনো আত্যন্তিক অনেকান্ত অবস্থান স্বীকার না করার। ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করায় এই তন্ত্র সাহায্য করে।

উত্তর-আধুনিক নারীবাদীরা প্রথম নারী অবদমনের দার্শনিক পটভূমির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। ইতিপূর্বে দর্শনের বিরুদ্ধে জেহাদ যে ঘোষিত হয়নি তা নয়। সে আপত্তির রূপ ছিল অন্য, অভিযোগ করা হয়েছিল যে নারী-জীবনের সমস্যা, অভিজ্ঞতা, দর্শনচর্চায় যথেষ্ট গুরুত্ব পায়নি। দাবি করা হয়েছিল দর্শনের পরিধি বিস্তারের, যাতে নতুন নতুন সমস্যা দার্শনিক প্রেক্ষিতে বিচারযোগ্য হয়। সম্পূর্ণ নিষ্ফল হননি এই নারীবাদীরা। ভ্রূণ-হত্যার সমস্যা থেকে আরম্ভ করে নানাবিধ সমস্যা ধ্রুপদী দর্শনের পরিধির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। দর্শন তখন অভিযুক্ত ছিল 'এরর অব অমিশন' বা সমস্যা অস্বীকারের দোষে, ভ্রান্ত দর্শনের দোষে নয়। উত্তর-আধুনিকরা অভিযোগ করলেন দর্শনের পরিধি বিস্তারে রোগের উপশম হবে না কারণ দর্শনের চিন্তা-কাঠামোর মধ্যে দোষ আছে। দর্শনের দোষ 'এরর অব অমিশন' নয়, তা হল 'এরর অব কমিশন'-এর। অর্থাৎ দর্শনের নিষ্ক্রিয়তাটা দোষের কারণ নয়, দর্শনের দোষ তার সক্রিয় অবদমনের প্রক্রিয়ায়। নারী আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক আন্দোলনরূপে। অবদমনের রীতি যে গোড়ায় দর্শন-ভাবনা পুষ্ট তা ভাবা হয়নি। অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হলেও যে নারীমুক্তি ঘটে না এই পাঠ আমরা ইতিহাস থেকে পেয়েছি।

সবার আগে চাই 'লজ অব থট'-এর পরিবর্তন, ধারণার স্তরে বিপ্লব। শিলা রোবথম কট্টর বামপন্থী হয়েও নিছক অর্থনৈতিক বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে নারীমুক্তি আসবে বলে মনে করেন না। অন্তত এখনও পর্যন্ত পৃথিবীর কম্যুনিস্ট বিপ্লবগুলি এই

স্বপ্ন পূরণ করেনি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অনেক ধরনের ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে সংগ্রাম সফলও হয়েছে। তবুও সে সব দেশে পিতৃতন্ত্রের অবসান ঘটেনি। পিতৃতন্ত্রের পীড়নের সঙ্গে ঔপনিবেশিকতার পীড়নের সাদৃশ্য আছে। পিতৃতন্ত্রে নারীকে উপনিবেশের মতো দমন করা হয়। নারী যেদিন পিতৃতন্ত্রের কবল থেকে মুক্ত হবে সেদিন বলা যাবে পৃথিবীর বুক থেকে ঔপনিবেশিকতা নির্মূল হয়েছে। এই কারণেই হয়তো রোবথম মন্তব্য করেন 'ওমেন আর দ্য লাস্ট কলোনি'। শিলা রোবথম কোনো অর্থে উত্তর-আধুনিক নন, তবু একটা ব্যাপারে উত্তর-আধুনিকদের সঙ্গে তাঁর মিল আছে; তিনিও মনে করেন যে নারীর সমস্যাকে অপরাপর সমস্যার অঙ্গ হিসেবে দেখা উচিত নয়—লিঙ্গ-বৈষম্যের অনন্যতা স্বীকার করতেই হবে।

উত্তর-আধুনিকদের সঙ্গে রোবথমের যেখানে মতের অমিল হওয়ার কথা তা হল যুক্তি ও লজিকের ভূমিকা নিয়ে। যদিও তিনি লজিকের কাঠামো নিয়ে প্রশ্ন তোলেননি তবু বোঝা যায় যে রোবথম মার্কসীয় ডায়ালেকটিক্স-এর কাঠামোর মধ্যেই তাঁর নারীবাদী তত্ত্বকে সাজাতে চান। অপরপক্ষে উত্তর-আধুনিক নারীবাদীদের কাছে শুধু অ্যারিস্টটল-এর লজিক নয়, ডায়ালেকটিকাল লজিকও বর্জনীয়। এই লজিকেও ওঁরা বেষ্টনী বা ক্লোজার দেখতে পান।

ক্ষেত্রবিশেষে ডায়ালেকটিশিয়ানরা ল অব কন্ট্রাডিকশন বা বিরোধাত্মক বিধির ভিন্ন ব্যাখ্যা দিলেও সর্বক্ষেত্রে তাঁরা অ্যারিস্টটল-এর চিন্তনবিধি বর্জন করেননি। এ কথাটা বিশেষ করে মার্কসীয় ডায়ালেকটিক্স-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। প্রসঙ্গত বলা যায় হেগেলের ডায়ালেকটিক্স-এর সঙ্গে মার্কসের ডায়ালেকটিক্স-এর পার্থক্য স্বীকার করে নিয়েও উত্তর-আধুনিক নারীবাদীরা উভয় প্রকার ডায়ালেকটিক্স-এর বিরোধী।

মার্কসের 'ডায়ালেকটিকাল মেটিরিয়ালিজমে' কীভাবে 'ল অব কন্ট্রাডিকশন' বা বিরোধাত্মক বিধি কাজ করে তার একটা ব্যাখ্যা আমরা বিখ্যাত মার্কসবাদী তাত্ত্বিক প্লেখানভের লেখাতে পাই। তিনি বলেন, 'ডায়ালেকটিকস ডাজ নট সাপ্রেস ফর্মাল লজিক, বাট মিয়ারলি ডিপ্রাইভস দা লজ অব ফর্মাল লজিক অব দা অ্যাবসোলিউট ভ্যালু হুইচ মেটাফিসিশিয়ান্স হ্যাভ অ্যাসক্রাইবড টু দেম।'[২]

অ্যারিস্টটল মনে করেন চিন্তনের বিধিগুলি জগতের পদার্থ বিভাগের প্রতিরূপ। জগতের পদার্থগুলি যেমন দ্রব্য, গুণ, কর্ম, ইত্যাদি স্পষ্ট ও পৃথক কোটিতে বিভক্ত

Scanned with

আমাদের ধারণাগুলিও তেমনি স্পষ্ট 'ক' এবং 'ক-নয়' কোটিতে বিভক্ত। ফলে অ্যারিস্টটল মনে করতেন যে চিন্তন বিধিগুলি যেন জগতের ন্যাচরাল কাইন্ড বা প্রাকৃতিক জাতিকেই উদ্দেশ্য করে। প্লেখানভ বলেন যে জগৎ ও সমাজে যখন পরিবর্তনের প্রক্রিয়া চলে তখন পুরনো স্বরূপটাও থাকে, পরিবর্তিত রূপের আভাসও থাকে, যার ফলে একই ক্ষণে আমরা যুগপৎ 'ক' এবং 'ক-নয়' অবস্থা দুটি পাই। ডায়ালেকটিশিয়ানদের মতে চিন্তনের বিরোধাত্মক বিধি এইরূপ স্থলগুলিতে কার্যকরী হয় না। তবে 'ডায়ালেকটিকস'-এর বিচারে এমন ভাবনাও নিশ্চয় অবান্তর নয় যে অবিরত পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় বর্তমান স্বরূপমাত্রেই পরিবর্তমান অন্য রূপের লক্ষণও বিদ্যমান থাকে।

অনেকে তাই মনে করেন উত্তর-আধুনিকদের 'এনলাইটেনমেন্ট রিজন'-এর বিরুদ্ধে যে আপত্তি তা 'ডায়ালেকটিকাল লজিককে' স্পর্শ করা উচিত নয়—অথচ করে। কেন করে তা বুঝতে গেলে আর একবার প্লেখানভের ব্যাখ্যায় ফিরে যাওয়া দরকার। তিনি বলেন, বস্তুর যখন পরিবর্তন হয় তখন তার সম্বন্ধে 'ক' এবং 'ক-নয়' উভয় পরিচয় যুগপৎ যথার্থ কিন্তু অন্য সময় যখন জিজ্ঞেস করি বস্তুটির একটি বিশেষ ধর্ম আছে কি না তখন দ্ব্যর্থহীনভাবে 'হ্যাঁ' বা 'না' বলতে হয়। গতিশীলতা ব্যাখ্যার জন্য ডায়ালেকটিকাল লজিকে 'ক' এবং 'ক-নয়' এর যুগপৎ অবস্থান মানতে হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে বিরোধের উপস্থিতি ও তার চালিকা শক্তি মেনে যদি অপরাপর ক্ষেত্রে বিরোধ অনুপস্থিত বলা হয় বা বিরোধের অনুপস্থিতি কাম্য মনে করা হয় তবে সেই সব স্থলে 'ক' এবং 'ক নয়'-এর যুগপৎ অবস্থান মানা যায় না। যে সব স্থলে 'ক' এবং 'ক-নয়'-এর যুগপৎ অবস্থান মানা যায় না সেখানে ডিনাইড ডিপেন্ডেন্স (denied dependence) থাকতে বাধ্য। এটি একটি জটিল সমস্যা এবং প্লেখানভ যেভাবে মার্কসীয় ডায়ালেকটিক্সের ব্যাখ্যা দিয়েছেন মার্কস ও অপরাপর মার্ক্সবাদীরা তা মানবেন কিনা বলা কঠিন। এঁদের মধ্যে তর্কটা ওঠে গতিশীলতার ব্যাপ্তি নিয়ে।

উত্তর-আধুনিকদের বিরুদ্ধে ও ডায়ালেকটিক্স-এর সপক্ষে কেউ বলতে পারেন যে ডায়ালেকটিকাল লজিক আর অ্যারিস্টটলের লজিকের বিতর্কের জায়গা তো শুধু ল অব কন্ট্রাডিকশনকে ঘিরে নয়—আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যও আছে। ডায়ালেকটিকাল মেটিরিয়ালিজম-এর মতানুসারে ডায়ালেকটিক্সে লিপ্ত থাকার অর্থ

ধারণা বা কনসেপ্ট গঠনের ক্ষেত্রে আন্তঃসম্পর্কগুলির দিকে নজর দেওয়া। কোনো ধারণা যে অভিজ্ঞতা-অনপেক্ষ নয় এ কথা উত্তর-আধুনিকরাও বলবেন। ধারণার অনুষঙ্গ থেকে ধারণার অর্থ বোঝা যায় তাও তাঁরা বলবেন।

একটি ধারণার অনুষঙ্গ নিরূপণ করতে গিয়ে বিজ্ঞান, ইতিহাস, আর্থ-সামাজিক অবস্থা সবই আসে। এমনকি মার্কসীয় ডায়ালেকটিক্স-এ ক্ষমতার অনুষঙ্গও বিচার করা হয়। এত সত্ত্বেও লিঙ্গ-রাজনীতির আবিশ্ব ব্যাপ্তি এবং তার প্রচ্ছন্ন ক্ষমতার লীলা কেমন করে যেন তাঁদের অনুষঙ্গ-আলোচনার সূচি থেকে বাদ পড়ে যায়। এই বাদ পড়ে যাওয়াটার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে রোবথম মার্কসকে খোলা চিঠি লিখে অভিযোগ করেন যে 'কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো'-তে বিপ্লবে মেয়েদের অবদানের উল্লেখ নেই। উনি লুইজ অটো-র সঙ্গে একমত যে 'ওমেন উইল ফাইন্ড দেমসেলভস ফরগটেন, ইফ দে ফরগেট টু থিঙ্ক অব দেমসেলভস।'[৩] বোঝা যায় যে রোবথম মনে করছেন যে মার্কসের অনবধানবশত এই অনুল্লেখ। অতএব এটি 'এরর অব অমিশন'। উত্তর-আধুনিকরা বলবেন এটা চিন্তার কাঠামোর সীমাবদ্ধতা, ফলে এটা 'এরর অব কমিশন'। এই কাঠামোতে 'ক'-এর কথা যখন ভাবা হয় তখন 'ক-নয়' বিষয়ে বিস্মরণ ঘটে।

দ্বিমাত্রিক লজিকের সমালোচনা করার পরে উত্তর-আধুনিক নারীবাদীরা যেভাবে দ্বিমাত্রিকতার বিকল্প খুঁজছেন লিবারাল নারীবাদীরা সেভাবে দ্বিমাত্রিকতার বিকল্প অন্বেষণ করেন না। তাঁরা উত্তর-আধুনিকদের আপত্তির জায়গাটা অনুধাবন করলেও সমাধানটি অন্যপথে খুঁজছেন—দ্বিমাত্রিকতা বিসর্জন দিয়ে নয়। তত্ত্বের পরিধির মধ্যে বৈচিত্র্যকে তাঁরা স্থান দেবার চেষ্টা করছেন।

পরের অধ্যায়ে ম্যাকির মতটির পরিচয় দিতে গিয়ে এই বৈচিত্র্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। অনেকগুলি মতাদর্শ থেকে ম্যাকি যেন পাঠ নিচ্ছেন ; তার পরে যে মত তিনি পেশ করছেন তাকে তিনি বলছেন 'নিয়ম-অধিকার-কর্তব্য-প্রবণতা সম্বলিত আত্মকেন্দ্রিকতা'।

ম্যাকির অপর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি নৈতিকতা ও রাজনৈতিকতার বিভাজনটিকে খুবই অস্পষ্ট করে দেন। অনেক সময় মনে হয় ম্যাকি রিচার্ড রোর্টির কাছাকাছি চলে আসছেন, আবার কখনও মনে হয় উত্তর-আধুনিকদের সঙ্গে তাঁর মিল

Scanned with

খুঁজে পাই। তবে তিনি কখনই যুক্তি দিয়ে যুক্তির আবেষ্টনকে ভাঙতে চান না। তাঁর মতে যুক্তির নির্দেশে চলা আবশ্যিক হলেও যুক্তিই একমাত্র নির্দেশক হতে পারে না। নৈতিক বিচারে যুক্তি ভিন্ন আরো অনেক মাত্রা থাকে ; স্বার্থ চিন্তা থাকে, উপযোগিতার চিন্তা থাকে, ইত্যাদি।

লিবারালদের নীতি-দর্শনের একটা রূপ ইম্যানুয়েল কান্টের লেখায় পাওয়া যায়। কান্টের নৈতিক অবস্থানের সঙ্গে সকলেই পরিচিত। লিবারাল নীতি-দর্শনের দ্বিতীয় প্রবাহটি চলে আসছে টমাস হব্‌স (Thomas Hobbes 1588-1679) ও জন লক (John Locke 1632-1704) থেকে। ম্যাকি হলেন এই দ্বিতীয় প্রবাহের সমর্থক। এই দুটি প্রবাহের মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও অনেক সাদৃশ্যও আছে। উভয় অবস্থানেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। ম্যাকির অবস্থানটি স্পষ্ট করে অনুধাবন করতে গেলে তাঁর বই 'এথিক্স: ইনভেন্টিং রাইট অ্যান্ড রং' *(Ethics: Inventing Right and Wrong 1977)*-এর সঙ্গে তাঁর প্রবন্ধাবলীও দেখা প্রয়োজন।

ম্যাকি উপযোগিতার আলোচনা করতে গিয়ে বা রাজনীতির প্রসঙ্গ অবতারণার সময় কখনই লিঙ্গ-রাজনীতির কথা বলেননি। লিবারাল নারীবাদীরা যেহেতু অন্তর্ভুক্তির প্রকল্পে বিশ্বাস করেন তাই নীতি-দর্শনের ক্ষেত্রে তাঁদের কান্টের তত্ত্ব-কাঠামোর অনুরূপ বা ম্যাকির তত্ত্ব-কাঠামোর অনুরূপ কোনো একটি তত্ত্ব-কাঠামো নির্বাচন করতে হবে। ম্যাকি যেভাবে ন্যায় ও অন্যায় সৃজনের কথা বলছেন তার সঙ্গে লিঙ্গ-প্রেক্ষিতের মাত্রা যোগ করলে নারীবাদীরাও একইভাবে নৈতিক অনুষঙ্গে ন্যায় ও অন্যায় সৃজনের কথা ভাবতে পারেন। লিবারাল নারীবাদীরা কান্টকে মডেল রূপে না নিয়ে যদি ম্যাকিকে মডেল করেন তবে তাঁরা কিছু অংশে র‍্যাডিকাল নারীবাদীদের সমালোচনার হাত থেকে রক্ষা পেতে পারেন।

এর পরের অধ্যায়ে ম্যাকির মতটি বিশদভাবে আলোচনা করা হচ্ছে যাতে তৎপরবর্তী অধ্যায়ের লিবারাল ও র‍্যাডিকাল নৈতিকতা ও নারীবাদের আলোচনার প্রেক্ষাপটটি ভালভাবে বোঝা যায়।

সূত্র-নির্দেশ

১. Jacques Derrida "Hospitality, Justice and Responsibility: A Dialogue with Jacques Derrida in Questioning Ethics", *Contemporary Debates in Philosophy*, ed. Richard Kearney and Mark Dooley, Routledge, London, 1999, p. 78.

২. G. Plekhanov, *Fundamental Problems of Marxism*, ed. D. Ryazanov, Eagle Publishers, Calcutta, Indian Edition, 1944, p. 114.

৩. Sheila Rowbotham, "Dear Mr. Marx, A Letter from a Socialist Feminist" in *The Socialist Register 1998*, Merlin Press, U.K. and K.P. Bagchi and Company, Calcutta, p. 9.

Scanned with

পঞ্চম অধ্যায়

ন্যায় ও অন্যায় সৃজন : ম্যাকির পদ্ধতি

ম্যাকি ১৯৭৭ সালে তাঁর 'এথিক্স' বইটি লেখেন যার সম্পূর্ণ শিরোনাম 'এথিক্স : ইনভেন্টিং রাইট অ্যান্ড রং'[১]। শিরোনাম থেকেই বোঝা যায় নৈতিক মূল্য, যেমন, 'রাইট' বা ন্যায়, এবং 'রং' বা অন্যায়ের, অনপেক্ষ বা আনকন্ডিশনাল অবস্থান ম্যাকি স্বীকার করেন না—তিনি মনে করেন না, নৈতিক মূল্য বা মরাল ভ্যালুগুলি নিত্য, ধ্রুব ও নিঃশর্ত। তাঁর মতে নৈতিক অনুষঙ্গে শুভ-অশুভ, ন্যায়-অন্যায়, এবং দায়বদ্ধতার কালোত্তীর্ণ, দেশোত্তীর্ণ, শাশ্বত অবস্থান নেই। তাঁর ভাষায় 'There are no objective values'[২]। উনি জানেন যে এই কথাটা প্রতিষ্ঠা করা খুবই কঠিন কারণ অবজেক্টিভ মরাল ভ্যালু প্রত্যয়টি পাশ্চাত্য মতবাদে কোনো না কোনোভাবে স্বীকৃত। ইংরেজি কথ্যভাষাতেও 'মরাল ভ্যালু' বা 'নৈতিক মূল্য' উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি সৎ, অনপেক্ষ মূল্যের অস্তিত্ব ব্যঞ্জিত হয়। এতদসত্ত্বেও ম্যাকি অনপেক্ষ মূল্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করছেন।

ম্যাকি মনে করেন, নৈতিক অনুষঙ্গে যেখানেই অনপেক্ষতার (unconditionality) কথা বলা হয় সেখানেই এই মতের সপক্ষে যুক্তির বিস্তার বিচার করতে গিয়ে দেখা যাবে, আপাত-অনপেক্ষ যুক্তির মধ্যেও কোথাও না কোথাও প্রচ্ছন্নভাবে একটা সাপেক্ষতা বা কন্ডিশন লুকিয়ে আছে। তাই যদি হয়, তাহলে কি বলতে হয় 'ন্যায় এবং অন্যায়ের মূল্যায়ন মানুষের নিজের সৃষ্টি'? কোন কাজটাকে বলব ন্যায় আর কোনটাকে বলব অন্যায় তার যদি নিরপেক্ষ অবজেক্টিভ মাপকাঠি না থাকে তাহলে অবস্থাটা কী দাঁড়ায়? শাশ্বত মূল্যের অনুপস্থিতিতে আমরা প্রত্যেকে যে যার সুবিধা ও প্রয়োজন অনুসারে ন্যায়-অন্যায়ের একটা মান তৈরি করে সেটাই কি প্রয়োগ করে থাকি, ও, তা করা কি উচিত? আমরা জানি, অপরিবর্তনীয় মূল্য স্বীকার করার বিপরীত অবস্থা হল চরম আপেক্ষিকতা (absolute relativism) যেখানে নৈতিকতা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার—সেখানে ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ ও দায়বদ্ধতা সবই

নিরূপিত হয় ব্যক্তিগত বিচারের নিরিখে। কিন্তু এই দুই বিপরীত কোটির—অর্থাৎ, অনপেক্ষ সৎ মূল্য ও ব্যক্তিগত চরম আপেক্ষিক মূল্যের—মাঝামাঝি একটা তৃতীয় অবস্থানও থাকতে পারে। এমন ভাবার কোনো কারণ নেই যে আমাদের হয় নৈতিক মূল্যের ধ্রুবত্ব স্বীকার করতে হবে, নচেৎ চরম আপেক্ষিকতা বরণ করতে হবে। এই দুই-এর মাঝামাঝি একটা তৃতীয় অবস্থানের কথা ভাবা যেতে পারে—চিরস্থায়ী মূল্যমান ও ক্ষণস্থায়ী মূল্যমানের মাঝামাঝি একটা অবস্থান যা অনিত্য হয়েও স্থায়ী কিন্তু চিরস্থায়ী নয়। ম্যাকি এই মাঝামাঝি অবস্থানে তাঁর সৃজিত ন্যায় ও অন্যায়কে স্থান দিতে চাইছেন ও সেই উদ্দেশ্যে যুক্তি বিস্তার করছেন।

ম্যাকির মতে মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে নৈতিক মূল্য তৈরি করে। এই সৃজিত মূল্যের মধ্যে যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা থাকে। একটা বিশেষ সময়ে দাঁড়িয়ে মানুষ তার বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, প্রয়োজন, নৈতিক প্রবৃত্তি সব কিছুর উপর ভর করে স্থির করে কোনটা ন্যায় আর কোনটা অন্যায়। এই বিচারের উদ্দেশ্য নৈতিকতার অচলায়তন সৃষ্টি করা নয়। পরিস্থিতির বদলের সঙ্গে সঙ্গে মূল্যায়নের বদল হয়; তবে বদলগুলি সবসময় সুচিন্তিত—তুঘলকি খামখেয়ালিপনা বা ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রতিফলন নয়।

আমাদের যাবতীয় নৈতিক চিন্তা-ভাবনা যেন উঠে এসেছে একটা জটিল অবস্থাকে সামাল দিতে গিয়ে। সেই পরিস্থিতি আর তার সঙ্গে সম্পৃক্ত মানুষের সমস্যাটিকে ম্যাকি আমাদের চিনিয়ে দিতে চান। মানুষমাত্রই নিজেকে ভালবাসে, আর কম-বেশি অপরকে ভালবাসে। অপরকে ভালবাসার একটা সীমা সবসময় থাকে, কখনোই নির্বিচারে সকলের প্রতি সমদর্শী, সমব্যথী, সহমর্মী হওয়া যায় না—আর এই না পারার সীমাবদ্ধতার ফলেই যত সমস্যা। ন্যায়-অন্যায় সৃজনের মধ্যে দিয়ে এথিক্স বা নীতিশাস্ত্র এই সীমাবদ্ধতা থেকে উদ্ভূত সমস্যার একটা সমাধান পেতে পারে। কীভাবে এথিক্স এই সমস্যার মোকাবিলা করতে পারে তার নির্দিষ্ট তত্ত্ব ম্যাকি আমাদের দেননি, সমাধানের একটা প্রকল্প দিয়েছেন মাত্র। এই প্রকল্পের গোছানো বিবরণ তাঁর লেখা থেকে পাওয়া যায় না, বিভিন্ন জায়গা থেকে ছড়ানো-ছিটানো মন্তব্য জোড়া লাগিয়ে বুঝে নিতে হয় তাঁর মূল প্রতিপাদ্য।

ম্যাকি মনে করেন, একটি কাজ নৈতিক বিচারে ভাল তখনই হবে যখন তা কোনো স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। তাঁর ভাষায় To be good, something must be related to something like interest[৩] (কার স্বার্থ বা ইন্টারেস্ট তা ম্যাকি নির্দিষ্ট করেননি,

Scanned with

তাঁর নিজের হতে পারে, পরের হতে পারে, দেশের হতে পারে। ম্যাকি প্রতিটি স্বার্থকে একজাতীয় উদ্দেশ্যের গণ্ডির মধ্যে এনে ফেলেছেন। সব স্বার্থই যেন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত হয়ে আছে 'গুড লাইফ' বা ভাল জীবনযাপনের উদ্দেশ্যের সঙ্গে। 'গুড লাইফ' বলতে ঠিক কী বোঝায় এককথায় বলা কঠিন। ম্যাকি বার বার এই প্রসঙ্গে অ্যারিস্টটলের কথা উল্লেখ করলেও হুবহু তাঁর মতো করে 'গুড লাইফের' ধারণাটি ম্যাকি ব্যবহার করেননি। অ্যারিস্টটল 'গুড লাইফ' বলতে (eudaemonia) কল্যাণকর জীবনের আদর্শের কথা বলেছেন।

কোনো এককালীন প্রকল্পের মধ্যে একটা গোটা 'গুড লাইফ'-কে সাজিয়ে ফেলা যায় বলে ম্যাকি মনে করেননি। তাঁর মতে মানুষের চিন্তাধারার বদল হয়, সেই সঙ্গে বদলে যায় তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। প্রত্যেকের জীবনে থাকে একাধিক আদর্শ। নিজের জীবনের সামগ্রিক রূপরেখা কেমন হবে অনুমান করে নিয়ে আদর্শের অগ্রিম নির্বাচন করা যায় না। আমরা ভাবতে ভাবতে চলি, চলতে চলতে ভাবি। এইভাবে আমরা ক্রমান্বয়ে আমাদের জীবনের পুরুষার্থ নির্বাচন করে চলি। আমরা যে কেবল নৈতিক আদর্শ সৃজন করে থাকি তা নয়; অন্যান্য নানা নিয়ামক আদর্শ গড়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক আদর্শও গড়ে তুলি।

আমাদের সব নৈতিক চিন্তাভাবনার কেন্দ্রে আছে 'গুড লাইফ'-এর ধারণা—এমন কথা ম্যাকি গ্রীক ঐতিহ্য থেকে পেয়েছেন। এজাতীয় কথা সক্রেটিস সমর্থন করেন, অ্যারিস্টটলও একই কথা বলেছেন। অ্যারিস্টটল অবশ্য মনে করেন যে ভাল জীবন একমাত্র নৈতিক জীবন-যাপনের মধ্যে দিয়ে চরিতার্থ হয় না। আরো ব্যাপক গণ্ডির মধ্যে জীবনকে ছড়িয়ে দেওয়ার আদর্শের কথা বলেছেন তিনি, যেখানে রাজনীতি জীবনযাপনের আদর্শ যোগাবে। অ্যারিস্টটলের মতে রাজনীতি হল 'আইদোস' ও 'দিকে' উভয়ের সমন্বয়। 'আইদোস' থাকার অর্থ 'মরাল সেন্স' বা নৈতিক বোধ থাকা। আর 'দিকে'-র অর্থ law এবং justice বা আইন ও সুবিচার। অ্যারিস্টটলের পূর্বে প্রোটাগোরাসও 'আইদোস' ও 'দিকে'-র কথা বলেছিলেন। ম্যাকি মনে করেন এই দুই হল পরস্পরের পরিপূরক 'both of these are essential and complementary parts of the devise of morality'[৪]—'আইদোস' আমাদের নৈতিক বোধ ও দায়বদ্ধতার পরিপোষক এবং 'দিকে'-র নীতি সংক্রান্ত আইন, রাজনৈতিক ও অন্যান্য নির্দেশাবলীর বা ফরমাল রুলের পরিপোষক। 'আইদোস' এবং 'দিকে'-র

সমান গুরুত্ব মেনে নেওয়ার ফলে দেখা যাচ্ছে আইনের অনুমোদন ও রাজনৈতিক অনুমোদন ব্যতিরেকে আমাদের জীবনে নীতি ও নৈতিকতার কোনো সংরক্ষিত স্থান থাকছে না।

মনে হতে পারে ম্যাকি যদি প্রোটাগোরাস আর অ্যারিস্টটলের কথা মূলত স্বীকার করেই থাকেন তাহলে নতুন আর কী কথা উনি বলছেন। মৌলিক পার্থক্য অবশ্যই আছে। এই দুই গ্রীক দার্শনিকের কেউই মনে করেননি যে নৈতিক অনুষঙ্গে ন্যায় ও অন্যায় হল মানুষে-মানুষে বোঝাপড়ার ফসল, তাঁরা বলেননি ন্যায়-অন্যায় স্থাপিত হয় এক বা একাধিক চুক্তির মধ্যে দিয়ে। 'আইদোস' আর 'দিকে'—প্রোটাগোরাসের মতে—ঈশ্বরের প্রসাদ। মানুষকে নৈতিক জীবনযাপনে সাহায্য করার জন্য ঈশ্বর মানুষকে 'আইদোস' আর 'দিকে' দিয়েছেন।

ঐশী ক্ষমতা স্বীকার না করেও ম্যাকি বলছেন দীর্ঘ বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে এবং নানা সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাতের মোকাবিলা করতে গিয়ে মানুষের মনে কতকগুলি 'প্রি-মরাল' বা প্রাক্-নৈতিক এবং 'মরাল' বা 'নৈতিক' ডিসপোসিশন বা প্রবণতা গড়ে উঠেছে। এই ডিসপোসিশনগুলি 'আইদোসের' সঙ্গে তুলনীয়। এর পাশাপাশি 'দিকে' বা আইন তৈরি হয় চুক্তির মধ্যে দিয়ে। ম্যাকি যখন চুক্তির কথা বলেন তখন তিনি অনেকটা হব্‌সপন্থী। ম্যাকি মনে করেন হব্‌সের (Thomas Hobbes 1588-1679) এত বছর পরেও এমন কোনো পরিবর্তন হয়নি, বা হতে পারে না, যার ফলে নৈতিক অনুষঙ্গে চুক্তির গুরুত্ব কমে যাবে। আমরা চিরকাল চুক্তি করব, চুক্তি রাখার চেষ্টা করব এবং ভরসা রাখব যে অপরেও তার চুক্তি রাখবে। ম্যাকি লিখছেন : nothing has altered or will alter the importance of being able to make and keep and rely on others' keeping agreements.[৫] তাই যদি হয়, তা হলে আর নতুন করে রাইট বা ন্যায় এবং রং বা অন্যায় বিষয়ে চুক্তির প্রয়োজন কোথায়? এ ব্যাপারে তো চুক্তি অনেককাল আগে হয়ে গেছে, হব্‌স, রুশো (Jean-Jacques Rousseau 1712-76) এঁরা সকলেই চুক্তির কথা বলেছেন।

ম্যাকি মনে করেন প্রয়োজনমতো সব চুক্তিই করা হয়ে গেছে মনে করার কোনো কারণ নেই। ইতিপূর্বে যে সব চুক্তি হয়েছে তার আংশিক পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে। গত পঞ্চাশ থেকে একশ বছরের মধ্যে আমাদের দেশে ও বিদেশে যে পরিবর্তনের জোয়ার এসেছে তার ঢেউ সামলাতে হলে নৈতিক চুক্তির প্রাচীন ধ্যান-ধারণার বদল করতে হবে। হব্‌স বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনার কথা ভাবেননি, যুদ্ধ বলতে

Scanned with

উনি প্রধানত গৃহযুদ্ধের কথাই ভেবেছিলেন। আগে যত নিশ্চিন্তে বলা যেত 'কাজ কি খেয়ে তোফা আছি। আমায় কেউ না খেলেই বাঁচি' এখন আর তত নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আবিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতির যে অনুপ্রবেশ এবং আগ্রাসন আরম্ভ হয়েছে তাতে নতুন করে ন্যায়-অন্যায়, স্বার্থ-পরার্থ-র পর্যালোচনা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আর তার সঙ্গে প্রয়োজন হয়েছে নতুন চুক্তির।

পূর্বেই বলেছি, ম্যাকির মতে মানুষের সব সমস্যার মূলে রয়েছে মানুষের পরার্থ ভাবনার সীমাবদ্ধতা। তা বলে তিনি কিন্তু হব্‌সের মতো মনে করেন না মানুষ স্বরূপত কদর্য, স্বার্থপর ও বর্বর এবং যৌথ জীবনযাপনে অসমর্থ আর তাই কড়া শাসন ছাড়া তাদের গোষ্ঠীবদ্ধ করে রাখা যাবে না। হব্‌স মনে করতেন মানুষ স্বার্থান্বেষী, সুযোগসন্ধানী, সুযোগ পেলেই অপরাধ করবে, কেবলমাত্র নানারকম আইন করে পুলিশি শাসনের মধ্যে দিয়ে মানুষকে সমাজবদ্ধ করে রাখা যেতে পারে। ম্যাকি অবশ্য মনে করেন গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের সুবিধের কথা আমরা সকলেই জানি এবং তার প্রয়োজন বোধ করি। মানুষ বোঝে যে সে দ্বীপের মতো বাস করতে পারবে না। অনেক মনুষ্যেতর জীবও গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন যাপন করে। কয়েকটা ব্যাপারে অন্যান্য গোষ্ঠীবদ্ধ জীবের সঙ্গে মানুষের সাদৃশ্য আছে। ম্যাকি মনে করেন দীর্ঘ বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে বিভিন্ন প্রজাতি গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের জৈবিক প্রয়োজনে কিছু কিছু mutation বা রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে যায়। এই রূপান্তর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিবর্তনে অগ্রসর কোনো কোনো প্রজাতি ও মানুষের মধ্যে গড়ে উঠেছে কয়েকটি 'biological disposition' বা জৈবিক প্রবণতা; যার মধ্যে রয়েছে বেশ কিছু 'প্রি-মরাল' বা প্রাক্-নৈতিক প্রবণতা। প্রাক্-নৈতিক বলতে সেই অবস্থার কথা বলা হয়েছে যেখানে মনন ও বচন অনুপস্থিত।

ম্যাকির কাছে 'প্রি-মরাল' হল 'প্রি-কন্‌সেপচুয়াল' বা সুসংহত ধারণা বিবর্জিত অবস্থা। এই প্রাক্-নৈতিক প্রবণতার মধ্যে, ওঁর মতে, রয়েছে (১) শিশু এবং নিকট-আত্মীয়ের যত্ন নেওয়ার প্রবণতা। (২) একটা ছোট গোষ্ঠীর সঙ্গ উপভোগ করার প্রবণতা। (৩) পরস্পরের প্রতি উদার মনোভাব পোষণ করার প্রবণতা। (৪) কারোর কারোর প্রতি প্রয়োজনমতো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার প্রবণতা। (৫) কারো কারো প্রতি বৈরিতা প্রদর্শন করার প্রবণতা[৬]। মানুষের মধ্যে সচরাচর এই প্রবণতাগুলি থাকে আর এইটা আমরা জানি বলে পরস্পরের সঙ্গে মানিয়ে চলা সহজ হয়।

প্রি-মরাল প্রবণতার পাশাপাশি সব সমাজের কৃষ্টি ও সভ্যতা অনুসারে কিছু ট্র্যাডিশন গড়ে ওঠে। এগুলি মানুষকে ভালভাবে সুন্দরভাবে পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে সাহায্য করে। জৈবিক-বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সামাজিক বিবর্তনও হয়। উন্নত সমাজ আমরা তাকেই বলব যেখানে লোকে অপরের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে যৌথ জীবন-যাপন করে। মানুষের কৃষ্টিতে বা কালচার-প্রসূত কিছু প্রবণতা দেখা যায়। এগুলিকে ম্যাকি বলেছেন 'মরাল ডিস্‌পোসিশন্' বা নৈতিক-প্রবণতা। এই জাতীয় প্রবণতা গড়ে ওঠার পূর্বশর্ত হল ভাষা ব্যবহার করতে জানা। বিমূর্ত ধারণা ব্যতিরেকে এই প্রবণতা গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। কালচারাল ডিসপোসিশনের তালিকায় ম্যাকি রেখেছেন: (ক) সত্য কথা বলার প্রবণতা, (খ) সৎ হওয়ার প্রবণতা, (গ) সমদর্শনের প্রবণতা, (ঘ) বিচারী-হওয়ার প্রবণতা, (ঙ) ঔদ্ধত্যের অভাব, ইত্যাদি। বিভিন্ন সমাজে একই জাতীয় প্রবণতা গড়ে ওঠে তার কারণ এগুলিকে সচরাচর 'ভার্চু' বা নৈতিক সদগুণ বলে মনে করা হয়ে থাকে। আর তাই এগুলিকে শিক্ষার মাধ্যমে, অভ্যাসের মধ্যে দিয়ে, সচেষ্টভাবে প্রবণতার রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। চেষ্টা করা হয় যাতে সমাজের প্রত্যেকের নৈতিক-প্রবণতা অনুসারে কাজ করার মানসিকতা গড়ে ওঠে।

ন্যায়-অন্যায় সৃজনের ক্ষেত্রে ম্যাকি প্রাক্-নৈতিক ও নৈতিক প্রবণতাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি মনে করেন অনেক সমস্যার সমাধান এই প্রবণতার সাহায্যে করা যাবে। যেমন, 'এক্সটেনশন' অব মরালিটি বা নৈতিকতার বিস্তার প্রসঙ্গে কিছু কূট প্রশ্নের মোকাবিলা করতে গিয়ে এই প্রবণতাগুলির উল্লেখ করেছেন তিনি। ম্যাকি এক-ধরনের চুক্তিপন্থী মতবাদ (contractualism) স্বীকার করেন যেখানে সব চুক্তির মূলে রয়েছে কারোর না কারোর স্বার্থ। সে জায়গায় দাঁড়িয়ে ম্যাকিকে বোঝাতে হয় যারা চুক্তি করতে অসমর্থ, বা চুক্তি রাখতে অসমর্থ তাদের প্রতি আমাদের কোনো দায়বদ্ধতা আছে, কি নেই? অর্থাৎ চুক্তি যাদের মধ্যে হয় সেই কেন্দ্রীয় সদস্য ছাড়া কোনো মানুষ, বা আর কোনো জীব বা কোনো উদ্ভিদ বা প্রাণী চুক্তির প্রসাদ লাভ করতে পারে কি? যেমন বৃদ্ধ, শিশু, জড়বুদ্ধি, মনুষ্যেতর প্রাণী, উদ্ভিদ এদের প্রতি কি আমাদের কোনো নৈতিক কর্তব্য আছে? ম্যাকি মনে করেন, আছে। যদিও নৈতিক চুক্তি করার সময় এরা কেউ আমাদের ভাবনার কেন্দ্রস্থলে থাকে না তবু এদের দাবি-অধিকার-কল্যাণ আমরা অস্বীকার করতে পারি না। এই না পারার কারণ আমাদের

Scanned with

প্রাক্-নৈতিক সংস্কার। ম্যাকির কাছে ন্যায়-অন্যায় সৃজন কেবলই চুক্তির ব্যাপার নয়, কেবল সংস্কারও নয়, বা শুধু উপযোগিতার কথা মনে রেখে করা হয় না। অনেক কিছুর মিশ্রণে গড়ে ওঠে একটা ধারণার কাঠামো যার ভেতরে দাঁড়িয়ে আমরা ন্যায়-অন্যায় সৃষ্টি করি। ম্যাকি তাঁর নৈতিক মতবাদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন তাঁর মতবাদ এক ধরনের রুল-ইউটিলিটেরিয়ানিজম (rule-utilitarianism) বা নিয়ম-উপযোগবাদ। তবে এইটুকু বলা হলে তাঁর মতের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাবে না। তাঁর কথাতে তাঁর মতের পরিচয়: 'রুল-রাইট-ডিউটি-ডিসপোজিশন—ইউটিলিটেরিয়া-নিস্‌ম' (rule-right-duty-disposition—utilitarianism) অর্থাৎ নিয়ম-অধিকার-কর্তব্য-প্রবণতা উপযোগবাদ; অথবা নিজের মতের আর একভাবে পরিচয় দিচ্ছেন উনি: 'রুল-রাইট-ডিউটি-ডিসপোসিশন-ইগোইজম' (rule-right-duty-disposition-egoism) যার মানে দাঁড়ায় নিয়ম-অধিকার-কর্তব্য-প্রবণতা সম্বলিত আত্মকেন্দ্রিকতা।

এথিক্স-এর পরিচয় দিতে গিয়ে যখন একাধিক মাত্রার কথা বলা হয় যেমন, রাইট বা অধিকার, গুড বা শুভ, এবং ডিউটি বা কর্তব্য, তখন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় একটি মাত্রাকে মৌল মনে করা হয় এবং অপরাপর মাত্রাকে মনে করা হয় অনুসৃত। যেমন কান্ট মনে করেন এথিক্স মূলত 'ডিউটি' বা দায়বদ্ধতার বিচার, এবং শুভ ও অধিকার নিরূপিত হয় দায়বদ্ধতার নিরিখে। কান্ট বলেন, প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য জীবনধারণ করা, অতএব, জীবনধারণের অধিকার প্রত্যেকের আছে এবং জীবনধারণ করাটা নৈতিকরূপে শুভ। তেমনি সুখবাদী দার্শনিকরা মনে করেন সুখ অর্জন করাটা নৈতিক আদর্শ এবং তাই পরম শুভ। সুখলাভ পরম শুভ বলে সুখলাভের অধিকার প্রত্যেকের আছে এবং সুখ অর্জন করার চেষ্টা সকলের কর্তব্য। এথিক্সে সর্বদা যে একটি মাত্রাকে মৌল এবং অপরাপর মাত্রাকে অনুসৃত মনে করা হয় তা নয়; কখনো কখনো একাধিক মৌল মাত্রাও স্বীকার করা হয়েছে। যেমন করেছেন ডেভিড রস্, তাঁর বিখ্যাত 'রাইট অ্যান্ড দা গুড' (*Right and the Good*) গ্রন্থে। রসের মতে রাইট বা অধিকার এবং গুড বা শুভ উভয়ই এথিক্সের মৌল মাত্রা। কোনোটাই কোনোটা থেকে অনুসৃত নয়। ম্যাকি অবশ্য রাইট বা অধিকারকেই একমাত্র মৌলমাত্রা মনে করেছেন—আর সব মাত্রা, যেমন নৈতিক নিয়ম, উপযোগিতা সবই অর্থ খুঁজে পায় রাইট বা অধিকারের অর্থকে ঘিরে।

ডোয়ার্কিন (Ronald Dowerkin 1931–) রাজনীতির অনুষঙ্গে তিন ধরনের মতবাদের কথা বলেছেন—গোল-বেসড (goal-based) বা লক্ষ্যভিত্তিক রাজনীতি, রাইট-বেসড (right-based) বা অধিকারভিত্তিক রাজনীতি, ও ডিউটি-বেসড (duty-based) বা দায়িত্বভিত্তিক রাজনীতি। ম্যাকির মতে অনুরূপভাবে নৈতিক মতবাদও তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণী, অর্থাৎ লক্ষ্যভিত্তিক নীতিশাস্ত্রের, কথা বলেন উপযোগবাদীরা, দায়িত্বভিত্তিক নীতিশাস্ত্রের কথা বলেন জন রলস। অধিকারভিত্তিক নীতিশাস্ত্রকে অনেক সময় জাসটিস-বেসড (justice-based) বা সুবিচার-ভিত্তিক মরালিটিও বলা হয়।

ম্যাকিও অধিকারভিত্তিক নীতিশাস্ত্রের সমর্থক। ম্যাকির কাছে প্রাথমিক প্রশ্ন হল: আমি কী কী অধিকার দাবি করতে পারি? আর, এই দাবির ভিত্তিতে আমি কী কী অধিকার সমাজের কাছ থেকে আদায় করতে পারি? অধিকারের দাবি, বা ম্যাকির ভাষায় ক্লেম রাইটস (claim rights), মঞ্জুর হলে তবে পরবর্তী পর্যায়ে প্রশ্ন ওঠে আমার নৈতিক দায়িত্ব কতটুকু বা আমার নৈতিক লক্ষ্য কী? ম্যাকি কেন মনে করলেন অধিকারকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত তার বিস্তারিত আলোচনা তিনি তাঁর 'ক্যান দেয়ার বি এ রাইট-বেসড মরাল থিওরি' প্রবন্ধে করেছেন[৭]। তাঁর এই সিদ্ধান্তের পেছনে যে যুক্তি কাজ করছে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে গেলে বলতে হয়—বিচ্ছিন্নভাবে দায়িত্বের প্রাধান্য মানুষ কখনও মেনে নেবে না, সে সবসময় জানতে চাইবে দায়িত্ব পালন করে তার লাভ কী? লাভের কথা ভাবলে দায়িত্ব-ভিত্তিক বা ডিউটি-বেসড নীতিশাস্ত্র কার্যকরী হবে না। ফলে তত্ত্বগতভাবে কান্টের দায়িত্বভিত্তিক নীতিশাস্ত্র যতই আকর্ষণীয় হোক, কার্যকালে তা অসম্ভব। কাজ করতে গিয়ে যদি লাভের অঙ্কটাই প্রধান হয়ে দেখা দেয় তাহলে কি লক্ষ্যভিত্তিক নীতিশাস্ত্র নিরূপণ করা সমীচীন? ম্যাকি বলছেন—তাও না। নীতিশাস্ত্রে লক্ষ্যের একটা মুখ্য ভূমিকা থাকলেও লক্ষ্যভিত্তিক প্রকল্প নৈতিক হতে পারে না। মনে রাখতে হবে ম্যাকির কাছে নৈতিকতার উদ্দেশ্য ছিল পরার্থপরতার সীমাবদ্ধতা থেকে উদ্ভূত সমস্যার মোকাবিলা করা। লক্ষ্যভিত্তিক নীতিশাস্ত্র তা করতে পারে না। শুধুই লক্ষ্য বা পরিণামের দিকে যদি আমাদের নজর থাকে তাহলে আমরা লক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে লভ্যাংশের গড় করব, দেখব গড়পড়তা সুখ বা উপযোগিতা বাড়ল না কমল। এই গড় কষাকষির ফলে ব্যক্তিবিশেষ বা ইন্ডিভিজুয়াল অবহেলিত হতে পারে। বৃহত্তর

Scanned with

স্বার্থের দোহাই দিয়ে ব্যক্তির স্বার্থ, অধিকার, দাবি ও সুখকে অবহেলা করার একটা ছাড়পত্র পাওয়া যাবে। ম্যাকির মতে এ ধরনের লক্ষ্যভিত্তিক নৈতিকতা বিলক্ষণ অনৈতিক। লক্ষ্যের গুরুত্ব অস্বীকার না করলেও অধিকারকে অগ্রাধিকার দেওয়া যায় এবং দেওয়া উচিত।

ম্যাকি মনে করেন, কে কেমন করে বাঁচতে চায় তা স্থির করার অধিকার প্রত্যেক মানুষের আছে। যেমন আছে প্রত্যেকের বাঁচার অধিকার, স্বাধীন জীবনযাপনের অধিকার ও সুখের অধিকার—এর কোনোটাই অবশ্য চূড়ান্ত অধিকার নয়। এগুলি basic, abstract, prima facie অধিকার বা মৌলিক বিমূর্ত প্রতীয়মান অধিকার। প্রতীয়মান অধিকারের বৈশিষ্ট্য হল যে এই অধিকারের দাবি প্রাথমিকভাবে মেনে নিলেও শেষ বিচারে দাবি পূরণ করা সম্ভব নাও হতে পারে। বিমূর্ত মৌলিক প্রতীয়মান অধিকার ছাড়াও ম্যাকি কয়েকটি মৌলিক অধিকার স্বীকার করেছেন যার মধ্যে আছে নিজের শ্রমের ফসল ভোগ করার অধিকার, প্রাকৃতিক সম্পদ ভোগ করার সমান অধিকার, যুক্তিযুক্ত প্রত্যাশা পূরণের অধিকার, ইত্যাদি।[৮]

একটি অধিকারকে কিন্তু ম্যাকি চূড়ান্ত বা 'অ্যাবসোলিউট' বলে স্বীকার করেছেন; তা হল: সমান মর্যাদার অধিকার। অর্থাৎ যদি প্রতীয়মান অধিকারের মধ্যে সংঘাত হয় তখন তা দূর করার উদ্দেশ্যে কমপ্রোমাইজ বা আপোস-মীমাংসা চলাকালীন প্রত্যেক ব্যক্তির সমান মর্যাদা পাওয়ার মৌলিক অধিকার অনস্বীকার্য। এক বা একাধিক ব্যক্তির চূড়ান্ত অধিকার উপেক্ষা করে 'গুড লাইফের' পরিকল্পনা করা বিলক্ষণ অনৈতিক।

লক্ষ্যভিত্তিক নৈতিকতাকে অনৈতিক বলার পেছনে কাজ করছে ম্যাকির এই বদ্ধমূল ধারণা যে, ব্যক্তির মৌলিক অধিকার উপেক্ষা করেও লক্ষ্যভিত্তিক নৈতিকতা গড়ে উঠতে পারে। আর যদি ব্যক্তির মৌলিক অধিকারকে মর্যাদা দিয়ে লক্ষ্য স্থির করা হয় তাহলে, ম্যাকি মনে করেন, লক্ষ্যভিত্তিক নৈতিকতা অধিকারভিত্তিক নৈতিকতায় পর্যবসিত হবে।

কথা হচ্ছিল পরার্থপরতার সীমাবদ্ধতা নিয়ে, স্বার্থের সংঘাত নিয়ে। এখন দেখা যাচ্ছে এই সংক্রান্ত সমস্যার নৈতিক মীমাংসা করতে গেলে মানুষের নৈতিক অধিকারের কথা মনে রাখতে হবে। অধিকার-নিরপেক্ষ দায়িত্ব এবং/অথবা লক্ষ্যভিত্তিক প্রকল্পের কোনো নৈতিক পরিণতি নেই।

সর্বজনীন কিছু মৌলিক অধিকার স্বীকার করার পরও চাই কিছু সামান্যীকৃত নৈতিক ভাবনা। নচেৎ আমরা প্রত্যেকে যদি ন্যায়-অন্যায় নিরূপণের নিজস্ব কতকগুলি বিচ্ছিন্ন সিদ্ধান্ত নিতে থাকি তাহলে খামখেয়ালিপনা বাড়বে আর নির্ভরযোগ্যতা কমে আসবে। যৌথ জীবনযাপনের সম্ভাবনাও ক্ষীণ হয়ে আসবে। আমাদের স্বরচিত 'গুড লাইফের' প্রকল্পও চরিতার্থ হবে কি না সন্দেহ। সমন্বিত যৌথ জীবনযাপন করতে গেলে চাই কিছু নির্ভরযোগ্য সর্বজনীন সূত্র। এমন কিছু সাধারণ সূত্রের হদিস আমরা পাই ম্যাকির প্রাক্-নৈতিক ও নৈতিক 'ডিসপোজিশন' থেকে। একদিকে কিছু সর্বজনীন মৌলিক অধিকার আর একদিকে কিছু সর্বজনীন 'ডিসপোসিশন' বা প্রবণতা আর সর্বোপরি চুক্তির নির্ভরশীলতাকে সম্বল করে ম্যাকি দেখাতে চাইছেন অনপেক্ষ নৈর্ব্যক্তিক নৈতিক মূল্য ত্যাগ করেও অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ সর্বজনীনতা কেমন করে প্রতিষ্ঠা করা যায়। সর্বজনগ্রাহ্য নৈতিক অধিকার, লক্ষ্য, কর্তব্য প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেও যে ব্যতিক্রম থাকবে না, বিরোধ বাধবে না, এমন নয়। চেষ্টা করতে হবে যাতে বিরোধের জায়গাগুলি ক্রমশ বাড়তে না থাকে। ম্যাকি মনে করছেন এই সমস্যা নতুন নয়, বহু হাজার বছর ধরে মানুষ যুক্তি-তর্ক, আলাপ-আলোচনার মধ্যে দিয়ে বিরোধ কমানোর চেষ্টা করে চলেছে। পুরুষানুক্রমিক প্রচেষ্টার ফলে নিষ্পত্তির কতগুলি প্রতিষ্ঠিত ছক বা ফরমুলাও অনেক ক্ষেত্রে গড়ে উঠেছে। এই ছকগুলিকে বলা যায় 'নৈতিক বিরোধ মীমাংসার নীতি'।

এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মে সঙ্কটমোচনের কিছু সমাধান-প্রক্রিয়ার সাধারণীকরণ দেখা যায়। যার ফলে একই সমাধান-প্রক্রিয়া বিবিধ নৈতিক ভাবাদর্শে স্থান পায়, এমনকি আইন-আদালতেও অনেক সময় সেই প্রক্রিয়া আইনানুগ বলে সমাদর পায়। লক্ষণীয় এই যে, নৈতিক অনুষঙ্গে যেমন বিরোধ দেখা যায়, রাজনৈতিক অনুষঙ্গেও তেমনি বিরোধ দেখা যায়। ম্যাকি মনে করেন নৈতিক বিরোধ নিষ্পত্তির যেমন বাঁধা কতকগুলি ছক তৈরি হয়েছে, রাজনৈতিক বিরোধের ক্ষেত্রে কিন্তু তেমন কোনো পন্থা-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। রাজনৈতিক বিরোধ মীমাংসার প্রক্রিয়া এখনও খুব প্রাথমিক স্তরে রয়েছে—আন্তর্জাতিক স্তরে কিছু অস্পষ্ট বিধি-নিষেধ মেনে চলা হয়, এই পর্যন্ত। আন্তর্জাতিক স্তরে কী করে বিরোধ মীমাংসা করা যেতে পারে সে বিষয়ে ম্যাকির সুস্পষ্ট ধারণা নেই। উনি শুধু এইটুকু বলেছেন যে নৈতিকতার ক্ষেত্রে যেমন প্রত্যেক মানুষের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার ব্রতী হতে হবে,

Scanned with

রাজনীতির ক্ষেত্রেও তার অন্যথা করা চলবে না। এই ন্যূনতম নিষেধ সেখানেও প্রযোজ্য।

সাধারণভাবে দেখা যায় সব সংঘাতের মূলে থাকে স্বার্থচিন্তা; ধ্যান-ধারণার পার্থক্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সংঘাত বড় একটা হয় না। প্রত্যেকের কিছু ব্যক্তিগত স্বার্থ থাকে আর অপরের জন্য থাকে কিছুটা সহানুভূতি। আগেই বলেছি এই সহানুভূতি খুব সীমিত। আমরা যার সঙ্গে নৈকট্য অনুভব করি কেবল তারই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভাবি। 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'-নীতিতে অনুপ্রাণিত হয়ে কিংবা বাইবেলের নির্দেশমতো ('Love thy neighbour') প্রত্যেককে নিজের নিকট প্রতিবেশী মনে করি না, বা সব প্রতিবেশীকেও নিকট মনে করি না। ম্যাকির মতে নিজের স্বার্থ আর প্রিয়জনের স্বার্থ বাদ দিয়ে মানুষ কখনোই সর্বসাধারণের স্বার্থের কথা ভাবতে পারে না। ন্যায়-অন্যায় নির্মাণের অনুষ্ঠানই এরকম—নৈতিক বিধির দক্ষিণ মুখ ফেরানো থাকে নিজের ও নিজের পরিজনবর্গের দিকে, নিজের জাতি গোষ্ঠী ও লিঙ্গের দিকে (ছেলেরা ছেলেদের কথা বেশি করে ভাবে, মেয়েরা ভাবে মেয়েদের স্বার্থের কথা)। এর বাইরে আর সকলের প্রতি আমরা হয় উদাসীন, নয় বিরূপ।

বিচিত্র সব স্বার্থচিন্তা নিয়ে মানুষ বাঁচে। নানান আলাপ-আলোচনার মধ্যে দিয়ে একটা সমঝোতায় কখনও আসা যায়, কখনও আসা যায় না। পরস্পরের স্বার্থের বিরোধ এমন তীব্র আকার ধারণ করতে পারে যখন পরস্পরের দাবির মধ্যে একটা সমন্বয়ের চেষ্টা করতেও কেউ রাজি নয়। এমনও হতে পারে যে সমন্বয় বা অ্যাডজাস্টমেন্টের সূত্র কী হওয়া বাঞ্ছনীয় সে বিষয়ে তাঁরা সহমত হতে পারছেন না।[৯]

আমাদের মানতেই হবে যে এমন কিছু সমস্যা আছে যেখানে চূড়ান্ত সমাধান কখনোই হবে না। উভয়পক্ষের লক্ষ্যের প্রভেদ থেকেই যাবে। তবু চেষ্টা করে যেতে হবে যাতে উভয়পক্ষ অন্তত পরস্পরের প্রাইমা ফেসি (prima facie) অধিকার বা প্রতীয়মান অধিকারের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়ে, এই অধিকারগুলির মধ্যে একটা যুক্তিসঙ্গত আপস খুঁজে বার করার চেষ্টা করে। ম্যাকি লিখছেন: 'The only approach to these intractable problems that is at all hopeful is to acknowledge the reality and the probable persistence of the conflict of aims, to try to get both parties to recognize their conflicting prima facie rights as such,...'[১০]

মতের আত্যন্তিক অমিল হলেই যে আমাদের ভায়োলেন্স বা সংঘাতের পথ বেছে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই ম্যাকি তা মনে করেন না। তাঁর মতে আলোচনা বা ডায়ালগের মধ্য দিয়ে একটা যুক্তিগ্রাহ্য সমাধান খোঁজার চেষ্টা করতে হবে। এটা সম্ভব করার জন্য চাই বিচারবিধি বা জাস্টিস, যাকে গ্রীক ভাষায় বলে ইউস (*ius*); অর্থাৎ নৈতিকতা এবং নিয়মাবলি (*mores*) দুই-ই চাই এবং এই উভয়ের মধ্যে একটা মোটামুটি সামঞ্জস্য থাকা চাই। যে কোনো বিচারবিধি ও যে কোনো রীতিনীতি হলেই চলবে না। এমন বিচারবিধি ও এমন রীতিনীতি চাই যা সমাজে ভায়োলেন্স বা হিংস্রতা ঠেকাতে পারে। প্রশ্ন হচ্ছে, কী সে বিধি ও রীতিনীতি? এর স্পষ্ট উত্তর ম্যাকি দেননি। এর উত্তর খুঁজে বার করার আগে উনি বলেছেন আমাদের প্রথমে বুঝতে হবে যে নৈতিকতার মূল সমস্যা এখানেই। প্রায়শই আমরা এটা উপলব্ধি করতে না পেরে ভুল জায়গায় মনোনিবেশ করি।[১১]

আবার ফিরে যাওয়া যাক ন্যায় ও অন্যায় নির্মাণের আলোচনায়। ম্যাকি ন্যায়-অন্যায় নির্মাণের সময় যে দিকগুলিতে নজর রাখতে হবে বলেছেন তার মধ্যে আছে ব্যক্তির প্রতীয়মান অধিকার, 'গুড লাইফ' বা ভাল জীবনের লক্ষ্য, মানুষের প্রাক্-নৈতিক বা নৈতিক প্রবণতা, উপযোগিতা ও স্বার্থবুদ্ধি। এই প্রতিটি দিক নিয়ে আমরা অল্পবিস্তর আলোচনা করেছি, আলোচনা করা হয়নি মরাল রুল বা নৈতিক অনুশাসন নিয়ে। ন্যায় ও অন্যায় সৃজনের সময় ম্যাকি চান অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে ফলাকাঙ্ক্ষা ও নৈতিক অনুশাসনের সমন্বয় হোক। কেবলমাত্র পরিণামের কথা ভেবে ভবিষ্যৎ কর্মনির্ধারণ করলে নৈতিক জীবনযাপনে সফল হওয়া যায় না। আবার প্রতিটি কাজের এত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পরিণাম রয়েছে যে সবগুলির তুল্যমূল্য বিচার করে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। প্রতিটি পরিস্থিতির আলাদা-আলাদা বিচার করে কর্তব্য নির্ণয় করার মানে হয় না।

নির্ভরযোগ্য উপায় হল অভিজ্ঞতা এবং জীবনযাপন থেকে উঠে আসা কিছু মরাল রুল অর্থাৎ নৈতিক অনুশাসন বা 'দিকে' অনুসরণ করে চলা। এই সব অনুশাসনে বিধৃত রয়েছে বহু চিন্তার ফসল—কোনটা অনুশাসন উপযোগী, কোনটা নয়, সে বিষয়ে দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মানুষ আদর্শ-ব্যবহার সম্বন্ধে কতগুলি অনুশাসন গড়ে তুলেছে। জন স্টুয়ার্ট মিলও এই জাতীয় অভিমতের সপক্ষে বলেছিলেন যে সব সমাজেই মানুষ তাদের নৈতিক জীবনযাপনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে উঠে আসা

Scanned with

পরামর্শকে নানা আইন ও অভিমতের সাহায্যে স্থায়ী করে রাখতে চায়—আর তাই তৈরি হয় মরাল রুল বা অনুশাসন। এইসব নৈতিক অনুশাসনের মূল্য অনেক। এককভাবে চিন্তা-ভাবনা করে এইসব অনুশাসনের সমমানের সিদ্ধান্তে আসা যায় না, এগুলি বহুযুগের গোষ্ঠীজীবনের অভিজ্ঞতার ফসল।

পূর্বস্থাপিত অনুশাসনকে অনুসরণ করার অনেকগুলি সুবিধের কথা ভাবা যায়—প্রথমত, সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়ার সরলীকরণ হয়, দ্বিতীয়ত, সিদ্ধান্তের মান এতে উন্নত হয়। প্রতিতুলনায় বলা যায় নৈতিক অনুশাসন বাদ দিয়ে নিছক ফলাকাঙ্ক্ষাপ্রসূত সিদ্ধান্ত তাৎক্ষণিক ভাবে লাভজনক হলেও আখেরে ফল দেয়না। এছাড়া প্রাক্-পরিকল্পিত সিদ্ধান্তের মধ্যে দিয়ে নৈতিকতার একটা স্থায়ী মান স্থির হয়, ক্ষণে ক্ষণে মান বদল করলে পরস্পরের সঙ্গে লেনদেনের অসুবিধে হয়। আমাদের যদি চুক্তি তৈরি করার, আর চুক্তি বলবৎ করার, স্থায়ী প্রণালী না থাকে তাহলে আমরা একত্র হয়ে কিছুই করতে পারব না। ম্যাকি মনে করিয়ে দেন যে, পূর্বপ্রতিষ্ঠিত নৈতিক মান স্বীকার করার অর্থ অনুষঙ্গ-নিরপেক্ষ 'এ প্রায়োরাই' (a priori) মান স্বীকার করা নয়, এই মানগুলি প্রায় অনুষঙ্গ-নিরপেক্ষ।

নৈতিক আচরণের প্রধান উদ্দেশ্য ব্যক্তি-স্বার্থ ও ব্যক্তি-অধিকারকে উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া। ব্যক্তির নানাবিধ অধিকারের মধ্যে সকলের সঙ্গে সমান মর্যাদা পাওয়ার অধিকার সর্বপ্রধান। একের সঙ্গে অপরের অমিল হলে একটা সমঝোতায় আসার চেষ্টা করতে হয়, তখন কিছু রেখে কিছু ছাড়তে হতে পারে, এই আপস চলাকালীন সবপক্ষের লোকের সমান মর্যাদা পাবার একটা মৌলিক অধিকার আছে—ম্যাকি বলেন, এই গোড়ার কথাটা ভুলে গেলে ন্যায়ের উদ্ভাবন সম্ভব নয়।

'ইউস' বা জাস্টিস অর্থাৎ বিচারবিধির প্রসঙ্গ এলেই রাজনীতি বা পলিটিক্স এসে পড়ে। ম্যাকি যেভাবে ন্যায় ও অন্যায় সৃজনের প্রকল্প নিয়েছেন তাতে স্বাভাবিক প্রশ্ন জাগে এই প্রকল্পের সঙ্গে দর্শনের সম্পর্ক কতখানি এবং রাজনীতির সম্পর্কই বা কী? ম্যাকির মতে ন্যায়-অন্যায় নির্মাণে দর্শনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তিনি উপলব্ধি করেছেন যে এই কাজে যৌক্তিক বিচারের বিশেষ প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। এছাড়া এথিক্সের আলোচনায় অনস্বীকার্যভাবে মনুষ্যস্বভাব ও সামাজিক সম্পর্কের প্রসঙ্গ এসে পড়ে আর তখনই আসে দার্শনিক পদ্ধতিতে কার্য-কারণ বিচারের প্রভূত

সুযোগ। অর্থাৎ যৌক্তিক বিচার এবং 'ক্রিটিকাল থিংকিং' (critical thinking) বা দার্শনিক বিচার ছাড়া ন্যায়-অন্যায় নির্মাণের কথা ভাবা যায় না।

ম্যাকি অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক, ফলে যুক্তিবাদী দার্শনিকদের সঙ্গে তাঁর দর্শনের স্বরূপ বিষয়ে মতান্তর থাকাটাই স্বাভাবিক। ম্যাকি মনে করেন অভিজ্ঞতানির্ভর সত্য মাত্রই সম্ভাব্য সত্য। এই সম্ভাব্য সত্যকে নিয়েও যৌক্তিক বিচার হতে পারে, সিদ্ধান্তের সাধারণীকরণ হতে পারে। এমনকি তিনি মনে করেন 'মেটা-লেভেল এথিক্স' (meta-level ethics) বা পরানীতি তত্ত্বও সম্ভব। ওঁর আপত্তি শুধু 'অবজেক্টিভ ভ্যালু' (objective value) মানার ব্যাপারে। যৌক্তিক অনুসন্ধান এখন সব শাস্ত্রেই অনুপ্রবিষ্ট, যৌক্তিক, বিমূর্ত, তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দর্শনের একচেটিয়া এক্তিয়ার নেই; তবু দর্শন এখনও একটা অনন্য ভূমিকা পালন করে চলেছে—কারণ দর্শন একটি অধিবিদ্যা। ম্যাকি অবশ্য যুক্তিবাদীদের মতো দর্শনকে একটা অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ অধিশাস্ত্র হিসেবে না দেখে অভিজ্ঞতানির্ভর অধিশাস্ত্র রূপে দেখতে চান।

ম্যাকি এথিক্সের সঙ্গে রাজনীতিরও ঘনিষ্ঠ যোগ দেখতে পান। তাঁর 'দিকে' এবং 'ইউস' স্বীকার করার মধ্যে দিয়েই এর আভাস পাওয়া যায়। 'এথিক্স' বই-এর সর্বশেষ অধ্যায়ে উনি বলেছেন নীতিশাস্ত্র রাজনীতির অঙ্গ (Ethics is a part of politics)। তার পরের বাক্যেই বলেছেন রাজনীতি নীতিশাস্ত্রের অঙ্গ।[১২] এমন অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক থাকলে একটি থেকে অপরটিকে পৃথক আর বলি কী করে? আর কি বলা যায় নৈতিক ন্যায়-অন্যায় সৃজন আর রাজনৈতিক ন্যায়-সৃজন দুটি পৃথক সৃজন ক্রিয়া? তা বোধ হয় আর বলা যায় না। তাহলে কি ম্যাকি ব্রিটিশ বিশ্লেষণাত্মক দর্শনের পথ ধরে শেষ পর্যন্ত আধুনিকোত্তর চিন্তাধারায় উপনীত হলেন?

পোস্ট-মডার্নিস্ট (post-modernist) বা আধুনিকোত্তর দর্শনে মনে করা হয় নৈতিক অনুশাসনের শাসনের জোরটা সর্বদাই রাজনৈতিক। শুধু তাই নয়, তাঁরা দর্শন আর রাজনীতির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখতে পান না। তাই তাঁরা অবলীলাক্রমে 'পলিটিক্স অব এক্সপিরিয়েন্স' (politics of experience) 'পলিটিক্স অব রিজন' (politics of reason)-এর মতো অভিধা ব্যবহার করেন। ম্যাকি কিন্তু দর্শনকে রাজনীতিতে রূপান্তরিত না করেই রাজনীতির প্রভাব স্বীকার করেছেন। দর্শনের পন্থা-পদ্ধতি প্রয়োগ করে আমরা নিজেদের 'গুড লাইফ'-এর প্রকল্প নিরূপণ করি, ঠিক করি

Scanned with

আমাদের জীবনের লক্ষ্য কেমন হলে ভালো হয়। আবার বিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রে, অধিকারের দাবি মঞ্জুরের ক্ষেত্রে, রাজনীতির প্রাধান্য দেখা দেয়। ম্যাকি যেন বলতে চাইছেন দর্শন-ভাবনা আর রাজনৈতিক-ভাবনা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে; সবসময় স্পষ্ট বিভাজন রেখা টানা যায় না। জীবনের লক্ষ্য নির্বাচনের পেছনে রাজনীতি থাকতে পারে, আবার অনুশাসনের মধ্যে থাকতে পারে দর্শন-ভাবনা। ম্যাকিকে পোস্ট-মডার্নিস্ট বা আধুনিকোত্তর দার্শনিক তো বলা যায়ই না, এমনকি ওঁকে রোরটি-র মতো 'প্রাগমাটিস্ট' (pragmatist) বা প্রয়োগবাদী দার্শনিক মনে করাও ঠিক হবে না।

ম্যাকি তাঁর 'এথিক্স' বই-এর শুরুতেই যেভাবে 'ফার্স্ট অর্ডার' আর 'সেকেন্ড অরডার' আলোচনার পার্থক্য করেছেন রোরটি তা করেন না। ম্যাকি সুস্পষ্টভাবে হব্‌স ও জন লকের ঐতিহ্য-অনুগামী অভিজ্ঞতাবাদী বিশ্লেষণাত্মক দর্শনচর্চা করেছেন। তিনি যেহেতু বলেছেন, কোনটা ন্যায় আর কোনটা অন্যায় তা আমাদের নির্বাচন দিয়ে স্থির হয়, আমরা যেটাকে ন্যায় বলে বেছে নেব সেটাই ন্যায়, সেহেতু বার্নার্ড উইলিয়াম্‌স্ আশ্চর্য মিল দেখতে পান জাঁ পল সার্ত্রের সঙ্গে ম্যাকির। এঁদের মধ্যে কিছু কিছু মিল থাকলেও ম্যাকিকে অস্তিবাদী দার্শনিক বলা চলে না। সার্ত্রে যে যুক্তিতে বলছেন ন্যায় ও অন্যায় হল সৃজিত মূল্য সেই একই যুক্তির টানে তাঁকে অবশেষে অনিবার্যভাবে ন্যায়-অন্যায়ের বিচারকে দর্শনের কোটি থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হয় সক্রিয় রাজনীতির প্রাঙ্গণে। ম্যাকি অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে এগোতে থাকেন, যদিও পরিণামে তাঁকে নীতিশাস্ত্রের ওপর রাজনীতির প্রভাব স্বীকার করতেই হয়। ম্যাকির এই যাত্রা অস্তিবাদী পথে অগ্রসর না হয়ে অ্যারিস্টটলের অনুগামী।

অ্যারিস্টটল দর্শনের গুরুত্ব স্বীকার করেও রাজনীতির মুখ্য ভূমিকা স্বীকার করেছিলেন। এর অর্থ এই নয় যে তাঁর মতে দর্শন রাজনীতিতে পর্যবসিত হওয়া উচিত। অ্যারিস্টটল 'থিওরেটিকাল রিজন' (theoretical reason) বা তাত্ত্বিক প্রজ্ঞা এবং 'প্র্যাকটিকাল রিজন' (practical reason) বা প্রায়োগিক প্রজ্ঞার প্রভেদ স্বীকার করেন। তাত্ত্বিক প্রজ্ঞা এককভাবে ঠিক/ভুল, শুভ/অশুভ নিরূপণ করতে পারলেও আমাদের কোনো কাজে প্রবৃত্ত করতে পারে না। অ্যারিস্টটল 'থিওরিয়া', 'প্র্যাক্‌সিস' ও 'প্রোয়েরেসিসের' মধ্যে একটা পার্থক্য করেন। আর একভাবে এই পার্থক্যকে বলা

যায় জ্ঞান, কর্ম ও সৃষ্টির পার্থক্য। অ্যারিস্টটল রাজনীতিকে প্র্যাক্‌সিস্ বা কর্মের অন্তর্গত করে দেখেন। তিনি তাঁর 'নিকোমেকিয়ান এথিক্স' বইতে এথিক্সের বিস্তার হিসেবে রাজনীতির আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থে অ্যারিস্টটল রাজনীতিকে বলেছেন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান। তবে রাজনীতির লক্ষ্য অর্জন করতে হলেও আমাদের বিশুদ্ধ প্রায়োগিক প্রজ্ঞার অধিকারী হতে হবে। দর্শনকে বাদ দিয়ে জীবনের চরম লক্ষ্যে পৌঁছান যাবে না। শেষ অবধি রাজনীতির ওপর নির্ভর করে 'গুড লাইফ' চরিতার্থ করতে হলেও মূলের দর্শন ভাবনাকে কখনই অবজ্ঞা করা চলবে না।

ম্যাকির একটি সংক্ষিপ্ত উক্তি থেকে তাঁর বক্তব্যের সারাংশ বোঝা যায়। ম্যাকি বলেন, নৈতিকতা মানুষের সৃষ্টি। নৈতিকতা গড়ে উঠেছে চিন্তন, মূল্যায়ন ও সংযমের সংমিশ্রণে। নৈতিক ভাবনার মধ্যে রয়েছে আবেগ, বাসনা ও প্রবণতা, পাশাপাশি রয়েছে সামাজিক আদান-প্রদান ও পারস্পরিক চাপ আর সেই সঙ্গে আছে বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান ও বিশ্বাস।[১৩]

উপসংহারে বলা যায় ম্যাকি একধরনের 'রাইট-বেসড্' বা অধিকারভিত্তিক নৈতিক দর্শনের ছক আমাদের দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। যতদূর সম্ভব সমসাময়িক কালের জীবন-যাপনের জটিলতাকে সরল না করে বা অস্বীকার না করে তিনি এক ধরনের এথিক্স-এর প্রস্তাব দিয়েছেন। এর দ্বারা তিনি আশা করেন আমাদের একটা বড় প্রয়োজন মিটবে এবং বেশ কয়েকটি সামাজিক সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে।

বর্তমান যুগ হতাশার যুগ, বেপরোয়া জীবনযাপনের যুগ। এসব সত্ত্বেও আমাদের জীবনে নৈতিক আদর্শের যে একটা ইতিবাচক ভূমিকা আছে, একটা জরুরি প্রয়োজন আছে, তা ম্যাকির লেখা থেকে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। নৈতিক মূল্যগুলি যে নৈর্ব্যক্তিক না হয়েও প্রায় সর্বজনীন ও নির্ভরযোগ্য হতে পারে তার সপক্ষে ম্যাকি একটা মতকে যুক্তিগ্রাহ্য করার চেষ্টা করেছেন। অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক হয়েও দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, হতাশা ও অবিশ্বাসের ওপরে উঠে এমন ভবিষ্যৎ সমাজের প্রকল্প গড়া যায় যেখানে আমরা সকলে ঐকমত্যে পৌঁছতে না পারলেও একত্রে থাকার ন্যূনতম সূত্র গড়ে তুলতে পারি। তিনি মনে করেন বর্তমান সমাজ থেকে তাঁর প্রকল্পের সমাজ অনেক বেশি বাসযোগ্য হবে। আরো নির্ভরযোগ্যভাবে আমরা যে যার ভাল জীবনের আদর্শ এই নতুন সমাজে চরিতার্থ করে তুলতে পারব।

Scanned with

ম্যাকি মনে করেন না যে চুক্তিভিত্তিক নৈতিকতার কথা তিনিই প্রথম বলেছেন, তবে পাশ্চাত্য নীতি-দর্শনের ইতিহাসে চুক্তি-নিরপেক্ষ নৈর্ব্যক্তিক আদর্শ স্বীকারের দিকেই পাল্লা বেশি ভারি। তিনি যত্ন করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন কেমন করে প্লেটো-অ্যারিস্টটলের যুগ থেকে আরম্ভ করে হিউম-রাসেলের মধ্যে দিয়ে আধুনিক যুগ অবধি দার্শনিকরা বারে বারে নৈতিক বিচারের কোনো এক স্তরে নৈর্ব্যক্তিক আদর্শ স্বীকার করে থাকেন। এই ধারণার বিরুদ্ধে ম্যাকির প্রধান আপত্তি এই যে, এইজাতীয় দাবির মানে বোঝা যায় না। ম্যাকি ওঁর যুক্তির নাম দিয়েছেন 'argument from queerness' অর্থাৎ এঁদের কথা ওঁর কাছে অত্যন্ত আজগুবি তথা দুর্বোধ্য লাগে।

ম্যাকি স্বীকার করেন যে নীতি দর্শনের ভাষার মধ্যে নৈর্ব্যক্তিক মূল্যবোধের ধারণা অনুস্যূত বা অবিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। কথ্যভাষায় আমরা যখন 'ন্যায়', 'অন্যায়', 'শুভ', 'অশুভ' এই পদগুলি ব্যবহার করি তখন ধরে নিই যে আমরা নৈর্ব্যক্তিক মূল্য সম্বন্ধে কথা বলছি। ম্যাকি তাঁর 'এরর থিওরি'র (error theory) সাহায্যে দেখাতে চান যে এই লৌকিক ধারণা ভুল—এই প্রসঙ্গেই তিনি মরাল স্কেপটিক (moral sceptic) বা নৈতিক সংশয়বাদী। তিনি মনে করেন নৈর্ব্যক্তিক নৈতিকমূল্য বলে কিছু নেই।[১৪]

বিংশ শতাব্দীর আশির দশক থেকে নারীবাদীরা দর্শনের মূলস্রোতের একাধিক প্রতিষ্ঠিত ধারণাকে লিঙ্গ-প্রেক্ষিতে বিচার করতে আরম্ভ করেন। ম্যাকি যে পরার্থ-ভাবনার সীমাবদ্ধতার কথা বলেন সে কথা মূলস্রোতের ভাবনায় খুবই প্রচলিত। র‍্যাডিকাল নারীবাদীরা মনে করেন যে পরার্থ-ভাবনার সীমাবদ্ধতা কোনো স্বাভাবিক ঘটনা নয়। আত্মকেন্দ্রিকতা এবং অপরকে আপন করতে না পারার মূলে আছে পিতৃতন্ত্র। 'উত্তর-আধুনিকতা ও নারীবাদ'-এর অধ্যায়ে আমরা দেখেছি পিতৃতন্ত্র কীভাবে আপন ও পর-এর মধ্যে বিভেদ ঘটায়।

একবার বিভেদ ঘটে যাবার পরে ম্যাকি খুঁজছেন একত্রে থাকার একটা ন্যূনতম নৈতিক সূত্র। নৈর্ব্যক্তিক বিধি অস্বীকার করলে চুক্তিভিত্তিক নীতিশাস্ত্র ভিন্ন আর তৃতীয় বিকল্প নেই এই কথাটি সব নারীবাদীরা মেনে নেবেন না।

নৈর্ব্যক্তিক বিধির কথা বললেন কান্ট। ম্যাকি বললেন নৈতিকতার চুক্তির কথা। নারীবাদীরা আরো নানা ধরনের বিকল্প নীতিশাস্ত্রের কথা বলছেন। ক্যারল গিলিগান (Carol Gilligan) বলেন দরদী নীতিশাস্ত্র (care ethics)-এর কথা, ডায়ানা মেয়রস

(Diana Meyers) বলেন সমানুভূতিক নীতিশাস্ত্র (ethics of empathy)-র কথা আর ডেরিল কোয়েন (Daryl Koehn) বলেন সংলাপধর্মী নীতিশাস্ত্র (dialogical ethics)-এর কথা। নারীবাদী নীতিশাস্ত্রের নানা বিকল্প ভাবনার মধ্যে অন্যতম গিলিগান-এর কেয়ার এথিক্স। গিলিগান-এর মত আলোচনা প্রসঙ্গে মূলস্রোতের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য কোথায় তাও অবশ্যই আলোচনা করতে হয়। ম্যাকি এই মূলস্রোতের অন্যতম প্রতিনিধি। দরদী নীতিশাস্ত্র বা কেয়ার এথিক্সের মূল পূর্বপক্ষ তাঁরাই যাঁরা right-based ethics করেন এবং যাঁরা duty-based ethics করেন। ম্যাকির নীতিশাস্ত্রে right-based ethics-এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়।

পরের অধ্যায়ে নৈতিকতা ও নারীবাদ আলোচনা প্রসঙ্গে মূলস্রোতের সঙ্গে নারীবাদের বিবাদের প্রাথমিক সূত্রগুলি আলোচনা করা হয়েছে। সেই বিবাদের খুঁটিনাটি বুঝে নেওয়ার পরে আরো স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে কেন ম্যাকির আপাত-র‍্যাডিকালিজম র‍্যাডিকাল নারীবাদীদের কাছে গ্রাহ্য নয়।

সূত্র-নির্দেশ

এই অধ্যায়ের একটা প্রাথমিক খসড়া কলকাতার ফ্রাইডে গ্রুপে পড়া হয়েছিল। এই গ্রুপের সদস্যদের কাছ থেকে পাওয়া অনেক জরুরি সংশোধন পরবর্তীকালে এই লেখায় যুক্ত হয়েছে। এঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এ ছাড়া আমার ঋণ আছে অলকানন্দা গুহর কাছে, যে প্রাথমিক খসড়াটি পড়ে অনেক ভুল, ত্রুটি ও অস্পষ্টতা ধরিয়ে দিয়েছে।

১. J. L. Mackie, *Ethics: Inventing Right and Wrong*, Penguin Books, Harmondsworth, 1977.
২. *Ethics*, p. 29.
৩. *Ethics*, p. 63.
৪. *Ethics*, p. 115.
৫. *Ethics*, p. 123.
৬. J. L. Mackie, 'Cooperation, Competition and Moral Philosophy' in *Persons and Values*, ed. J. L. Mackie and Penelope Mackie, Clarendon Press, Oxford, 1985, p. 160.
৭. J.L. Mackie, 'Can there be a Right-based Moral Theory?' in *Persons and Values*.
৮. J. L. Mackie, 'Rights, Utility, and Universalization' in *Persons and Values*.
৯. *Ethics*, p. 154.
১০. *Ethics*, pp. 179-80.

Scanned with

১১. '...We need not only *ius* but also *mores*, morality as well as law, and they must be in reasonable harmony with one another. Besides, we need the right sort of *ius* and the right sort of *mores* to contain the forces that would otherwise break out as *vis*. The problem is to find out what these are. The first step towards solving the problem is to see that this *is* the problem. Regrettably, not every one has seen this, and many thinkers divert attention from it by posing questions about moral philosophy in less illuminating ways'. 'Co-operation, Competition and Moral Philosophy', in *Persons and Values*, p. 169.

১২. *Ethics*, p. 235.

১৩. 'Cooperation, Competition and Moral Philosophy', p. 153.

১৪. *Ethics*, p. 35.

ষষ্ঠ অধ্যায়

নৈতিকতা ও নারীবাদ

এ যাবৎ মনে করা হয়ে এসেছে যে, নৈতিক বিচারের মানদণ্ড যে ভাবেই নিরূপিত হোক না কেন, সেই নির্ধারণের মধ্যে কোনো লিঙ্গ পরিপ্রেক্ষিত নেই। বলা যায় না যে, পুরুষ বেছে নেবে এক ধরনের মানদণ্ড আর নারী বেছে নেবে অপর জাতীয় মানদণ্ড। যেমন, কেউ বলবে না যে—পুরুষের মানদণ্ড সবসময় হবে পূর্বত-সিদ্ধ, নিয়মানুগ, আর নারীর নৈতিক মানদণ্ড সর্বদা ফলাভিমুখী হবে। যেকোনো নৈতিক মানদণ্ড নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমাদৃত হওয়াটাই রীতি। কারণ, ভাবা হয় যে, নৈতিক মানের মধ্যে প্রতিফলিত হয় আমাদের মানবিক মূল্যবোধ, আর যা মানবিক তা লিঙ্গ-বিরহিত।

অধুনা নারীবাদীরা এই মতটিকে চ্যালেঞ্জ করতে চান। তাঁরা বলেন, যা আপাত-অনপেক্ষ তা আসলে অনপেক্ষ না-ও হতে পারে। মানবিক বা হিউম্যান বলতে আমরা মানুষের এমন কতকগুলি গুণকেই বুঝে থাকি যা নারীরও একচেটিয়া গুণ নয়, পুরুষেরও নয়। বরং বলা যায়, এই গুণগুলি নারী ও পুরুষ উভয়ের সাধারণ ধর্ম। 'মানব'—এই ধারণাটির কোনো লিঙ্গ-ধর্ম নেই—এটি একটি লিঙ্গ-অনপেক্ষ প্রকরণ। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে স্মরণ করা হয় অ্যারিস্টটলের মতকে। তিনি বলেছেন 'মানুষ মাত্রই যৌক্তিক জীব' বা 'র‍্যাশনাল অ্যানিমাল'। এর অর্থ মানুষ সব সিদ্ধান্তই যুক্তির নিরিখে নিয়ে থাকে এবং সর্বদা যুক্তির দ্বারা চালিত হওয়াটা কাম্য বলে মনে করে। এছাড়া র‍্যাশনাল বা যুক্তি-নির্ভর হওয়ার অর্থ সাধারণীকরণ বা ইউনিভার্সালাই-জেশনকে মূল্য দেওয়া। মনে করা হয় যে যদি একটি বিচার একটি স্থলে প্রযোজ্য হয়, তবে তা অনুরূপ সব স্থলেই প্রযোজ্য হবে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই সাধারণীকরণ যতটা আদরণীয়, নৈতিক বিচারের ক্ষেত্রেও তাই।

নারীমুক্তি বিষয়ে যত রকমের ভাবনা আছে তার সবই 'নারীবাদ' নামক এক সাধারণ তত্ত্বের আওতায় পড়ে না। বিভিন্ন ধরনের নারীবাদ আছে, তাদের মধ্যে

Scanned with

একটির বক্তব্য নিম্নরূপ—কিছু নারীবাদী চান একটি প্রচলিত তত্ত্ব-কাঠামোকে বা থিওরেটিকাল-ফ্রেমওয়ার্ককে অবলম্বন করে নারীমুক্তির সমস্যাবলির বিশ্লেষণ করতে। যেমন দেখা যায় প্রয়োজনমতো তাঁরা মার্কস বা ফ্রয়েড বা অস্তিবাদের বা অপর কোনো তত্ত্ব-কাঠামো বেছে নেন। তাঁদের নির্বাচনের ফলস্বরূপ নারীমুক্তির মার্কসীয় ব্যাখ্যা, ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা, কিংবা অস্তিবাদী ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এঁরা মনে করেন এঁদের নির্বাচিত তত্ত্ব-কাঠামোটি লিঙ্গ-পক্ষপাত মুক্ত এবং তা কখনই নারীমুক্তির অন্তরায় হতে পারে না। নারীমুক্তির সকল প্রতিবন্ধকই বিষয়কেন্দ্রিক বা কনটেন্ট-আশ্রয়ী তত্ত্বজনিত নয়। নারীকে যদি অবহেলা, অবদমন বা অবজ্ঞা করা হয়ে থাকে, তবে তা হবে অবদমনজনিত ত্রুটির জন্য,—ব্যাখ্যার কোনো বিশেষ তত্ত্ব-কাঠামোর জন্য নয়। অর্থাৎ সমস্যাটি কনটেন্টের স্তরের সমস্যা, তত্ত্বের স্তরের নয়। তাই বলা হয় সমস্যাটা নারীকে নিয়ে—'ওয়োম্যান ইজ দ্য প্রবলেম'।

এই সমস্যা দূর হতে পারে একমাত্র উপযুক্ত তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে। এমনি একটি নির্বাচিত তত্ত্বের মাধ্যমে নারীমুক্তির সমস্যাটিকে বোঝবার প্রশংসনীয় প্রয়াস দেখতে পাই ফরাসি নারীবাদী-দার্শনিক সিমোঁ দ্য বুভোয়া-র 'দ্য সেকেন্ড সেক্স' বইটিতে। উনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে সার্ত্রের 'বিয়িং অ্যান্ড নাথিংনেস'-এর তত্ত্ব-কাঠামোর পরিধির ভেতরে থেকেই তিনি নারীমুক্তির উপায় বাতলাচ্ছেন। তাঁর এই প্রকল্প কতটা সফল হয়েছে সে প্রশ্ন ভিন্ন। কেউ বলেন সার্ত্রের 'বিয়িং অ্যান্ড নাথিংনেস'-এর বক্তব্য খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায় তাঁর বক্তব্য নারীমুক্তির পরিপন্থী, বিশেষ করে সার্ত্রে (Jean-Paul Sartre 1905–80) তাঁর এই রচনার শেষ অংশে যেখানে বিবর আর শ্যাওলার উল্লেখ করছেন সেখানে স্পষ্টই মনে হয় নারীর দেহ সম্বন্ধে তিনি কটাক্ষ করছেন এবং বারবার বলছেন এই অবস্থা থেকে মানুষকে মুক্তি পেতে হবে। ফলে বলা হয় যে সার্ত্রের তত্ত্ব-কাঠামোটি নারী-বিদ্বেষী—সর্ষের মধ্যেই রয়েছে ভূত।

অনেকে অবশ্য মনে করেন যে সিমোঁ দ্য বুভোয়া তাঁর নিজস্ব চিন্তার অনন্যতা সম্বন্ধে সজাগ ছিলেন না। সার্ত্রের তত্ত্ব-কাঠামো অবলম্বন করতে গিয়ে তিনি যে বহুলাংশে সেই কাঠামোকে ছাপিয়ে একটা নারীবাদী বিশ্লেষণী-কাঠামো প্রয়োগ করেছেন সে সম্বন্ধে তিনি নিজেই সচেতন নন।

বর্তমান অনুষঙ্গে আমাদের কাছে যা জরুরি তা হল সিমোঁ দ্য বুভোয়ার 'দ্য

সেকেন্ড সেক্স'-এর উদ্দেশ্য কী ছিল তা জানা। সে উদ্দেশ্য কতটা চরিতার্থ হয়েছে তা আমাদের বিচার্য নয়। আমরা শুধু চাইছি প্রচলিত একটি তত্ত্ব-কাঠামোকে নারীমুক্তির কাজে লাগানোর দৃষ্টান্ত দেওয়ার। সিমোঁ দ্য বুভোয়া 'দ্য সেকেন্ড সেক্স'-এ লিখেছেন—'অ্যান এক্সিটেনশিয়ালিস্ট (existentialist) পারসপেকটিভ হ্যাজ এনেবলড আস্, দেন, টু আন্ডারস্ট্যান্ড হাও দ্য বায়োলজিকাল অ্যান্ড ইকোনমিক কন্ডিশন অব প্রিমিটিভ হোরড মাস্ট হ্যাভ লেড টু মেল সুপ্রিমেসি'[১]। এই উদ্ধৃতিটি একটা বিশেষ ধরনের নারীবাদের নিদর্শন। এই মতানুসারে বিভিন্ন তত্ত্ব-কাঠামোর বিচার্য বিষয়ের মধ্যে নারীর স্বর অশ্রুত থেকে গেছে, তার সমস্যা নিয়ে উপযুক্ত বিচার হয়নি।

নারীবাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত দ্বিমাত্রিক। প্রথমে, উপলব্ধ তত্ত্ব-কাঠামোর মধ্যে থেকে বেছে নিতে হবে একটি লাগসই কাঠামো। দ্বিতীয়ত, সেই কাঠামোর প্রয়োগস্থলকে প্রসারিত করতে হবে যাতে নারীর অভিজ্ঞতা ও তদ্বিষয়ক সমস্যাবলি তত্ত্বের পরিসরে সংযুক্ত হতে পারে। নারীবাদের এই কর্মসূচীকে বলা যায় 'অন্তর্ভুক্তির কর্মসূচী' যেখানে একটি প্রচলিত তত্ত্ব-কাঠামোর মধ্যে নারীবাদকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সিমোঁ দা বুভোয়া যেমন দেখাতে চেয়েছেন যে 'সেকেন্ড সেক্স'-এর সমস্যা অর্থাৎ নারীর সমস্যা এক্সিসটেনশিয়াল সমস্যা, অনুরূপভাবে আর একদল নারীবাদী দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে নারীর সমস্যা হল সাম্যের সমস্যা বা জাস্টিসের সমস্যা।

যাঁরা মনে করেন নারীবাদের সমস্যাগুলি মূলত জাস্টিস-বিষয়ক, তাঁদের অনেকেই মনে করেন, বর্তমান সমাজের উপযোগী জাস্টিসের সর্বোৎকৃষ্ট তত্ত্ব পাওয়া যায় জন রলসের (John Rawls 1921–2002) কাজে। তাই এঁদের চেষ্টা জন রলসের তত্ত্ব-কাঠামোকে নারীমুক্তির ছক হিসেবে কাজে লাগানো। নারীমুক্তির স্বরূপ কী এবং তা অর্জনের উপায় কী—এ সবই তখন নিরূপিত হয় রলসের তত্ত্বকাঠামোর নিরিখে। আমরা জানি যে রলসের তত্ত্ব-কাঠামো ইম্যানুয়েল কান্ট ও জন স্টুয়ার্ট মিলের তত্ত্বের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। রলসকে যাঁরা অনুসরণ করেন তাঁরা এথিক্সের ক্ষেত্রে এক ধরনের রাইট-বেসড এথিক্স বা ন্যায়-নীতি ভিত্তিক এথিক্স সমর্থন করেন। নারীবাদের এজাতীয় রলসীয় বিশ্লেষণ নিঃসন্দেহে সিমোঁ দ্য বুভোয়ার প্রকল্পের সঙ্গে তুল্য। অর্থাৎ এক্ষেত্রেও একটি প্রচলিত তত্ত্ব কাঠামোর মধ্যে নারীর সমস্যাকে আর পাঁচটা বিষয়ের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করার আর এক ধরনের প্রয়াস। জ্যানেট র‍্যাডক্লিফ

Scanned with

রিচার্ডস তাঁর 'দা স্কেপ্‌টিকাল ফেমিনিস্ট' বইতে এমনি এক কর্মসূচীর কথা বলেন যখন লেখেন—'ফেমিনিজম ইজ নট কনসার্নড উইথ এ গ্রুপ অব পিপল ইট ওয়ান্টস টু বেনিফিট, বাট উইথ এ টাইপ অব ইনজাসটিস ইট ওয়ান্টস টু এলিমিনেট'।[২]

তা হলে দেখা যাচ্ছে সিমোঁ দ্য বুভোয়া বা রিচার্ডস-এর মতো যে সব নারীবাদীরা অন্তর্ভুক্তির প্রকল্প বেছে নেন তাঁদের চোখে তত্ত্বের স্তরে কোনো লিঙ্গ-রাজনীতি নজরে পড়ে না। তত্ত্ব সর্বদাই লিঙ্গ-বর্জিত একটি বিশ্লেষণী হাতিয়ার, যার কাজ তথ্যকে বিন্যস্ত করা, ব্যাখ্যা করা এবং, সর্বোপরি, তাকে বোধগম্য করে তোলা। তথ্য ও তত্ত্বের এমন স্তরভেদ করে দাবি করা যায় যে, তত্ত্বের স্তরটি দেশকাল-বহির্ভূত একটি স্তর যার কোনো সাপেক্ষ ধর্ম নেই, আর তাই কোনো লিঙ্গ-পক্ষপাতও নেই। অর্থাৎ বলা যাবে না যে একটি তত্ত্ব 'পুরুষালী' বা তা 'মেয়েলী', বা কোনো তত্ত্ব 'বুর্জোয়া' বা কোনোটি 'শাহানশাহী'। যা কিছু সাপেক্ষতাজনিত দোষ তা তথ্যের স্তরে ঘটে। যেমন কোনো তথ্যের প্রতি বেশি নজর দেওয়া যেতে পারে, কোনোটির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা যায়, কোনো তথ্যকে অধিক মূল্য দিয়ে তার গুরুত্ব বাড়ানো যেতে পারে আবার কোনো তথ্যকে অগ্রাহ্য করে তাকে প্রান্তে বা মার্জিনে ফেলে রাখা যায়। এই মার্জিনে ফেলে রাখার প্রক্রিয়ার জন্য যে পরিভাষা এখন বহুলপ্রচলিত তা হল 'মার্জিনালাইজেশন'।

যে তথ্যকে গুরুত্ব কম দেওয়া হয় দেখা যায় যে তার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণও অবহেলিত হয়ে থাকে। এমন অনেক অবহেলিত বিষয় সনাক্ত হবার পর সেগুলি নিয়ে তত্ত্বের কূটকচালি শুরু হয়ে যায়। শুধু যে নারীবাদীরাই এমন সব অবহেলিত তত্ত্বকে চিহ্নিত করতে সাহায্য করছেন তা নয়। যে যে গোষ্ঠী সমাজে প্রান্তীয় স্থান অধিকার করে আছেন তাঁরাই তাঁদের অভিজ্ঞতার জগতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান, চান যে তাত্ত্বিকরা তাঁদের সমস্যার, বা তাঁদের দিক থেকে দেখা সমস্যার, বিচার করুন। এভাবে প্রতিনিয়ত বিশ্ব জুড়ে নতুন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাত্ত্বিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। পূর্বে যেমন আমরা হোমোসেক্সুয়াল-দের নিয়ে বা সমকামীদের নিয়ে বিশেষ তাত্ত্বিক আলোচনা দেখিনি অথচ এখন দেখতে পাচ্ছি পাশ্চাত্যের এথিক্স-এর পাঠক্রমের মধ্যে এই অবস্থানের আলোচনা ক্রমশ স্থান করে নিচ্ছে। নারীবাদীরাও দাবি করছেন যে লেসবিয়ানদের সমস্যা নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা হোক, আলোচনা হোক অ্যাবর্শন বা ভ্রূণনাশ নিয়ে। এই সব দাবির চাপে প্রচলিত তত্ত্বের

জাল বিস্তারিত হচ্ছে, প্রচলিত তত্ত্বের পরিধির মধ্যে নতুন নতুন তথ্যের সংযুক্তি ঘটছে। 'মেয়েদের সমস্যা' নামে চিহ্নিত তথ্য পাওয়ার পর দেখতে হবে কোন তত্ত্বের সাহায্যে তার পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দেওয়া যায়।

একটি তত্ত্ব-কাঠামো অপর একটি তত্ত্ব-কাঠামোর তুলনায় কেন গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে তার বহুমাত্রিক বিচার হয়ে থাকে। যেমন অপেক্ষাকৃত সহজ কাঠামো, অথবা অধিক যৌক্তিক কাঠামো, সর্বদাই বেশি আকর্ষণীয়। আবার সর্বদাই লক্ষ্য রাখতে হয় নির্বাচিত কাঠামোটি যেন প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসকে যৎসামান্য বিচলিত করে। কাঠামো নির্বাচনের সময় কিন্তু ভাবা হয় না নির্বাচিত কাঠামোটি লিঙ্গ-অনপেক্ষ কি না। মনে করা হয় তত্ত্ব-কাঠামোর প্রসঙ্গে এই প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক—কারণ কাঠামো সতত লিঙ্গ-অনপেক্ষ।

সব নারীবাদী অবশ্য এমন অন্তর্ভুক্তি বা 'ইনক্লুশনের' প্রকল্প সমর্থন করেন না। প্রথমত, তত্ত্ব আর তথ্যের এমন দ্বিকোটিক অবস্থান তাঁরা মানতে নারাজ। তাঁরা মানতে চান না যে তথ্য ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে প্রোথিত আর তত্ত্ব সদাই ইতিহাস-অনপেক্ষ। তাঁদের মতে সব তত্ত্বই দেশ-কাল-ঐতিহ্য-সাপেক্ষ। মানুষ তার প্রয়োজন-বুদ্ধি-শক্তি-জ্ঞান-সাপেক্ষে তত্ত্ব সৃজন করে। তত্ত্ব গড়ে ওঠে একটা বিশেষ যুগে, বিশেষ বিজ্ঞান-দর্শন ও ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপটে। আমাদের কনসেপ্টস বা ধারণা এবং ভাষা কোনোটাই এর ব্যতিক্রম নয়—এই সবই ইতিহাস-সাপেক্ষ। ফলে ন্যূনতম অর্থেও তত্ত্ব-কাঠামো কখনই অনপেক্ষ হতে পারে না। প্রশ্ন হচ্ছে তত্ত্ব-কাঠামোর ইতিহাস-সাপেক্ষতা মেনে নিয়েও কাঠামোর লিঙ্গ-অনপেক্ষতা বা জেন্ডার-নিউট্রালিটি দাবি করা যায় কি না। সিমোঁ দ্য বুভোয়া ও রিচার্ডস-এর মতো যাঁরা অন্তর্ভুক্তির কর্মসূচী গ্রহণ করেন তাঁরা বলবেন, করা যায়। ম্যাকির নীতিশাস্ত্রও তাই বলে। কিন্তু নারীবাদীদের মধ্যে একটা পাল্টা মতও আছে, এঁরা বলবেন নারীবাদের মূল কথা হল জেন্ডার বা লিঙ্গকে একটি স্বতন্ত্র ক্যাটিগরি বা ব্যাখ্যার মাত্রা হিসেবে স্বীকার করা। অর্থাৎ পদার্থ বিচার করার সময় আমরা যেমন তার দেশ, কাল, গুণ, কার্য-কারণ সম্পর্ক, ইত্যাদি মাত্রার নিরিখে বিচার করি তেমনি লিঙ্গকেও ব্যাখ্যার একটি মাত্রা বা ক্যাটিগরি অব ইন্টারপ্রিটেশন হিসেবে স্বীকার করতে হবে।)

আদিযুগ থেকে সমাজে স্ত্রী-পুরুষের ভূমিকা ভাগ হয়ে আসছে। এই বিভাজনের কারণ সবসময় এক নয়, বা বিভাজনের রূপও সর্বত্র এক নয়। ভূমিকা বিভাগের দরুন নারী ও পুরষের কাছ থেকে প্রত্যাশিত ব্যবহার, আবেগ, মনন ভিন্ন ভিন্ন হয়। বিভিন্ন

Scanned with

প্রত্যাশা পূরণ করতে গিয়ে নারী ও পুরুষের বিভিন্ন সৃজিত স্বরূপ তৈরি হয়। তা হলে দেখা যাচ্ছে নারী ও পুরুষের মধ্যে কিছু পার্থক্য জৈবিক—দেহের গঠন, প্রজনন ক্ষমতার প্রভেদ, ইত্যাদি। পরিভাষা ব্যবহার করে বলা যায় এই জৈবিক প্রভেদগুলি 'সেক্স ডিফারেন্স' বা যৌন-প্রভেদ। এই প্রভেদ ছাড়াও নারী-পুরুষে প্রভেদ আছে। সমাজের প্রত্যাশা পূরণ করতে গিয়ে নারী-পুরুষের যে প্রভেদ সৃজিত হয়, তা জেন্ডার ডিফারেন্স বা লিঙ্গ-প্রভেদ। নারীবাদের মাথাব্যথা মূলত এই লিঙ্গ-প্রভেদ ও তৎজনিত লিঙ্গ-রাজনীতির প্রশ্নকে ঘিরে, সেক্স ডিফারেন্স নিয়ে নয়।

প্রশ্ন হচ্ছে লিঙ্গ-প্রভেদের পটভূমি তত্ত্ব-কাঠামোকে প্রভাবিত করে কি না। যাঁরা অন্তর্ভুক্তির প্রকল্পের সমর্থক তাঁরা মনে করেন লিঙ্গ-প্রভেদ তত্ত্ব-কাঠামোকে প্রভাবিত করে না, আর যাঁরা এই মতের বিরোধিতা করেন, তাঁরা বলেন লিঙ্গ-বিভাজন তথা লিঙ্গ-প্রভেদ তত্ত্ব-কাঠামোকে প্রভাবিত করে, কারণ কোনো কাঠামোই লিঙ্গ-অনপেক্ষ হতে পারে না। যাঁরা মনে করেন তত্ত্ব-কাঠামো লিঙ্গ-অনপেক্ষ তাঁদের যুক্তি হল নারী-পুরুষ ব্যতিরেকে মানুষ বা হিউম্যান বলে একটা স্বতন্ত্র প্রকার বা ক্যাটিগরি আছে যার সামান্য-ধর্ম লিঙ্গ-অনপেক্ষ; তত্ত্ব-কাঠামো গড়ার সময় আমাদের সর্বদা চেষ্টা করতে হবে 'মানুষের' প্রেক্ষিত থেকে লিঙ্গ-সমস্যার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করতে, কোনো নারী বা কোনো পুরুষের প্রেক্ষিত থেকে নয়। তাঁরা বলেন, দর্শনের তাবৎ ধ্রুপদী তত্ত্বগুলিকে সচেতনভাবে লিঙ্গ-অনপেক্ষ রাখার চেষ্টা করা হয়। লিঙ্গ-অনপেক্ষতা বজায় রাখতে না পারাটা সর্বদাই স্খলন বলে গণ্য হয় এবং তা সবসময় সংশোধনযোগ্য।

বিপরীত পক্ষের মত হল মানবসমাজে লিঙ্গ-অনপেক্ষ 'মানুষ' বা 'হিউম্যান'-এর কোনো সামান্য-ধর্ম বাস্তবে নেই, যদিও এমন একটা ধর্মের ভ্রম আমাদের হয়ে থাকে। মনে করা হয় মানুষ একটি লিঙ্গ-অনপেক্ষ জীব এবং সে স্বরূপত বৌদ্ধিক বা র‍্যাশনাল। এই র‍্যাশনালিটি কতকগুলি অনন্য লজিকের নিয়ম দ্বারা চালিত হয়ে থাকে। যে নারীবাদীরা অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে কথা বলেন এবং জেন্ডার বা লিঙ্গকে ব্যাখ্যার একটি অপরিহার্য মাত্রা বলে স্বীকার করেন, তাঁরা মনে করেন মানুষ এমন 'আবেগময় জীব' বা 'ফিলিং অ্যানিমাল' নয়। দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, 'মানুষ যদি বৌদ্ধিক জীব হয়েও থাকে তার র‍্যাশনালিটি যে লজিকের অনন্য নিয়ম দ্বারা চালিত তাই বা কী করে প্রতিষ্ঠিত হল—র‍্যাশনালিটির সাধারণ ধর্ম কী দিয়ে ঠিক হয়?' লজিকে নানা

সিসটেমের প্রচলন আছে; এটা এখনও প্রমাণিত হয়নি যে সে সব সিস্টেমে একটি মৌলিক সাদৃশ্য আছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, মানুষের র‍্যাশনাল অ্যানিমাল হওয়ার বিষয়ে যেমন দ্বিমত আছে, তেমনি র‍্যাশন্যালিটির স্বরূপ কী সে সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। ফলে, মানুষের লিঙ্গ-অনপেক্ষ স্বরূপ যদি মেনেও নেওয়া যায় তবুও সেই স্বরূপটি কী সে বিষয়ে মতভেদ থেকে যাচ্ছে। অথচ তা সত্ত্বেও মানুষের বৌদ্ধিক স্বরূপকেই তার সামান্য-ধর্ম হিসেবে মেনে নেওয়ার একটা প্রচলন রয়েছে।

কিছু নারীবাদী মনে করেন মানুষের লিঙ্গ-অনপেক্ষ ধর্ম স্বীকার করার মধ্যেও কাজ করে যাচ্ছে একটা প্রচ্ছন্ন লিঙ্গ-রাজনীতি। কী করে লিঙ্গ-অনপেক্ষতার দাবিও লিঙ্গ-রাজনীতিরূপে ব্যাখ্যাত হতে পারে তার ইতিবৃত্ত কিঞ্চিৎ জটিল। এই মতানুসারে মানুষের দ্বারা কালচার সৃষ্ট হওয়ার পর তার কালচারে অবচ্ছিন্ন স্বরূপ বাদ দিয়ে আরো মৌলিক কোনো স্বরূপ থাকতে পারে না। আমরা যেহেতু সবসময় তাকে বুঝি কোনো কালচার অবচ্ছেদে, সেহেতু মানুষের অনপেক্ষ অবস্থানের প্রশ্ন ওঠে না। কালচার লিঙ্গ-পরিকীর্ণ। তা সত্ত্বেও লিঙ্গ-অনপেক্ষতা দাবি করাটা এক ধরনের লিঙ্গ-রাজনীতি। দ্বিতীয়ত, মানুষকে 'র‍্যাশনাল অ্যানিমাল' বলার ফলে মানুষের মধ্যে আরো একগুচ্ছ গুণ অনুস্যূত হয়ে থাকে বলে মনে করা হয়। যথা, যে জীব র‍্যাশনাল সে পক্ষপাতদুষ্ট নয়, সে সমদর্শী, সে দ্বান্দ্বিকতা-মুক্ত, অর্থাৎ তার সব সিদ্ধান্ত সব বীক্ষণদ্বার্থহীন হবে, সর্বোপরি সে রিজন বা যুক্তিকে সর্বোচ্চ নিয়ামক বিধি বা 'হাইয়েস্ট রেগুলেটিভ প্রিন্সিপাল'রূপে স্বীকার করবে। এও দাবি করা হয় যে আদর্শ পুরুষ হবে যুক্তিচালিত, পক্ষপাতমুক্ত, সে তার বাসনাকে যুক্তির নিয়ন্ত্রণে রাখবে এটাই প্রত্যাশিত।

'মানুষ র‍্যাশনাল'—এই মত যাঁরা পোষণ করেন দেখা যায় পাশাপাশি তাঁরা আর একটি মতও পোষণ করেন। তাঁরা মনে করেন পুরুষের ক্ষেত্রে সামাজিক শাসনের ফলে জন্মসূত্রে তার র‍্যাশনালিটির বিকাশ ঘটে, আর নারীর ক্ষেত্রে সামাজিক চাপে অথবা জন্মসূত্রে তার পালিকা-শক্তির স্ফুরণ ঘটে। প্রত্যাশা করা হয় যে, নারী হবে সন্তানবৎসল, তার থাকবে পালিকা-শক্তি, জীবনদায়িনী শক্তি এবং এই সৃজিত ভূমিকা পালন করতে গিয়ে যুক্তির তুলনায় আবেগই হবে তার প্রধান পাথেয়। এবার মানুষকে 'বৌদ্ধিক জীব' বা 'র‍্যাশনাল অ্যানিমাল' বলার মধ্যে দিয়ে পুরুষের সৃজিত/স্বরূপ ধর্মই মানুষের ধর্মরূপে অগ্রাধিকার পায় আর নারীর সৃজিত/স্বরূপ ধর্ম যেন অনেক বেশি জীবধর্মের কাছাকাছি বলে মনে করা হয়।

Scanned with

এই ব্যাখ্যায় দেখা যাচ্ছে যে মানুষের লিঙ্গ-অনপেক্ষ ধর্ম বলতে যা বোঝায় তা আসলে পুরুষের ধর্মের প্রতিফলন। পুরুষকে সমাজ শৈশব থেকে শেখায় বিমূর্ত যুক্তির চর্চা করতে, তালিম দেয় কী করে আবেগ সংবেগকে যুক্তির নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। আদর্শ পুরুষ হওয়ার অনুশীলন আর লিঙ্গ-অনপেক্ষ মানুষ হওয়ার তালিমের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই। অপরপক্ষে, সমাজ নারীকে শেখায় বিশেষের প্রতি আসক্ত হতে এবং নিজের আবেগ ও সংবেগকে মূলধন করে জটিল মানবিক সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে। যে নারী তার কাছে প্রত্যাশিত সৃজিত ভূমিকা পালনে সফল, তার পক্ষে লিঙ্গ-অনপেক্ষ 'মানুষের ভূমিকা' বা 'হিউম্যান রোল' পালন করাটা কষ্টসাধ্য। কারণ তার কাছে মানুষ হওয়ার সাধনা হয়ে দাঁড়ায় দ্বান্দ্বিকতার সাধনা, যার একদিকে চলে তার পালিকা-মূর্তির লালন অথবা অবদমন, আর অন্যদিকে চলে নৈর্ব্যক্তিক যুক্তির চর্চা। এই দ্বান্দ্বিকতা থেকে মুক্তি পাওয়ার একটি সহজ পথ রয়েছে, তা হল শ্রম বিভাজনের সহজ সমাধান মেনে নিয়ে বলা 'পুরুষের হাতে থাক নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্বের সাধনার দায়িত্ব আর নারীর থাক জীবনধাত্রীর দায়িত্ব।'

এই ব্যবস্থায় অসুবিধে একটাই—পুরুষের জানাটাই হয়ে দাঁড়াবে 'মানুষের' জানা। মোটামুটি দেখা যায় সব পিতৃতান্ত্রিক সমাজে এ জাতীয় শ্রম-বণ্টনের ব্যবস্থা কায়েমী হয়ে আছে। তত্ত্বসৃষ্টির ক্ষেত্র থেকে নারী হয় নির্বাসিত হয়েছে, নয় তার অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে। অন্তর্ভুক্তির ছাড়পত্র পেতে নারীকে তার পালিকা মূর্তি ত্যাগ করে নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্বের সাধনা করতে হয়েছে অর্থাৎ তাকে তার লিঙ্গ-স্বাতন্ত্র্য ত্যাগ করে লিঙ্গ-বর্জিত ভূমিকা পালনে সচেষ্ট হতে হয়েছে। পুরুষতন্ত্রে তত্ত্বসৃষ্টির জন্য পুরুষকে তার লিঙ্গ-স্বাতন্ত্র্য বর্জন করতে হয় না, কারণ পুরুষ-তন্ত্রে পুরুষের স্বাতন্ত্র্য নৈর্ব্যক্তিকতার চর্চার মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয়। তত্ত্বসৃষ্টির ক্ষেত্র থেকে নারী যেখানে নির্বাসিত সেখানে সে একাগ্রভাবে তত্ত্বরহিত সহজিয়া একটা সম্পর্কের জাল বুননের পটুত্ব অর্জন করেছে। সে নানা সম্পর্ক গড়ে তুলেছে তার জীবপালিনী বোধের ভিত্তিতে। দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও চর্চার ফলে সে আয়ত্ত করেছে এক অসাধারণ সহৃদয়তার, মহানুভবতার ক্ষমতা।

এই পিতৃতন্ত্রের তত্ত্বভূমির বাইরে থাকার অভিজ্ঞতা থেকে কিছু নারীবাদী গড়ে তুলতে চান এক বিকল্প তত্ত্বভূমি যার মধ্যে স্থান পাবে নারীর দীর্ঘদিনের 'জেন্ডার আইডেন্টিটি' বা লিঙ্গ-স্বরূপের ফসল এবং পুরুষের যুক্তি-নির্ভর তত্ত্বের অভিজ্ঞতা।

তাঁরা আশা করেন যে এই নতুন তত্ত্বভূমি থেকে সৃজিত হবে এক নতুন ধরনের 'জেন্ডার আইডেন্টিটি'। এই নারীবাদের উদ্দেশ্য সমাজ-প্রদত্ত বিভিন্ন সৃজিত সত্তা থেকে মুক্তি পাওয়া নয়। তাঁরা স্বীকার করেন যে সত্তা সৃজনের প্রক্রিয়াটি কালচার সৃজনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একবার মানুষ কালচার সৃষ্টি করার পরে কিছুতেই আর আদিম অবস্থায় ফিরে যাওয়ার ব্রত নিতে পারে না। লিঙ্গ-রাজনীতি যেমন কালচারের ফসল তেমনি এই লিঙ্গ-বৈষম্য থেকে মুক্তির পথও এই কালচারের মধ্যে থেকেই খুঁজতে হবে। এই নতুন ব্যবস্থায় লিঙ্গ-সৃজন থেকে যাবে, কিন্তু লিঙ্গ-বৈষম্য থাকবে না। এর জন্য চাই কিছু নতুন আচরণবিধি—একটা নতুন এথিক্স। এমনই এক নতুন এথিক্স-এর নাম দেওয়া হয়েছে 'কেয়ার-বেসড এথিক্স' বা 'দরদী-নৈতিকতা'।

গোড়াতে আমরা নারীবাদকে মোটামুটিভাবে দু'ভাগে ভাগ করেছিলাম। বলেছিলাম, একদল মনে করেন তত্ত্ব-ভূমিকে লিঙ্গ-বর্জিত রূপ দেওয়া যায় এবং দেওয়া উচিত-ও, আর একদল মনে করেন কোনো তত্ত্ব-কাঠামো লিঙ্গ-বর্জিত নয়—সুতরাং কোনো তত্ত্ব-কাঠামো লিঙ্গ-অনপেক্ষ এমন দাবি করাটা তঞ্চকতা। প্রথম দল মনে করেন নারীবাদের কর্মসূচী হওয়া উচিত প্রতিষ্ঠিত কোনো তত্ত্ব-কাঠামোকে নারীবাদের সমস্যা-সমাধানে কাজে লাগানোর। দ্বিতীয় দল মনে করেন সব প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব-কাঠামো পুরুষতন্ত্রের সমর্থনপুষ্ট, তাই সব প্রতিষ্ঠিত কাঠামোই নারীবাদের সমস্যা সমাধানে অযোগ্য। কেয়ার-বেসড এথিক্স যাঁরা করেন তাঁরা মনে করেন যে নতুন করে সুপরিকল্পিত লিঙ্গ-সাপেক্ষ তত্ত্ব-কাঠামো সৃষ্টি করতে হবে।

এথিক্সের অনুষঙ্গে তত্ত্ব-কাঠামো নিয়ে এমন নতুন করে চিন্তা-ভাবনার খোরাক আমরা ক্যারল গিলিগানের (Carol Gilligan 1936–) কাজে পাই। গিলিগান বর্তমানে মার্কিন দেশে হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এডুকেশনের অধ্যাপিকা। তাঁর মূল গবেষণার কাজ সাইকোলজিকাল থিওরিকে ঘিরে। তিনি দেখতে চান এই থিওরিতে মেয়েদের কোনো বিশেষ অবদান আছে কিনা। বিশেষ করে বয়ঃসন্ধিকালে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নৈতিক বিচার-বিতর্কের পটুত্বের পার্থক্য নিয়ে অনুসন্ধান করেন তিনি। ক্যারল গিলিগান মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বের এক নতুন রূপরেখার ইঙ্গিত দিয়েছেন মাত্র, পূর্ণাঙ্গ একটি সিস্টেমের রূপ আমরা এখনও পাইনি। তাঁর কাজ এবং তাঁর অনুগামীদের কাজ থেকে এটুকু স্পষ্ট হয়েছে যে তাঁরা কোনো প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব-কাঠামোর সাহায্য নিতে চান না। তাঁরা সোচ্চারে ঘোষণা করেন তাঁদের নির্দিষ্ট পূর্বপক্ষ কারা।

Scanned with

গিলিগান যেহেতু এথিক্স এবং মনোবিদ্যায় সমান পারদর্শী তাঁর কাজে আমরা উভয় শাস্ত্রের প্রতিফলন দেখি। তিনি একই সঙ্গে বাস্তব সমীক্ষা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সাহায্য নিয়ে থাকেন। মনোবিজ্ঞানীদের এক বৃহৎ অংশ ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব-কাঠামোর সাহায্যে বিভিন্ন সমীক্ষণের তথ্য ব্যাখ্যা করে থাকেন। গিলিগান মনে করেন ফ্রয়েডের (Sigmund Freud 1856–1939) তত্ত্ব-কাঠামো স্পষ্টতই পুরুষতন্ত্রের সমর্থনপুষ্ট। বিশেষত যখন এই তত্ত্ব-কাঠামোর সাহায্যে ছাত্র-ছাত্রীদের 'অ্যাডোলেসেন্স' বা বয়ঃসন্ধিক্ষণে নৈতিক বিচারের পরিপক্কতা বিচার করা হয়, তখন দেখা যায় ফ্রয়েডের ব্যাখ্যা একপেশে ও নারীর প্রতি অশ্রদ্ধাজ্ঞাপক। ফলে, মনোবিদ্যার অনুষঙ্গে ফ্রয়েডীয় মতবাদ হল গিলিগানের অন্যতম পূর্বপক্ষ। ফ্রয়েডীয় মতবাদের সঙ্গে পরোক্ষভাবে অনুস্যূত হয়ে আছে রলসের 'রাইট-বেসড' বা 'জাস্টিস-বেসড এথিক্স', যার আর এক নাম দেওয়া যায় 'ন্যায়নিষ্ঠ নৈতিকতা'। গিলিগান এই জাতীয় নৈতিকতার মধ্যেও পুরুষতন্ত্রের সমর্থন দেখতে পান আর তাই রলসীয় নীতিশাস্ত্র হয়ে ওঠে তাঁর আর এক পূর্বপক্ষ। ফ্রয়েডের সঙ্গে গিলিগানের মতান্তর ঠিক কী নিয়ে তা বিশদ আলোচনাসাপেক্ষ, একইভাবে 'ন্যায়নিষ্ঠ নৈতিকতা'র সঙ্গে গিলিগানের বিরোধ কোথায় তা এককথায় বলা কঠিন। তবে একটা ঐতিহাসিক তথ্য জানা থাকলে বোঝা যায় গিলিগান কখন, কী প্রসঙ্গে, ফ্রয়েড ও রলসের পান্টা মত পোষণ করতে শুরু করেন।

গিলিগানের দরদী-নীতিশাস্ত্র বা 'কেয়ার-বেসড এথিক্সের' সূত্র-সন্ধানে আমাদের ফিরে যেতে হবে ১৯৮৩ সালে যখন গিলিগান যুগ্মভাবে তাঁর হারভার্ডের সহকর্মী লরেন্স কোলবার্গের (Lawrence Kohlberg) সঙ্গে একটি সমীক্ষা করেন। সমীক্ষাটি হয়েছিল কতিপয় অ্যাডোলেসেন্ট ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে। তাদের একটি সমস্যার সমাধান করতে দেওয়া হয়। প্রত্যেকের দেওয়া সমাধানের ভিত্তিতে ছাত্র-ছাত্রীদের মূল্যায়ন করে দেখা হয় তাদের কার নৈতিক বিচার কতটা পরিণত। দেখা গেল কোলবার্গের মূল্যায়নের সঙ্গে গিলিগানের মূল্যায়নের বিস্তর ব্যবধান। কোলবার্গের বিচারে ছাত্ররা ছাত্রীদের তুলনায় অনেক পরিণত বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিল। কারণ ছাত্রদের বিচারে বোঝা গেল তারা বিমূর্ত তাত্ত্বিক মূল্যায়নে ছাত্রীদের তুলনায় কুশলী। কোলবার্গের মনে হল তুলনামূলকভাবে ছাত্রীদের বিচার অপরিণত, দ্বিধাগ্রস্ত ও তত্ত্বরহিত। কোলবার্গের মূল্যায়ন গিলিগানের মনঃপূত হয়নি। তিনি ছাত্র এবং ছাত্রীদের দেওয়া

সমাধানের পার্থক্য পৃথকভাবে মূল্যায়ন করলেন। তাঁর মনে হল ছাত্রীদের দেওয়া সমাধানের মধ্যে একটা সাদৃশ্য আছে, আর ছাত্রদের দেওয়া সমাধানের মধ্যেও সাদৃশ্য আছে যা ছাত্রীদের দেওয়া সমাধানের সঙ্গে খাপ খায় না। এর থেকে গিলিগানের মনে হয়েছে নৈতিক বিচার লিঙ্গ-অনপেক্ষ নয়। সমাজে নারী-পুরুষের লিঙ্গ-স্বরূপ বা জেন্ডার আইডেন্টিটি ভিন্ন ভিন্ন আদলে সৃজিত হয়। এই পার্থক্যের প্রতিফলন আমরা নারী-পুরুষের নৈতিক বিচারে লক্ষ্য করি। এতদিন যাবৎ একটা প্রচলন ছিল পুরুষের করা নৈতিক বিচারধারাকে পরিণত মনে করার; আর নারীর করা বিচারধারাকে অপরিণত মনে করার; গিলিগান মনে করেন নারী ও পুরুষের নৈতিক বিচারকে যথাক্রমে অপরিণত এবং পরিণত বলার পেছনে বিশেষ এক ধরনের পুরুষতন্ত্র কাজ করছে। যদি নৈতিক বিচারের 'ক্রাইটেরিয়া' বা মাপকাঠি বদল করা হয়, যদি নৈর্ব্যক্তিক তাত্ত্বিক বিচারের মাপকাঠিকেই একমাত্র পরিণত মানদণ্ড মনে না করা হয়, তাহলেই ছাত্র এবং ছাত্রীদের করা নৈতিক বিচারের ফলাফলের আর-এক রকম মূল্যায়ন হবে।

ছাত্র-ছাত্রীদের নৈতিক বিচারের পরিপক্কতা মূল্যায়নের জন্য কোলবার্গ ও গিলিগান যে নৈতিক সমস্যাগুলি নিয়ে সমীক্ষা চালান তার একটি এইরূপ—হাইনজ নামে একটি লোকের স্ত্রী অসুস্থ, হাইনজের ওষুধ কেনার ক্ষমতা নেই এবং দোকানদার ওষুধের দাম কম করতে রাজি নয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এ ক্ষেত্রে হাইনজের কি ওষুধ চুরি করাটা ঠিক হবে? দেখা গেল এই সমস্যার সম্মুখীন হয়ে ছাত্ররা প্রথমেই এই সমস্যাটিকে একটি বিশেষ সমস্যা হিসেবে না দেখে বিচার করতে বসল এই সমস্যাটি কোন কোন নৈতিক আদর্শের সংঘাতের ফলে দেখা দিচ্ছে। তারা মনে করল এ স্থলে একাধিক নৈতিক অনুজ্ঞা বিচার্য, যেমন 'চুরি করিও না' 'জীবহত্যা করিও না', 'মানুষের জীবন রক্ষা করিবে' এবং এমনই আরো অনুজ্ঞা। নানা অনুজ্ঞার অবতারণার পর অবশেষে ছাত্ররা সমস্যাটিকে একটি সাদামাটা দ্বিকল্পানুমান বা ডাইলেমার আকারে সাজিয়ে ফেলল। তারা মনে করল 'সৎ পথে চলা' ও 'জীবন রক্ষা করা' এই দুই আদর্শের দ্বান্দ্বিকতাই এই সমস্যার জন্য দায়ী। এরপর তারা চেষ্টা করল যুক্তির সাহায্যে এই দুই অনুজ্ঞার মধ্যে একটিকে অধিকতর ইষ্টপ্রদায়ী বলে প্রতিষ্ঠা করতে। অনুজ্ঞাগুলির তুল্যমূল্য বিচার করে তারা মনে করল জীবনরক্ষার দায়িত্বটি আর সব দায়িত্বকে ছাপিয়ে যাচ্ছে, অতএব স্ত্রীকে বাঁচানোর জন্য হাইনজের চুরি করাটা অনৈতিক হবে না।

Scanned with

এই সমীক্ষায় ছাত্রীরা দ্বিকল্পানুমান নিরসনের পথে না গিয়ে সমস্যাটির নানা সম্ভাব্য সমাধানের কথা ভাবতে থাকে। একটি ছাত্রী চিন্তা করতে লাগল যদি হাইনজ ওষুধ চুরির দায়ে হাজতে যায় তবে তার অসুস্থ স্ত্রীর পাশে কেউ থাকবে না—ফলে নৈতিক সমাধান খোঁজার সময় এই সম্ভাব্য পরিস্থিতির কথাও ভাবা দরকার। একটি ছাত্রী এমনও পরামর্শ দেয় যে ওষুধের দোকানে ওষুধের দাম কম করার অনুরোধ পুনরায় করা যেতে পারে, অথবা সকলের কাছে চাঁদা তুলে ওষুধের খরচ মেটানোর চেষ্টা করা যেতে পারে। ছাত্রীরা নানা পরামর্শ দিল, অথচ তারা কোনো নির্দিষ্ট নৈতিক সমাধানের সপক্ষে রায় দিল না। এর ফলে কোলবার্গের মনে হয়েছে যে ছাত্রীদের নৈতিক বিচার-বোধ অপরিণত, দ্বিধাগ্রস্ত—তারা কেউই রুখে দাঁড়িয়ে প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতার প্রতিস্পর্ধী মত ব্যক্ত করেনি। কোলবার্গের মতে তারা সর্বদাই সমস্যার মূল জায়গাটা এড়িয়ে যাচ্ছে। ছাত্রীরা যেন বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছেও তাদের শৈশব কাটিয়ে উঠতে পারেনি, পারেনি নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্বের প্রয়োগ আয়ত্ত করতে।

এই সমীক্ষায় কোলবার্গের মূল্যায়ন গিলিগানকে ভাবিয়ে তোলে। গিলিগান ভাবতে শুরু করেন এমন কি হতে পারে না যে কোলবার্গ এক বিশেষ মাপকাঠি দিয়ে ছাত্র-ছাত্রী উভয় গোষ্ঠীকে বিচার করছেন অথচ লক্ষ্য করছেন না যে একজন পরিণত পুরুষ যেভাবে তার পরিণত লিঙ্গ-স্বরূপ বা 'অ্যাডাল্ট মেল আইডেন্টিটি' প্রতিষ্ঠা করে একজন পরিণত নারী সেভাবে তার পরিণত লিঙ্গ-স্বরূপ বা 'অ্যাডাল্ট ফিমেল আইডেন্টিটি' প্রতিষ্ঠা করে না? বয়ঃসন্ধি থেকেই ছাত্ররা ক্রমশ চেষ্টা করে নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্ব প্রয়োগে পটুত্ব অর্জন করতে। ফলে তাদের পরিণতি মাপা যেতে পারে নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্বে তাদের অধিকারের নিরিখে। অপরপক্ষে, বয়ঃসন্ধি থেকে ছাত্রীরা প্রস্তুত হয় মাতৃত্বের ভূমিকা পালনের জন্য। তারা সব সমস্যাকে আরো অনেক ব্যক্তিগত পর্যায়ে ভাবে—নিছক কতকগুলি নৈর্ব্যক্তিক নীতির নিরিখে তারা কোনো সমস্যাকে ভাবতে চায় না। কারণ জীবপালিনীর ভূমিকা পালন করতে গিয়ে তাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা হল এই যে, সব সমস্যাকে একটা তত্ত্ব-কাঠামোর আওতায় এনে সমাধান খুঁজলে ব্যক্তিগত স্তরে পারস্পরিক সম্পর্ক হয়ে যায় অনেক বেশি কৃত্রিম ও যান্ত্রিক। সব নৈতিক সমস্যা যখন জীবন্ত সম্পর্ক-নির্ভর তখন জীবজগতের বিভিন্নতা বিস্মৃত হয়ে বা মুলতুবি রেখে এক বিমূর্ত স্তরে সমাধান খুঁজলে তা কখনই মানবিক হবে না।

এখানে বলে রাখা ভাল গিলিগান ও তাঁর অনুগামীরা মানুষের কোনো পূর্বনির্ধারিত সামান্য-ধর্ম স্বীকার করেন না। তিনি বলবেন না 'মানুষ মাত্রই র‍্যাশনাল অ্যানিমাল'। গিলিগান অবশ্য নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্ব-কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্ব-কাঠামো মাত্রই বাতিল করেন না। তিনি মনে করেন পুরুষতন্ত্রের দীর্ঘ ইতিহাসে পুরুষের লিঙ্গ-স্বরূপ যেমন একটি তাত্ত্বিক ভাবমূর্তিতে তৈরি হয়েছে তেমনি নারীর লিঙ্গ-স্বরূপও এক সহজিয়া বাৎসল্যের ভাবমূর্তিতে তৈরি হয়েছে। এই দ্বিকোটিক বিভাজনের ফলে নারী পেয়েছে বিভিন্ন সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার এক বিশেষ দায়িত্ব, সে অর্জন করেছে এক বিশেষ পটুত্ব। যুগে যুগে পিতৃতন্ত্রের মধ্যে থেকে এই ভূমিকা পালন করতে গিয়ে নারীর অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হয়েছে, তার একটা নারীসুলভ পরিপ্রেক্ষিত গড়ে উঠেছে। এই অভিজ্ঞতাকে, এই পরিপ্রেক্ষিতকে, তুচ্ছ করা বা অপরিণত মনে করার পেছনে কাজ করে যাচ্ছে পুরুষতন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিত। নারীর অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব না দেওয়ার ফলে—বা তার অভিজ্ঞতা নৈতিক তত্ত্ব-ভূমিতে প্রতিফলিত না হওয়ার ফলে—মানবসভ্যতা বঞ্চিত হচ্ছে। সমাজ তার কালচারের মাধ্যমে নারীকে যে মাতৃত্বের দায়িত্ব, প্রতিপালনের দায়িত্ব, সংরক্ষণের দায়িত্ব ও সহমর্মিতার দায় দিয়েছে তা সমৃদ্ধতর কালচারে, পুরুষতন্ত্র-মুক্ত সমাজে নারী-পুরুষ উভয়ের দায়িত্ব হওয়া উচিত।

স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে, ইতিপূর্বে তথাকথিত পুরুষ-তন্ত্রে পুরুষ কি সন্তান পালন, সংরক্ষণ ও সহমর্মিতার দায় পালন করেনি? আরো নৈর্ব্যক্তিক পরিভাষায় প্রশ্নটা এভাবে করা যায়, পুরুষ-তন্ত্রে কি 'ডিপেন্ডেন্ট রিলেশন' বা পরাশ্রয়ী সম্পর্ক নিয়ে কোনো নির্দেশনামা নেই? কেয়ার বা দরদের অনুশীলন কি কেবল নারীর চর্চার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল? অবশ্যই তা নয়। তবে কেয়ার-বেসড এথিক্সের সাহায্যে নারীবাদের মধ্যে দিয়ে কী বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে চাইছেন গিলিগান? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে আমাদের প্রথমে গিলিগানের পূর্বপক্ষের অবস্থানটা জেনে নেওয়া প্রয়োজন।

কোলবার্গ যখন পরিণত নৈতিক বিচারের মান হিসেবে নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্ব-কাঠামো প্রয়োগের পটুত্বকে স্বীকার করেন তখন বোঝা যায় তিনি নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্বের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। পাশ্চাত্য দর্শনে এই ঐতিহ্য চলে আসছে প্লেটো—অ্যারিস্টটলের সময় থেকে। অ্যারিস্টটল মানুষের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলছেন

Scanned with

'ম্যান ইজ এ র‍্যাশনাল অ্যানিমাল'। পাশ্চাত্য দর্শনে তথা কালচারের দীর্ঘ ইতিহাস পেরিয়ে এসে ১৯৮৩-তে যখন কোলবার্গ হারভার্ডে বসে পরিণত নৈতিক মানদণ্ড হিসেবে পুনরায় রিজন ও তার আনুষঙ্গিকে তত্ত্বকাঠামোর প্রয়োগের সঙ্গে মানুষের প্রাজ্ঞতার অনুপাত কষছেন তখন হারভার্ডের আর এক দিকপালের কথা স্মরণ না করে পারা যায় না। তিনি হলেন 'থিওরি অব জাস্টিস'-এর লেখক জন রলস। নৈতিক প্রয়োগ কতটা পরিণত তা নির্ণয়নের জন্য কোলবার্গ যে মানদণ্ড ব্যবহার করছেন তা স্পষ্টতই রলসের মূল বক্তব্যের অনুসারী।

রলস মনে করেন নৈতিকতার মূল সমস্যাটি জাস্টিসের সমস্যা বা ন্যায়-পরায়ণতার সমস্যা। মানুষ 'র‍্যাশনালিটি ম্যাক্সিমাইজার' অর্থাৎ—মানুষমাত্রই চায় পূর্ণমাত্রায় যৌক্তিক হতে। যুক্তির অভাব বা যুক্তির স্খলন মানুষকে বিব্রত করে। যৌক্তিকতার প্রধান লক্ষণ দ্ব্যর্থহীন স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা। তাই মানুষ চায় দ্ব্যর্থহীনভাবে ন্যায়-অন্যায় বিচার করতে। রলস তাঁর তত্ত্ব সাজিয়েছেন আধুনিক মার্কিনি দুনিয়ার প্রেক্ষাপটে, অধুনা অবশ্য এই প্রেক্ষাপট বিশ্বময় প্রসারিত, যার ফলে মার্কিন দেশে যা লাগসই তা প্রতীচ্যেও সমাদৃত।

রলসের ভাবনায় মানবসমাজে ব্যষ্টিই প্রধান। নৈতিক অনুষঙ্গে ব্যক্তি সমষ্টির কথা ভাবতেও পারে, না-ও পারে। উৎকট ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা যে মনস্কতাকে প্রশ্রয় দেয় তা ভয়াবহ ও কখনও কখনও আত্মঘাতী, কারণ মানুষ হয়ে ওঠে চূড়ান্তভাবে একে অপরের প্রতিযোগী। মানুষ তখন তার স্বার্থরক্ষার্থে কিছু রক্ষাকবচ তৈরি করে ফেলে। এই প্রয়োজনে কয়েকটি চুক্তির আশ্রয় নিতে হয়, কারণ, মানুষের পরানুভবতার ওপর ভরসা করা যায় না। সে অপরের ওপর ঔদার্য দর্শাতেও পারে, না-ও পারে।

বিভিন্ন চুক্তির মাধ্যমে মানুষকে অন্তত কিছুটা সহযোগী করে তোলা যায়। চুক্তিবদ্ধ হওয়ার সময় তাদের লক্ষ্য থাকে কী করে ভোগ্য পণ্যের উপভোগ বাড়ানো যায়। তবে, অবশ্যই এই প্রাপ্তিকে ন্যায্য হতে হবে। এই সঙ্গে মানুষ চায় তার অধিকারের পরিধিকে বাড়াতে, আর চায় জনকল্যাণের প্রাপক হতে। এইসব প্রাপ্তিকেই তারা আদর্শানুগ প্রাপ্তিরূপে পেতে চায়—সে আদর্শ স্বার্থসিদ্ধির হতে পারে, অথবা নৈর্ব্যক্তিক নৈতিকতার আদর্শ হতে পারে। রলস মনে করেন আদর্শ একবার নির্বাচিত হলে তা থেকে আর নড়চড় করা যাবে না, এমনকি ভবিষ্যতে সে

আদর্শ নিজের স্বার্থের বিপক্ষে গেলেও না। এইভাবে স্বার্থকেন্দ্রিকতা, প্রতিযোগিতা ও চুক্তির মধ্যেও রলস আদর্শের একটা ন্যূনতম রূপ টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন। সবদিক বিচার করে গোড়ায় চুক্তি তৈরি করতে হবে, চুক্তি করার পরে ভাবলে চলবে না।

রলস মনে করেন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্পর্ক দু ধরনের হতে পারে, হয় সে সম্পর্ক হবে চুক্তিভিত্তিক, নয় তা হবে উচ্চ-অনুচ্চ বা হাইয়ারারকিকাল সম্পর্কভিত্তিক। ভালবাসা, প্রেম, সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ব, বাৎসল্য আদি সম্পর্কগুলিও এর ব্যতিক্রম নয়। এই মতের সঙ্গে অন্তর্ব্যাপ্ত হয়ে আছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের একটি বিশেষ ধারণা। মনে করা হয় প্রতিটি মানুষ দেহে ও মনে স্বতন্ত্র—মানুষ অপরের সঙ্গে যুক্ত হয় তার স্বাতন্ত্র্যকে আরো শাণিত করার উদ্দেশ্যে। সভ্যতার মহাসিন্ধুতে যেন এক-একটি নিটোল বিন্দু এসে যুক্ত হয়েও তার স্বাভিমান হারায় না। এমন নয় যে প্রতিটি বিন্দু অপর বিন্দুকে ভর করে অপরের কাছ থেকে রসদ গ্রহণ করে নিজে টিকে থাকে। প্রতিটি মানুষের একটি মৌলিক স্বাতন্ত্র্য আছে যেখান থেকে গড়ে ওঠে তার ব্যক্তিত্ব—সে পরিবেশ থেকে রসদ চয়ন করে তার ইচ্ছে ও প্রয়োজন অনুযায়ী। প্রতিবেশী ও প্রতিবেশের সঙ্গে তার সম্পর্ক বাহ্যিক, আত্মিক নয়। এই অবস্থানের সমর্থন আমরা ম্যাকির নীতিশাস্ত্রেও পাই।

কোনো নির্বাচিত কর্মপন্থাকে নৈতিকতার মর্যাদা দিতে গেলে তাকে কোনো নীতি বা প্রিন্সিপলের আদলে সাজাতে হবে এবং এই নীতির পৌনঃপুনিকতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অর্থাৎ প্রতিটি অনুরূপ স্থলেই যেন এই নীতি বজায় থাকে। এই মতের ঝোঁকটা ব্যষ্টি-স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে সমষ্টি জীবনকে যতদূর সম্ভব নীতির নিগড়ে বাঁধার দিকে। এর ফলে সমষ্টি-জীবন সুশৃঙ্খল হয় বটে, কিন্তু তাতে কোনো প্রাণের ছোঁয়া থাকে না। এই মতে সমষ্টি জীবনের আপেক্ষিকতাকে সর্বতোভাবে সীমিত করার প্রয়াস থাকে। সমাজ জীবনের আপেক্ষিকতাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সমষ্টি-জীবনের নীতিকে নিতান্ত অনপেক্ষ করে তোলার ঝোঁক প্রবল।

নৈতিকতার লিঙ্গ-অনপেক্ষ কাঠামোর মধ্যে থেকে নারীবাদের কর্মসূচীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা যাঁরা করছেন তাঁদের মধ্যে আছেন অমর্ত্য সেন, মার্থা ন্যুসবম রুথ আনা পাটনাম প্রমুখ। এঁরা কোলবার্গের মতো বলেন পুরুষ ও নারীর নৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়াটা অনেক সময় আলাদা হয়। পুরুষ যেমন স্পষ্ট

Scanned with

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, নারী প্রায়শ নৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত। তাঁরা মনে করেন না যে এর মূলে রয়েছে পুরুষ ও নারীর ক্ষমতার প্রভেদ, বরঞ্চ বলা যায় এর জন্য দায়ী নারী-পুরুষের প্রশিক্ষণের প্রভেদ, সুযোগের প্রভেদ। পরিবেশজনিত কারণে পুরুষ অধিক আগ্রাসী ও প্রতিযোগী, নারী অবলা ও মাতৃবৎসল। নারী আরো স্বনির্ভর হয়ে উঠলে তার তত্ত্বে অধিকার বাড়বে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য অর্জন, যৌক্তিক উৎকর্ষ প্রদর্শন, ভোগ্যবস্তুর উপভোগ বৃদ্ধি, এগুলি মানুষের কাছে প্রেয় এবং শ্রেয় দুই-ই—তা সে মানুষ পুরুষ হোক বা নারী-ই হোক। মানুষের নৈতিকতায় কোনো নারী-পুরুষ প্রভেদ নেই। ন্যুসবম তাই এক সার্বিক 'হিউম্যান ফর্ম অব লাইফ' বা মানব জীবন-যাপনের প্রেক্ষাপটের কথা বলেন।

একটি 'হিউম্যান ফর্ম অব লাইফ' গিলিগান সাগ্রহে স্বীকার করবেন। তিনি দাবি করবেন এমন ফর্ম অব লাইফ বা জীবন-যাপনের প্রেক্ষাপট কখনই অভিজ্ঞতা-অনপেক্ষ বা 'এ প্রয়োরাই' (a priori) প্রেক্ষাপট হতে পারে না, একে অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষই হতে হবে। এই অভিজ্ঞতা পুরুষ ও নারী উভয়ের সম্মিলিত অভিজ্ঞতা না হলে তা হিউম্যান হতে পারে না—তা তখন একপেশে হতে বাধ্য। পিতৃতন্ত্রে পুরুষ ও নারীর অভিজ্ঞতা ভিন্ন। এই ভিন্নতা ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে গিলিগান তাঁর "এক্সিট ভয়েস—ডাইলেমাস ইন অ্যাডোলেসেন্ট ডেভেলপমেন্ট"[৩] প্রবন্ধে এ. ও. হার্শম্যান-এর একটি সমীক্ষার সাহায্য নিয়েছেন। হার্শম্যান ১৯৭০-এ "এক্সিট ভয়েস অ্যান্ড লয়েলটি", শিরোনামে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন। হার্শম্যান বলেছেন একটি সামাজিক সংগঠনের সদস্যরা দু-ভাবে কোনো নীতির প্রতি অসম্মতি জানাতে পারেন। তাঁরা হয় সংগঠন থেকে 'এক্সিট' বা বেরিয়ে যাওয়ার পথ বেছে নিতে পারেন অথবা ভেতরে থেকে প্রতিবাদ করতে পারে। যেমন একটি ধ্রুপদী বাজারি অর্থনীতিতে একজন খদ্দের যদি একটি সামগ্রী নিয়ে অসন্তুষ্ট হন তিনি নীরবে অপর একটি বিকল্প সামগ্রী খরিদ করতে পারেন। এই প্রক্রিয়ায় গড়ে ওঠে একটি নীরব নৈর্ব্যক্তিক বর্জনের প্রক্রিয়া যা এক ধরনের গোপন ভোটের সঙ্গে তুল্য। কেউ জানল না কে বা কারা সামগ্রীটি বর্জন করল। যারা প্রতিবাদ করল তারাও পরস্পরের সঙ্গে সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ করেনি।

অসম্মতির অপর একটি বিকল্প পথও রয়েছে, সেটি 'ভয়েস' বা 'সোচ্চার' প্রতিবাদের রাস্তা। হার্শম্যান লয়েলটি বা আনুগত্যের সঙ্গে প্রশ্নটিকে জড়িয়ে একটি

নতুন মাত্রা দিলেন। যাঁরা নীরবে চলে যান তাঁরা যে সংগঠন থেকে চলে যান তার প্রতি কোনো আনুগত্য অনুভব করেন না। যাঁরা সোচ্চার প্রতিবাদ করেন তাঁরা অসন্তোষ প্রকাশ করেন, এঁরা পরিবর্তন চান, কিন্তু সংগঠনের মধ্যে থেকেই প্রতিবাদ করতে চান। সংগঠনের প্রতি তাঁদের আনুগত্য আছে বলে তাঁরা সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে চান না—সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে থাকতে চান। তাহলে আমরা হার্শম্যানের সমীক্ষা থেকে অসম্মতির দুটি বিকল্প পাচ্ছি—একটি নীরবে সরে যাওয়ার বিকল্প আর অপরটি সরবে প্রতিবাদ করে ভেতরে থাকার বিকল্প।

গিলিগান মনে করছেন এই দুই বিপরীত পথ যেন দুই বিপরীত অভিজ্ঞতা-প্রসূত। উনি এও মনে করেন যে বয়ঃসন্ধিতে এই অভিজ্ঞতার বৈপরীত্য অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। ছেলেরা বয়ঃসন্ধিতে তাদের স্বাতন্ত্র্য, তাদের স্বাভিমান প্রতিষ্ঠা করতে চায় পরিবার থেকে বেরিয়ে নিজের জগৎ তৈরি করে। এ যাবৎ শিশু অবস্থায় তাদের মায়ের ওপর তাদের যে নির্ভরশীলতা ছিল তার থেকে তারা বেরিয়ে আসতে চায়—এর জন্য তারা বিকল্প মূল্য-কাঠামো, বিকল্প জীবন-প্রণালী বেছে নেয়। একটি অবস্থাকে অস্বীকার করে আর একটি বিকল্প অবস্থাকে তারা স্বীকার করে নীরবে এবং অনেকটা যেন স্বাভাবিকভাবেই। তাদের এই প্রতিবাদ তথা উত্তরণ হার্শম্যানের 'এক্সিট'-এর কৌশলের সঙ্গে তুল্য।

বয়ঃসন্ধিক্ষণে কন্যা-সন্তানের অভিজ্ঞতা পুত্র-সন্তানের অভিজ্ঞতা থেকে কিন্তু ভিন্ন। পরিবারের সম্পর্ক অস্বীকার করে বৃহত্তর পটভূমিতে তার স্বাতন্ত্র্য, তার স্বাভিমান প্রতিষ্ঠার সুযোগ, পিতৃতন্ত্র তাকে দেয়নি। তাছাড়া বয়ঃসন্ধিতে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার মানসিক আকুতির সঙ্গে মায়ের ওপর নির্ভরশীল না হওয়া বা মায়ের ভাবমূর্তি বর্জনের কোনো তাগিদ কন্যা-সন্তান অনুভব করে না। সে চায় মা হতে এবং সে চায় তার নিজের মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে, পরিবারের আর সকলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে। অথচ শৈশবের সম্পর্কগুলি অবিকল একভাবে সে বহাল রাখতে চায় না। সে চায় তার অভিজ্ঞতার নিরিখে তার ভাল-লাগা না-লাগার পরিপ্রেক্ষিতে সম্পর্কগুলিকে নতুন করে সাজাতে। এর জন্য তার নিজের স্বর তার নিজের 'ভয়েস'-কে সে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। কিন্তু সে তার স্বর, তার বক্তব্য, কারোর ওপর জোর করে চাপাতে চায় না। তার দাবিদাওয়া চাপানোর সুযোগও তাকে কখনও দেওয়া হয়নি। তাই কন্যা-সন্তান চায় আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন সম্পর্কে পরিবর্তন আনতে। কন্যা-

Scanned with

সন্তান 'এক্সিট'-এর বিকল্পটিকে বেছে নেয় না, সে নির্বাচন করে 'ভয়েস'-এর বিকল্পটিকে।

এই দুই বিকল্পের মধ্যে 'ভয়েস'-এর বিকল্প বা স্বরাঘাতের বিকল্প অনেক জটিল—সব সম্পর্ক ত্যাগ করে একটা নৈর্ব্যক্তিক আদর্শকে আঁকড়ে ধরা সহজ কিন্তু নানা সম্পর্কের মধ্যে থেকে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা সহজ নয়, এর জন্য চাই পরস্পরের সঙ্গে ভাব আদানপ্রদানের অবিরাম প্রচেষ্টা।

রলস বলেছেন সব সম্পর্ক হয় চুক্তির সম্পর্ক, নয় উচ্চ-নীচ স্তর ভাগের সম্পর্ক। গিলিগান তা মনে করেন না, কারণ মেয়েদের অভিজ্ঞতা তা বলে না। এমন অনেক ভালবাসার সম্পর্ক আছে যা চুক্তিবদ্ধ নয়, শ্রেণীবিভক্তও নয়। সেই সম্পর্কগুলিতে থাকে সহানুভূতি, দরদ, পরস্পরের ওপর নির্ভরশীলতা। গিলিগান মনে করেন না 'আদর্শ সম্পর্ক' বলে কোনো দেশকালবহির্ভূত সম্পর্ক রয়েছে—যেমন সম্পর্ককে সর্বকালীন মানবিক সম্পর্ক বলা যায়। আদর্শ সম্পর্ক পরস্পরের আদান-প্রদানের মাধ্যমে সৃজিত হয়, আবার বিভিন্ন স্বরাঘাতে তা পরিবর্তিত হতে পারে, পরিমার্জিত হতে পারে। সম্পর্ক যেমন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না, তেমনি সম্পর্কের আদলও পালটে যেতে পারে।

গিলিগান বার বার সম্পর্কের কথা বলছেন, দরদের কথা বলছেন, এমনকি ওঁর নৈতিক মতাদর্শকে 'কেয়ার-বেসড এথিক্স' বা 'দরদ-ভিত্তিক নৈতিকতা' বলতে চাইছেন। প্রশ্ন জাগতে পারে এর মধ্যে দিয়ে উনি কি খুব নতুন কোনো কথা বলছেন? বৌদ্ধ দর্শনে আমরা মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, ইত্যাদি নৈতিক গুণের কথা শুনে থাকি আর খ্রিস্টধর্মেও প্রেম, ভালবাসার আদর্শ আদৃত হয়েছে। তাহলে গিলিগানের বক্তব্যে নতুনত্ব কোথায়? গিলিগানের মতের সঙ্গে অন্যান্য মতের পার্থক্য দুটি স্থলে প্রধানত দেখা যায়—একটা পার্থক্যকে যদি ব্যক্তিক-সত্তা 'পার্সোনাল আইডেন্টিটি' বিষয়ক পার্থক্য বলা যায় তবে অপর পার্থক্যটিকে বলা যায় মনন গঠনের পার্থক্য বা 'মেন্টাল ডেভেলপমেন্টের' পার্থক্য।

পাশ্চাত্য দর্শন এবং ভারতীয় দর্শনের মূল ধারায় আমরা 'সেলফ' বা ব্যক্তিক-সত্তার যে ব্যাখ্যা পাই তা অনেকটা এরকম—প্রতিটি ব্যক্তির স্বতন্ত্র একটি সত্তা আছে; এবং প্রতিটি ব্যক্তি ইচ্ছে করলে, প্রয়োজনবোধে, অপরের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করতে পারে। একাত্মতাবোধের জন্য চাই সেলফলেস বা সত্তা-লোপী একটা

অবস্থান। এবার প্রতি মুহূর্তে মানুষকে বেছে নিতে হয় এই দুই অবস্থানের মধ্যে একটিকে—হয় সে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অবস্থান বেছে নেবে, অথবা সে ব্যক্তি-লোপী অবস্থান বাছবে। এই মতে দেখা যাচ্ছে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তি-লোপী অবস্থানের মধ্যে একটা আত্যন্তিক বিযুক্তি আছে। কারণ মনে করা হয় একটি অবস্থান অপর অবস্থানটিকে নাকচ করে প্রকাশ পায়। ব্যক্তি নিজের কথা ভাবলে অপরের কথা ভাবতে পারে না, আর অপরের কথা ভাবলে নিজের কথা ভাবা যায় না। অবস্থা বুঝে তাই দুই অবস্থানের মধ্যে একটা দোলাচল চলতে থাকে। ফলে এই মতে মানুষ কখনও দরদ দেখায়, কখনও স্বার্থচিন্তা করে, অথবা সে স্বার্থের প্রেক্ষিতে দরদ দেখায়, বা দরদের প্রেক্ষিতে স্বার্থচিন্তা করে। গিলিগান মনে করেন 'স্ব' এবং 'অপর'-এর মধ্যে বা 'সেলফ' অ্যান্ড 'আদার'-এর মধ্যে একটা বিভেদ স্বীকার করলেই এমন করে ভাবা সম্ভব। 'এক্সিট'-এর কথা যাঁরা বলেন তাঁরা সেলফ-এর সমস্যাটিকে যেন এইভাবে দেখেন, ফলে তাঁরা একটা প্রয়োজনে সংগঠনে থাকেন, আবার প্রয়োজনমাফিক তাঁদের স্বাধীন ইচ্ছায় সংগঠন থেকে নীরবে বেরিয়ে যান। কিন্তু আরেকভাবে ব্যক্তিক-সত্তা বা 'পার্সোনাল আইডেন্টিটি'-র কথা ভাবা যেতে পারে।

গিলিগান বলছেন আমরা 'সেলফ' বা ব্যক্তিক-সত্তা বলতে যা বুঝি তা কোনো-আধিভৌতিক মৌল নয়। ব্যক্তি-সত্তা সৃজিত হয় নানান ঘাত-প্রতিঘাতে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক মানুষের ব্যক্তিক-সত্তা সৃজনের এক প্রধান উপাদান। এমন বলা যায় না যে ব্যক্তিক-সত্তা ও ব্যক্তি-বিলোপী সত্তা পরস্পর বিযুক্ত; বলতে হবে, এই সত্তা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত অথচ এদের মধ্যে প্রভেদও আছে। যার ফলে একটা সম্পর্কের মধ্যে থেকেও একটা স্বর বা 'ভয়েস' স্পষ্টতই শোনানো যেতে পারে। স্বতন্ত্র স্বর শোনানোর জন্য যে একেবারে বিযুক্ত হয়ে দাঁড়াতে হবে তা নয়।

তবে সংযুক্তির অর্থ এই নয় যে সংযুক্তির ফলে সত্তা তার স্বাতন্ত্র্য হারাবে। প্রেম বা ভালবাসার অনুষঙ্গে ব্যক্তিক-সত্তার কথা ভাবলে বোঝা যায় গিলিগানের সঙ্গে তাঁর পূর্বপক্ষগণের পার্থক্য কোথায়। খ্রিস্টীয় ভাবনায় প্রেম বা ভালবাসা মূলত সাম্যভাবনা বা 'ইকোয়ালিটি'র দ্যোতক, কিন্তু গিলিগান মনে করেন প্রেম বা ভালবাসা হল সংযুক্তি বা কনেকটেডনেস-এর দ্যোতক। ভালবাসা এবং বেদনার মধ্যে দিয়ে আমরা একজনকে জানতে পারি, বুঝতে পারি। অপরকে বোঝার উপায় একমাত্র বিচার-বিশ্লেষণ বা তর্ক নয়। সমব্যথা, দরদ, বেদনা বলতে খ্রিস্টীয় দর্শনে যা বোঝায় বা 'জাস্টিস-বেসড মর‍্যালিটি'-তে যা বোঝায় গিলিগান তা বোঝেন না।

Scanned with

জাস্টিস-বেসড মর‍্যালিটিতে দরদ বলতে বোঝায় 'সিমপ্যাথি' বা এমন একটি সংবেগ যা দুই পৃথক ব্যক্তির একজন অপরজনের প্রতি প্রদর্শন করতে পারে, কিন্তু উভয়ে উভয়ের প্রতি যুগপৎ 'সিমপ্যাথি' প্রদর্শন করতে পারে না। সিমপ্যাথির সঙ্গে আরো কয়েকটি সংবেগ সম্বন্ধযুক্ত, যেমন, গ্লানিবোধ, অনুশোচনা, ইত্যাদি। সমব্যথা উচিতমতো জায়গায় প্রকাশ করতে না পারলে গ্লানিবোধ হয়, অনুশোচনা হয়। গিলিগান দরদ বলতে সিমপ্যাথির বদলে একটা বিকল্প শব্দ ব্যবহার করতে চান— শব্দটি হল 'কো-ফিলিং'। 'কো-ফিলিং' বা অন্যোন্য-ভাব যে কী তা বোঝা এবং বোঝানো একটি দুরূহ কাজ। এ এক অন্য ধরনের সংবেগ যা সাহিত্যে উল্লিখিত হলেও দর্শনে উচ্চারিত হয়নি। তাই এই সংবেগ অনেকাংশে অনির্বাচ্য স্তরে রয়েছে, যদিও মনে করা হয় না তা অনির্বচনীয় ('কো-ফিলিং' যখন হয় তখন এমন একটি সম্পর্ক গড়ে ওঠে যেখানে প্রতি সম্পর্কিত ব্যক্তি মনে করে তার নিজস্ব গুরুত্ব আছে, আর পাশাপাশি ভাবে যে, সম্পর্কটি তার অস্তিত্বের জন্য আবশ্যিক। প্রতিটি সম্পর্কিত ব্যক্তি মনে করে যে অপরজনের প্রতি তার সহৃদয় ভাব আছে, সে মনে করে না যে সে বিচ্ছিন্ন একটি ব্যক্তি যে সাময়িকভাবে সম্পর্কযুক্ত। সে মনে করে সম্পর্কের মাধ্যমেই তার বিকাশ ঘটছে, সম্পর্কের মধ্যে দিয়েই সে তার স্বরূপ খুঁজে পাচ্ছে। "ম্যাপিং দ্য মরাল ডোমেন" প্রবন্ধে গিলিগান বলছেন, জাস্টিস-বেসড মর‍্যালিটিতে ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলি যেন নিশ্চল, প্রাণহীন আর কেয়ার-বেসড এথিক্সে সম্পর্কগুলি প্রাণবন্ত, সচল।

'রেসিপ্রসিটি' বা পারস্পরিকতা ও অন্যোন্য-ভাব বা 'কো-ফিলিং'-এর মধ্যে পার্থক্য করেন গিলিগান। রলস আর গিলিগানের পার্থক্য বোঝার জন্য এই পার্থক্যটি বোঝা জরুরি। গিলিগান 'কনেকটেডনেস' বা সংযুক্তি, নট হার্টিং বা অহিংসা, কেয়ার বা অন্যোন্য-ভাব এবং রেসপন্স বা সংবেদনশীলতার কথা বলছেন। সে জায়গায় রলস বলেন 'ইকোয়ালিটি' বা সাম্য, 'রেসিপ্রসিটি' বা পারস্পরিকতা, 'জাস্টিস' বা ন্যায়, এবং 'রাইটস' বা অধিকারের কথা।

গিলিগানের মতের সঙ্গে ন্যায়ভিত্তিক নৈতিকতার পার্থক্য অবশ্য যৌন প্রভেদ বা সেক্স ডিফারেন্স-এর উপর নির্ভর করে না, তা নির্ভর করে লিঙ্গ-প্রভেদ বা 'জেন্ডার-ডিফারেন্সের' ওপর। যদিও দেখা গেছে যে পরীক্ষায় অধিকাংশ ছাত্রী গিলিগানের মত সমর্থন করেছিল আর ছাত্ররা সমর্থন করেছিল জাস্টিস-বেসড মর‍্যালিটিকে।

গিলিগানের মতে এই পার্থক্য সামাজিক কারণে হয়ে থাকে। সামাজিক ভূমিকা এমনভাবে নিরূপিত হয়েছে যে মেয়েরা সাহস পায় না 'এক্সিট' বা নিষ্ক্রমণের বিকল্প বেছে নিতে। তারা নানা সম্পর্কে সামাজিক কারণে সম্বদ্ধ এবং পরবর্তীকালেও তারা মুক্তির পথ খোঁজে সম্বন্ধের ভেতরে থেকেই, সম্বন্ধকে বাতিল করে বেরিয়ে গিয়ে নয়।

সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, 'এক্সিট'-এর পথ যারা বেছে নেয় তাদের মত বেশি পরিণত আর যারা সম্পর্কের মধ্যেই থাকতে চায় বলে 'ভয়েস'-এর পথ বাছে, তাদের মত অপেক্ষাকৃত কম পরিণত। এর কারণ প্রথম পথটিতে মনে করা হয় বেশি ক্ষমতা, বেশি স্বাতন্ত্র্যের যেন আভাস পাওয়া যায়। নারীবাদীরা যখন বিকল্প বেছে নেন তখন তাঁরা দুটি প্রচলিত সমীকরণকে চ্যালেঞ্জ করে থাকেন। প্রথমত, মানুষের ধর্ম বলতে যে শুধু পুরুষের ধর্মকে বোঝানো হয় এতে তাঁদের আপত্তি আছে। নারীর সংবেগনির্ভরতা বা যুক্তিকে অগ্রাহ্য করাটাও মানবিক অভিজ্ঞতা, ঠিক যেমন সম্বদ্ধ হয়ে থাকাটাও মানুষের ধর্ম। এই শেষোক্ত অভিজ্ঞতার সঙ্গে পুরুষের তুলনায় নারীই বেশি পরিচিত। দ্বিতীয় যে সমীকরণটিকে নারীবাদীরা চ্যালেঞ্জ করেন তা হল দরদের সঙ্গে আত্মত্যাগকে সমার্থক ভাববার প্রবণতা। আগেই বলেছি যে তাঁরা আত্মাভিমান ও আত্মত্যাগের মধ্যে বিযুক্তির সম্পর্ক দেখেন না, কারণ তাঁদের মতে দুটোই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। 'কো-ফিলিং' বা অন্যোন্য-ভাবের মধ্যে দিয়ে তাঁরা এই সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেন।

বর্তমান আলোচনায় আশা করছি 'জাস্টিস-বেসড এথিক্স' বা ন্যায়নীতিভিত্তিক নীতিশাস্ত্র ও 'কেয়ার-বেসড এথিক্স' বা দরদী নীতিশাস্ত্রের মূল পার্থক্যগুলি স্পষ্ট করা গেল। প্রথম মতটি খাপ খায় নারীবাদীদের অন্তর্ভুক্তি প্রকল্পের সঙ্গে, আর দ্বিতীয় মতটি খাপ খায় সেই নারীবাদের সঙ্গে যা প্রকল্পিত তত্ত্ব-কাঠামো বর্জন করতে চায়। আমরা আগেই বলেছি যে, 'কেয়ার-বেসড এথিক্স' এখনও একটি পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্রের রূপ লাভ করেনি। দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব-কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করতে হলে তাকে পূর্ণাঙ্গ দার্শনিক আঙ্গিকে পেশ করতে হবে। বোঝা যাচ্ছে বিশ্লেষণী দর্শনের আঙ্গিকে তাঁরা তাঁদের মত প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন না। কারণ রিলেশন বা সম্পর্ক বিষয়ে তাঁরা যে কথা বলতে চাইছেন তা সংযুক্তি অথবা বিযুক্তির প্রকল্পিত অ্যানালিটিক বা বিশ্লেষণী ধারণার সাহায্যে ফুটিয়ে তোলা যাবে না। এঁদের মতে

Scanned with

ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে সম্পর্কটা অনেকটা যেন হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইন-এর 'ট্র্যাকটেটস'-এর 'অবজেক্ট' বা বস্তুর সম্পর্কের মতো। তাঁর মতে বস্তু সবসময় কোনো না কোনো সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হয়ে থাকে—বস্তুর কোনো একক অবস্থান নেই। অথচ সম্বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও প্রতিটি 'অবজেক্ট'-এর স্বতন্ত্র স্বরূপ আছে। গিলিগানের 'পার্সন' বা ব্যক্তির সঙ্গে হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইন-এর 'অবজেক্ট' অবশ্য সবদিক থেকে তুলনীয় নয়।

'জাস্টিস-বেসড এথিক্স' আর 'কেয়ার-বেসড এথিক্স'-এর অনুষঙ্গে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল দুটি প্রকল্পের মধ্যে কোনটি বেছে নেওয়া উচিত এবং কেন। কেয়ার-বেসড এথিক্সের সম্পর্কে অন্যতম যুক্তি হল বাজারের অর্থনীতির প্রসঙ্গে 'এক্সিট'-এর কথা যত সহজে ভাবা যায় জীবনের নৈতিক সমস্যা থেকে অত সহজে 'এক্সিট' করা যায় না বা বেরিয়ে আসা যায় না। উদাহরণস্বরূপ 'কেয়ার-এথিক্স'-এর সমর্থকরা বলছেন, যখন নিউক্লিয়ার বোমা বিস্ফোরণের নৈতিকতা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তখন মতে মিলছে না বলে এই আলোচনায় অংশগ্রহণ না করে, সব সম্পর্ক ঘুচিয়ে 'এক্সিট'-এর পথ কোথায়? পরম নিশ্চিন্ততায় কি তখন মৌনতা যাপন করা যাবে, সরব না হলেও চলবে? তখন কি বলতে পারা যাবে—'কাজ কি খেয়ে তোফা আছি, আমায় কেউ না খেলেই বাঁচি?' অপরদিকে জাস্টিস-বেসড এথিক্স এক ধরনের সাম্য ভাবনার কথা বলে যা আমাদের প্রতিনিয়ত কাজে লাগে। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু সর্বজনগ্রাহ্য নীতি প্রয়োজন হয়। যেমন পৃথিবীর আকাশ, বাতাস, সমুদ্র সম্পদ সম্বন্ধে কিছু আন্তর্জাতিক চুক্তি করে নিয়ে সেই চুক্তি মেনে চললে সকলেরই মঙ্গল হতে পারে। যাঁরা জাস্টিস-এর কথা বলেন তাঁরা মনে করেন 'কেয়ার' অত্যন্ত সীমিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও হতে পারে, যেখানে নৈতিকতার চর্চা একটা চেনা মহলে সীমিত। কিন্তু যেখানে আমি একজনকে চিনি না, সে ভাল কি মন্দ জানি না, সে আমার সহৃদয়তার মূল্য দেবে, নাকি তার সুযোগ নেবে, তাও জানি না—সেখানে তার প্রতি দরদ দেখানো বিপজ্জনক। পৃথিবীতে এমন অনেক লোক আছে যারা অসৎ এবং সুযোগসন্ধানী—তাদের প্রতি মৈত্রী-মুদিতা-করুণা প্রদর্শন করাটা ঠিক, না আইনের সাহায্যে তাদের শাসন করাটাই সমীচীন?

ইদানিং কিছু কিছু নারীবাদী চেষ্টা করছেন 'কেয়ার' এবং 'জাস্টিস'-এর মেলবন্ধন ঘটাতে। এটা কতটা সম্ভব হবে জানি না। এটা নিশ্চিত যে দুই আর দুই-এ চার-এর মতো কোনো যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এটা করা সম্ভব হবে না। তার প্রধান কারণ হল যে

'কেয়ার-এথিক্স' আর 'জাস্টিস এথিক্স' দুটি ভিন্ন ঘরানার। জাস্টিস-বেসড এথিক্স-এর মূল কাঠামোটি 'মডার্নিজম'-এর দ্বারা প্রভাবিত। এই সংকলনে 'উত্তর-আধুনিকতা ও নারীবাদ'-এ যে বিতর্কের কথা বলা হয়েছে এথিক্সের অনুষঙ্গেও সেই তর্কের জের লক্ষ্য করা যেতে পারে।

সাধারণভাবে বলা যায় মূলস্রোতের নীতিদর্শনের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ:

(১) এই নীতিশাস্ত্র ব্যক্তিপ্রতিরূপের কথা না বলে যেন একটি জাতি প্রতিরূপের কথা বলে।

(২) মূলস্রোতের নীতিশাস্ত্র যেন সর্বদাই একটা প্রামাণিকভঙ্গি ধারণ করে, ভাবখানা যেন একটি অনন্য তন্ত্রের দ্বারাই নীতিশাস্ত্রের তাবৎ সমস্যার এককালীন উত্তর দেওয়া যাবে।

(৩) মূলস্রোতের নীতিশাস্ত্র একটা কৃত্রিম প্রাচীর তুলে নৈতিক আলোচনাকে সীমায়িত করে নির্দিষ্ট কিছু সমস্যার মধ্যে, যার ফলে মানব অভিজ্ঞতার একটা বিরাট অংশ এই প্রাচীরের ওপারে থেকে যায়।

(৪) স্বরচিত সীমাবদ্ধতার দরুন মূলস্রোতের নীতিশাস্ত্রের ধারণার পরিমণ্ডলটি একপেশে—এর মধ্যে নারীর অভিজ্ঞতার অনেকগুলি দিক স্থান করে নিতে পারে না।

(৫) নিরপেক্ষতাকে নৈতিকতার আবশ্যিক শর্ত মনে করা হয়।

(৬) এঁদের ঝোঁকটা সমরূপতার ওপর থাকার দরুন মনে করা হয় যে সব একধরনের দৃষ্টান্তের বিচার একই হওয়া উচিত।

(৭) ব্যক্তি-স্বাধীনতার ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

(৮) মূলস্রোতের নীতিশাস্ত্রের যুক্তির ছকটা অনেকটা গাণিতিক আদলে সাজানো হয়।

(৯) বহিরঙ্গের সম্পর্কের জগৎ আর অন্তরঙ্গ সম্পর্কের জগতের মধ্যে একটা স্পষ্ট সীমা টানা হয়। বহিরঙ্গের সম্পর্কগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে পাব্লিক মর‍্যালিটি এবং অন্তরঙ্গ সম্পর্ক নিয়ে চর্চা করা হয় প্রাইভেট মর‍্যালিটিতে।

(১০) মূলস্রোতের নীতিশাস্ত্রে নৈতিক সমস্যাগুলিকে আইনি সমস্যার ধাঁচে বুঝবার চেষ্টা করা হয়।

নারীবাদী নীতিশাস্ত্র মূলধারার এই নৈর্ব্যক্তিক ভাবনার সমালোচনা করে থাকে। কেয়ার-এথিক্স-এর মতো অপরাপর নারীবাদী নীতিশাস্ত্র ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তিগত

Scanned with

প্রয়োজন মোতাবেক নৈতিক বিচার করে। নীতিশাস্ত্রের প্রেক্ষিতের এই পরিবর্তনটিকে অনেক সময় পার্সোনাল টার্ন বলে অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ বলা হয় যে নীতিশাস্ত্রের অভিমুখ জাতি-প্রতিরূপ থেকে ঘুরে ব্যক্তি-প্রতিরূপের দিকে মোড় নিয়েছে।

মূলস্রোতের প্রতিতুলনায় নারীবাদী নীতিশাস্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ:

(১) নারীবাদী নীতিশাস্ত্র কখনই প্রামাণিকতা দাবি করে না। তাদের বক্তব্যের পুনর্বিচারের জন্য তারা সব সময় প্রস্তুত।

(২) একই সমস্যাকে বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত থেকে দেখার প্রয়োজন স্বীকার করা হয়। প্রান্তিক সমাজের নৈতিক বিচারধারাও যে অনুধাবনযোগ্য তা মনে রাখতে হবে।

(৩) মনে রাখতে হবে আমরা কেউই নিরপেক্ষ নই, প্রত্যেকেরই কোনো-না-কোনো পক্ষপাত আছে। প্রত্যেকের পক্ষপাত বিষয়ে মূল্যায়ন ও সমালোচনার সুযোগ যেন থাকে তা দেখতে হবে।

(৪) সমরূপতা খোঁজার চেষ্টা না করে প্রতিটি সমস্যার অনুপুঙ্খের দিকে নজর দিতে হবে।

(৫) প্রত্যেকের বিশেষ চাহিদার প্রতি মনোযোগ দিতে হলে আমাদের 'শ্রবণের' দক্ষতা বাড়াতে হবে যাতে আমরা বিভিন্ন 'স্বর' শুনে তাদের বক্তব্য বুঝতে পারি। এ যাবৎ দর্শনের অঙ্গনে যাদের অপাংক্তেয় বলে মনে করা হয়েছে তাদেরও কথা শুনতে হবে।

(৬) নারীবাদী নৈতিকতা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ওপর জোর না দিয়ে অসাম্য দূর করায় অধিক আগ্রহী।

(৭) এমন একটা ভাষায় কথা বলতে হবে যা সহজবোধ্য এবং যা অশিক্ষিত মহিলারাও বুঝতে পারেন। কারণ মনে করা হয় যে নৈতিক জীবনযাপনের রূপরেখা একমাত্র যৌথভাবেই রচনা করা যায়।

(৮) নারীবাদী নৈতিকতায় ইমোশন বা আবেগের একটি মুখ্য ভূমিকা রয়েছে।

(৯) আবেগাশ্রিত সিদ্ধান্ত কখনোই মূল্যায়ন বা সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়।

(১০) নারীবাদী নৈতিকতা অনুজ্ঞাধর্মী নয়, তার ঝোঁকটা হল সকলকে নিয়ে চলার চেষ্টা করা।

মূলস্রোতের নৈতিক প্রেক্ষিতের সঙ্গে নারীবাদী নৈতিকতার তুলনা করলে বোঝা যায় দুইয়ের মধ্যে কত পার্থক্য। তাত্ত্বিক আলোচনা প্রসঙ্গে এই পার্থক্য যতটা স্পষ্ট হয় তার চেয়ে অনেক বেশি তা স্পষ্ট হয় ফলিত নীতিশাস্ত্রের ক্ষেত্রে। নারীনিসর্গ-নীতিবাদ ফলিত নীতিশাস্ত্রের এমনই একটি শাখা। লিবারাল ও র‍্যাডিকালভেদে নিসর্গনীতি নিয়ে ভিন্ন-ভিন্ন অবস্থান নেওয়ার প্রচলন আছে। লিবারালরা মনে করেন নিসর্গনীতিকে কোনোপ্রকারে মূল স্রোতের নীতিশাস্ত্রের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে আর র‍্যাডিকালরা মনে করেন যে নিসর্গনীতির সমস্যা এমনই অনন্য যে তার প্রয়োজনে নীতিশাস্ত্রকে নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে।

সূত্র-নির্দেশ

১. Simone de Beauvoir, *The Second Sex*, Picador, London, 1988, p. 97.

২. Janet Radcliff Richards, *The Secptical Feminist : A Philosophical Enquiry*, Penguin, Harmondsworth, 1982, pp. 17-18.

৩. Carol Gilligan, 'Exit Voice—Dilemmas in Adolescent Development', in *Mapping the Moral Domain*, eds. Carol Gilligan et al. Harvard University Press, Cambridge, 1988.

Scanned with

সপ্তম অধ্যায়

নারী-নিসর্গনীতি

'নিসর্গনীতি' (Ecology) আধুনিককালে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রের রূপ নিয়েছে। সাধারণভাবে মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্কের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে গড়ে উঠেছে এই শাস্ত্র।

নারীমুক্তি আন্দোলনের গোড়ার দিকে নারীবাদ নারী ও পুরুষের সম্পর্কের নানা বিতর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ক্রমে প্রশ্নের জাল ছড়াতে লাগল। নারীমুক্তির প্রশ্নটি তখন জড়িয়ে গেল আরো অনেক জটিল সম্পর্কের অনুষঙ্গে। প্রশ্ন উঠল নারী ও নিসর্গের অবস্থান বিষয়ে।

একদল নারীবাদী মনে করলেন নিসর্গনীতি আর নারীবাদের সমস্যাগুলির মধ্যে রয়েছে একটি গভীর যোগসূত্র। তাঁরা মনে করেন পুরুষের সঙ্গে নারীর সম্পর্কের প্রতিফলন দেখা যায় মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্কের মধ্যে। ফলে, বর্তমানে মানুষ ও নিসর্গের সম্পর্কের মধ্যে যে অনৈতিক রূপ দেখতে পাই তার মূলে রয়েছে নারী-পুরুষের মধ্যে অবদমনের সম্পর্ক, আর তারও মূলে রয়েছে পুরুষতন্ত্র। এইভাবে নিসর্গের সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে নারীমুক্তির সমস্যা—দ্বিতীয়টা বাদ দিয়ে প্রথম সমস্যার সমাধান হতে পারে না। নারীমুক্তির আন্দোলনে এই স্বর শোনা যাচ্ছে নারী-নিসর্গনীতিবাদী বা 'ইকো-ফেমিনিস্ট'দের কাছ থেকে। 'ইকোফেমিনিজম' (ecofeminism) পদটি প্রথম ব্যবহার করেন ফ্রাঁসোয়া দা ওবোঁন্ (Francoise de Eaubonne) তাঁর 'লে ফেমিনিজম উ লা মো' (Le Feminism ou La Mort, 1984) বইটিতে। ঠিক যেমন নারীবাদের অনেক রূপ আছে তেমনি নারী-নিসর্গনীতিরও অনেক রূপ আছে। সব নারীবাদীরা নারী-নিসর্গনীতি সমর্থন করেন না।

পশ্চিমের কল্যাণে আমরা নিসর্গনীতির অনেক রূপের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি।

ইকোলজির সমস্যাকে কেউ দেখেন নৈতিক সমস্যারূপে, কেউ দেখেন রাজনৈতিক সমস্যার আদলে, কেউ চান তাত্ত্বিক আলোচনা আর কেউ বা চান সোজাসুজি কোনো ক্রিয়াকাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়তে। আমরা জেনেছি 'ইকোলজি' বলতে কোনো একটা 'বাদ' বা 'তন্ত্র' বোঝায় না। যাঁরা মানুষ ও নিসর্গের সমস্যাকে একটি রাজনৈতিক সম্পর্কের সমস্যা হিসেবে দেখেন তাঁদের জিজ্ঞাসাকে 'নিসর্গ-রাজনীতি জিজ্ঞাসা' বা 'ইকো-পলিটিক্স' বলা হয়।

নিসর্গ-রাজনীতি যাঁরা করেন তাদের মধ্যে একটি অন্তর-বিসম্বাদ বেশ কিছুদিন যাবৎ দানা বেঁধে উঠছে। এই বিবাদকে অনেক সময় 'ইন্টারনাল গ্রীন ডিবেট' বলা হয়। এই বিবাদের তিন শরিক—'সোশাল ইকোলজিস্ট' বা সামাজিক-নিসর্গনীতিবাদী, 'ডিপ-ইকোলজিস্ট' বা নিবিড়-নিসর্গনীতিবাদী এবং 'ইকোফে-মিনিস্ট' বা নারী-নিসর্গনীতিবাদী। শেষোক্ত মতবাদীরা অভিযোগ করেন যে অপর দুই শরিকের মতবাদের মূলে পুরুষতান্ত্রিক পরিপ্রেক্ষিত কাজ করে চলেছে। এই আপত্তি কেন করা হচ্ছে বুঝতে গেলে জানা প্রয়োজন পুরুষতন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিত বলতে সাধারণভাবে এঁরা কী বোঝেন, তারপর ধরার চেষ্টা করতে হবে নিসর্গবাদের মধ্যে পুরুষতন্ত্রের অনুপ্রবেশ ঘটে কেমন করে। এই প্রেক্ষাপট বুঝলেই পরিস্ফুট হয় নারী নিগসর্নীতির জেহাদ কিসের বিরুদ্ধে।

কোনো বিশেষ পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি আর পুরুষতন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিত কিন্তু এক না-ও হতে পারে। পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি বিবিধ ও বৈচিত্র্যময়। কিন্তু 'পুরুষতন্ত্র' বলতে একটি সমরূপ তন্ত্র বা সিস্টেম বোঝায়। এই তন্ত্রের প্রেক্ষিতে একটি আদর্শ পুরুষের প্রতিরূপ নির্মাণ করা হয়। এই নির্মাণে পুরুষ যে যে গুণসমন্বিত, স্ত্রী-প্রতিরূপ ঠিক সেই সেই গুণের বিপরীত গুণে গুণান্বিত। সব পুরুষতন্ত্রেই এই মত প্রচলিত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনেক লেখাতেই এই বৈপরীত্যের উল্লেখ করেছেন। 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি'-তে তিনি মেয়েদের সম্বন্ধে লিখছেন: 'নারীপ্রকৃতি আপন্যার স্থিতিতে প্রতিষ্ঠ। সার্থকতার সন্ধানে তাকে দুর্গম পথে ছুটতে হয় না। জীবপ্রকৃতির একটা বিশেষ অভিপ্রায় তার মধ্যে চরম পরিণতি পেয়েছে। সে জীবধাত্রী, জীবপালিনী; তার সম্বন্ধে প্রকৃতির কোনো দ্বিধা নেই। প্রাণসৃষ্টি প্রাণপালন ও প্রাণতোষণের বিচিত্র ঐশ্বর্য তার দেহে মনে পর্যাপ্ত। এই প্রাণসৃষ্টি-বিভাগে পুরুষের প্রয়োজন অত্যল্প, এইজন্যে প্রকৃতির একটা প্রবল তাগিদ থেকে পুরুষ মুক্ত। প্রাণের ক্ষেত্রে ছুটি পেয়েছে বলেই চিত্তক্ষেত্রে সে আপন সৃষ্টিকার্যের পত্তন করতে পারলে'।

Scanned with

স্বভাবের বৈপরীত্য স্বীকার পুরুষতন্ত্রের গোড়ার কথা। স্ত্রী-সত্তার বৈশিষ্ট্য তার প্রাণসৃষ্টি, প্রাণপালনের ক্ষমতা, তার প্রেম, তার মমতা, তার সংবেগ; এই সবই নারীবৃত্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত—মনন ও চিত্তের সঙ্গে নয়। প্রাণসৃষ্টি, প্রাণপালন, প্রাণতোষণ, প্রাণিজগৎ ও উদ্ভিদজগতেরও মুখ্য কাজ এই যুক্তিতে পুরুষতন্ত্রে স্ত্রীজাতিকে প্রকৃতির কোটিতে রাখে আর পুরুষকে দেয় রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্বের সাধনার দায়িত্ব'। রবীন্দ্রনাথ এও বলেন যে পুরুষ এই বিশিষ্ট ক্ষমতাবলে 'প্রাণের ক্ষেত্রে ছুটি পেয়েছে বলেই চিত্তক্ষেত্রে সে আপন সৃষ্টিকার্যের পত্তন করতে পারলে। সাহিত্যে কলায় বিজ্ঞানে দর্শনে ধর্মে বিধিব্যবস্থায় মিলিয়ে যাকে আমরা সভ্যতা বলি সে হল প্রাণপ্রকৃতির পলাতক ছেলে পুরুষের সৃষ্টি' ('পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি')।

তাহলে বোঝা যাচ্ছে সব 'তত্ত্বের' জনক পুরুষ প্রজাতি, তারাই আবার সংস্কৃতি বা কালচারেরও প্রবর্তক। তারা তাদের মতো করে স্ত্রী-স্বভাবকে বুঝেছে, আর বুঝেছে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ককে। এই পুরুষকেন্দ্রিক সংস্কৃতিতে সমাজের প্রেক্ষাপটে বা নিসর্গের প্রেক্ষাপটে স্ত্রী-পুরুষের আদর্শ অবস্থান কী হওয়া বাঞ্ছনীয় তাও নির্দিষ্ট হয়েছে পুরুষের মনন ও অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে। পুরুষতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যই এই যে পুরুষের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যে তত্ত্ব বা থিওরি গড়ে ওঠে তাই একমাত্র বৈধ মত। এও দাবি করা হয় যে এইটাই যৌক্তিক মত, এবং যৌক্তিক মত মাত্রই লিঙ্গরহিত, ফলে এটা স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে গ্রহণযোগ্য।

শুধু যে এই একঝোঁকা সভ্যতা মেয়েদের অভিজ্ঞতারহিত তা নয়, পুরুষতন্ত্রে বলে এমনটিই হওয়া কাম্য। কারণ সংবেগ ও যুক্তি দুই ভিন্নমুখী বৃত্তি। সংবেগের যোগ আছে হৃদয়ের সঙ্গে, প্রাণের সঙ্গে—তার পালিকাশক্তি অনস্বীকার্য। সংবেগকে যুক্তির নিয়ন্ত্রণে রাখাই শ্রেয়। মানুষ মননশীল জীব। ফলে তার মনন ও যুক্তির নিয়ন্ত্রণে জীবনযাপন করাই মঙ্গল, সংবেগকে মানবজীবনের চালিকাশক্তির আসন দেওয়া বিপজ্জনক। মনে করা হয় যে যুক্তিরহিত সংবেগ মানুষকে নিয়ে যায় পশুর কাছাকাছি, প্রকৃতির কাছাকাছি।

নারী-নিসর্গনীতিবাদীরা মনে করেন পুরুষ থেকে পৃথক করে প্রকৃতির কোটিতে নারীকে স্থান দেওয়ার মধ্যে কাজ করে যাচ্ছে পুরুষতন্ত্রের একটি সুপরিকল্পিত অভিসন্ধি। পুরুষ ও নারী স্বভাবের দিক থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত এবং তাদের

সামাজিক দায়ও একেবারেই পৃথক, এই চিন্তাটাই পুরুষতন্ত্রের ফসল। প্রথমে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্যের প্রাচীর খাড়া করা হয়, তারপর, একপক্ষকে দেওয়া হয় শক্তির আসন ও অপরপক্ষকে দেওয়া হয় সমর্পণের দায়। কোনো নারী যদি শক্তির পরিচয় দেন তিনি বিবেচিত হন 'পুরুষালি-স্ত্রীলোক' হিসেবে আর কোনো পুরুষ যদি সমর্পণের ভূমিকা পালন করেন তিনি হবেন 'মেয়েলি-পুরুষ'।

মনে হতে পারে ভূমিকা ভাগ করায় ক্ষতি কী? পরস্পরকে অসম্মান না করলেই হল। রবীন্দ্রনাথের কথা মেনে নিয়ে যদি বলি যে, 'মেয়েদের সম্বন্ধে নিয়ম ভালবাসার নিয়ম। সমাজ তাই মেয়েদের কাছে দাবি করে যে, তারা এমন করিয়া কাজ করিবে যেন তারা সংসারকে ভালবাসিতেছে। বাপ মা ভাই বোন স্বামী ও ছেলে মেয়ের সেবা তারা করিবে। তাদের কাজ ভালবাসার কাজ, এটাই তাদের আদর্শ।' (স্ত্রী-শিক্ষা)। নারী-নিসর্গ-নীতিবাদীদের পুরুষতন্ত্রের কাছে প্রশ্ন 'নারীর এই কথিত প্রবণতার উৎস কী?' যুক্তি তথা শক্তিতে অধিকার নেই বলেই কি তাদের 'প্রাণতোষণের' বিকল্প বেছে নিতে হয়নি? পুরুষকে বলা হল 'প্রাণপ্রকৃতির পলাতক ছেলে'। অর্থাৎ ক্ষমতাবান পুরুষ পথচ্যুত হলে নারীই পারবে তাকে ধর্মের পথে, তার প্রকৃতিগত স্বরূপে ফিরিয়ে আনতে। নারীর এই আদর্শময়ী রূপ টিকিয়ে রাখার জন্যই কি তাকে ক্ষমতার লড়াইয়ের ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া হল? ক্ষমতা পেলে নারী কলুষিত হয় তাই তাকে পুরুষতন্ত্র পালনের দায়িত্ব দিল—সভ্যতা সৃষ্টির নয়?

পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে নারীবাদের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার মধ্যে একটি হল পুরুষতন্ত্রের পরিবর্তে স্ত্রীতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। এই গোষ্ঠী মনে করেন পুরুষতন্ত্রের সঙ্গে মননের যোগ সুপ্রতিষ্ঠিত, ফলে প্রথমেই মননের প্রাধান্য অস্বীকার করে সংবেগকে চালিকাশক্তির আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই মুক্তি। তবেই স্ত্রীশক্তি প্রতিষ্ঠিত হবে, নগরসভ্যতার অবসান হবে, আমরা ফিরে যাব কাল্পনিক কোনো সংবেগময় আদিযুগে। এই পথে মুক্তির বিপদ একটাই—যে সভ্যতা ঝুঁকেছিল পুরুষের দিকে পাল্লা ভারি করে, সেটা এবার ঝুঁকবে স্ত্রীর দিকে পাল্লা বোঝাই করে। সেই একঝোঁকা সভ্যতাই থেকে যাবে—ঝোঁকটা বদল হবে এই যা।

কেউ বলতে পারে কোনো একদিকে সভ্যতার ভারি হওয়ায় দোষ নেই, দেখতে হবে বিভিন্ন বিকল্পের মধ্যে কোনটা বেশি মানবিক, বা কোনটা মানুষের জন্য কম অকল্যাণকর। কিছু নারীবাদী দাবি করেন পুরুষতন্ত্র ভর করে আছে একনায়কত্বের

Scanned with

ওপর, তার নীতি দমন, শোষণ ও পীড়নের, তার হাতিয়ার যুদ্ধ। পরিবর্তে স্ত্রীতন্ত্র এলে লালন, পালন, সেবা, মাধুর্য, প্রেম, ভালবাসার মন্ত্রে সকলে দীক্ষিত হবে। নারী-নিসর্গনীতিবাদীরা এই মত সমর্থন করেন না। পুরুষ ও নারীর এই দ্বি-কোটিক অবস্থানেই তাঁদের আপত্তি।

পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে নারীবাদের অপর একটি বহুলসমর্থিত প্রকল্প হল অন্তর্ভুক্তির প্রকল্প। এই মতানুসারে নারী-পুরুষের পটুত্বের ক্ষেত্র-বিভাজন অনিষ্টকারী ও অনভিপ্রেত। কে বলে কলায়, বিজ্ঞানে, দর্শনে, ধর্মে, বিধিব্যবস্থা মিলিয়ে যাকে সভ্যতা বলে তা পুরুষেরাই পারে সৃষ্টি করতে? সুযোগ ও অধিকার পেলে মেয়েরাও পারে এই কর্মকাণ্ডে শামিল হতে। নারীমুক্তি মানে প্রাণসৃষ্টি, প্রাণপালন ও প্রাণতোষণের সৃজনহীন জৈবিক বৃত্তি থেকে মুক্তি পাবার অধিকার। এখানে মুক্তির লড়াই অন্তর্ভুক্তির লড়াই, পুরুষের তন্ত্রে নারীর দীক্ষা। যদি শারীরিক বা মানসিক কারণে এই 'উত্তরণে' কোথাও বাধা পড়ে তাহলে সেখানে শিক্ষা, অনুশীলন এমনকি আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যারও সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন হলে শারীরবৃত্তিকে গৌণ করে মননকে মুখ্য করার অনুশীলনে ব্রতী হতে হবে, মেয়ে-মানুষকে আরো বেশি মানুষ করে তুলতে হবে, তাকে সাহায্য করতে হবে তার জৈবিক স্বভাব কাটিয়ে ওঠার সাধনায়। প্রয়োজন হলে জৈবিক স্বভাব নিয়ন্ত্রণের জন্য বিজ্ঞানের সাহায্য নিতে হবে। নারী-নিসর্গনীতিবাদীদের এই প্রকল্পে প্রবল আপত্তি। তাঁরা মনে করেন এর ফলে পুরুষতন্ত্রের সব দোষ ও দুর্বলতা মেনে নিয়ে এতদিনের লালিত স্ত্রীসুলভ গুণগুলিকে অবদমন করতে হবে বা সরিয়ে রাখতে হবে। এই যদি পুরুষতন্ত্রে প্রবেশের শর্ত হয় তবে তা নিতান্ত অবমাননাকর। শুধু তাই নয়, বৃহত্তর মানবসভ্যতা তথা নিসর্গের পক্ষেও এই ব্যবস্থা মঙ্গলজনক নয়। তাঁদের এই আপত্তি খুব স্পষ্টরূপ নেয় যখন তাঁরা 'সোশাল-ইকোলজি' বা সামাজিক-নিসর্গনীতির সমালোচনা করেন। তাঁরা মনে করেন এই মতটি পুরুষতন্ত্রের প্রকৃষ্ট প্রতিবিম্ব।

সামাজিক নিসর্গনীতির মূল কথাটা একটু বুঝে নেওয়া যাক। এই মতের অন্যতম বক্তা মারে বুক্‌চিন, যাঁর বিখ্যাত বই 'রিমেকিং সোসাইটি: দ্য ফিলসফি অব সোশাল ইকোলজি' (১৯৮৯)। তাঁর মতে মানুষ আজ নিঃসন্দেহে পরিবেশকে দূষিত করে, অন্যান্য জীবের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করে, উদ্ভিদজগৎকে যথেচ্ছভাবে নির্মূল করে বা তার স্বাভাবিক বাড় হতে দেয় না। এককথায় নিসর্গনিপীড়ন বা 'ডমিনেশন

অব নেচার' আজ ব্যাপক আকার নিয়েছে। সামাজিক-নিসর্গনীতিবাদের মতে বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি এই বৈরিভাবের উৎস মানবসমাজেই রয়েছে। মানব সমাজে মানুষ একে অপরকে দমন করে, পীড়ন করে, অবহেলা করে। এই অত্যাচার মানবসমাজে সীমাবদ্ধ থাকে না, নিসর্গের প্রতিও প্রসারিত হয়।

মানুষের রয়েছে যুক্তি ব্যবহারের ক্ষমতা বা 'রিজন।' এই ক্ষমতা মানুষকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে—সে ছেড়ে আসতে পেরেছে তার আদিম জৈবিক স্বভাবকে। এখন মানুষ পারে তার নিজের প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে, সে পারে সৃষ্টি করতে নতুন সত্তা। মানুষের আত্মসচেতনতা তাকে বিশ্বপ্রকৃতি থেকে পৃথক করে। বুক্‌চিনের বিখ্যাত উক্তি 'হিউম্যানস আর নেচার রেন্ডার্ড সেলফ-কনশাস'। ফলে নেচার বা প্রকৃতির দুটো পরিচয় আমরা পাই—তার আদি পরিচয় বা প্রকৃতির আত্মসচেতনতাবিহীন পরিচয়, আর তার রূপান্তরিত পরিচয় যা প্রকৃতির আত্মসচেতনতাযুক্ত পরিচয়। বিবর্তনের প্রেক্ষাপটে মানুষ আসার আগের রূপকে যদি বলি 'আদিপ্রকৃতি' তা হলে বলা যায় এই আদিপ্রকৃতির রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে জন্ম নিল মানুষ—যে স্বরূপত যৌক্তিক বা 'র‍্যাশনাল'।

রবীন্দ্রনাথও একই কথা বলেছেন:

'পৃথিবীতে বর্বর মানুষ জন্তুর পর্যায়ে। কেবলমাত্র তপস্যার ভিতর দিয়ে সে হয়েছে জ্ঞানী মানুষ। আরও তপস্যা সামনে আছে, আরও স্থূলত্ব বর্জন করতে হবে...'। ("শেষ কথা": 'তিন সঙ্গী')

তা হলে বলা যায় এই দুই প্রকৃতির সম্বন্ধ হবে বি-সম। বি-সম, কারণ আদিপ্রকৃতির নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা নেই, অথচ রূপান্তরিত প্রকৃতি স্বরূপত 'স্ব-নিয়ামক', কারণ তা যৌক্তিক। আদিপ্রকৃতি ও রূপান্তরিত প্রকৃতির এই ক্ষমতার পার্থক্যের জন্য কোনোদিনই আদিপ্রকৃতি তার নিজের স্বার্থে নিজের মতো করে তার অধিকারের বোঝাপড়া করে নিতে পারবে না —যেহেতু তার অধিকার নেই।

বুক্‌চিন মনে করেন শোষণের নানা স্তর-ভেদ আছে। সামাজিক স্তরে মানুষ শোষণ করে মানুষকে আর এই শোষণের অপর একটি স্তরে মানুষ শোষণ করে প্রকৃতিকে। শোষণের ব্যাপকতর স্তরই হল অন্তর্বর্তী স্তরে শোষণের হেতু। নিসর্গের ওপর মানুষের অনৈতিক শোষণ দূর করতে হলে আগে সামাজিক স্তরে তা দূর করতে হবে। বুক্‌চিন মনে করেন নৈতিক ও রাজনৈতিক বিচার মানবসমাজের মধ্যেই

Scanned with

সীমাবদ্ধ থাকে। নিসর্গপ্রকৃতির যেহেতু যুক্তি ব্যবহারের ক্ষমতা নেই সেহেতু সে কখনই নৈতিক বা রাজনৈতিক বিধান জোগাতে পারে না, যদিও সে নৈতিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের শিকার হতে পারে। যুক্তি ব্যবহারে মানুষের রয়েছে একচেটিয়া ক্ষমতা, এখানেই তার শ্রেষ্ঠত্ব, এই ক্ষমতার বলেই নিসর্গের প্রতি তার দায়বদ্ধতা বর্তায়।

এই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে হলে যুক্তিবাদী জীব হিসেবে প্রথমে তাকে দূর করতে হবে সামাজিক অসাম্য, দূর করতে হবে মানুষের প্রতি মানুষের বৈষম্যমূলক আচরণ। এর জন্য চাই যুক্তিনির্ভর সমাজ। আবেগ, সহানুভূতি, সহমর্মিতা—সবেরই মূলে প্রতিষ্ঠা করতে হবে যুক্তির নিয়ামক শক্তিকে; তবেই গড়ে উঠবে সত্যিকারের একটি যৌক্তিক কালচার বা সংস্কৃতি। বুক্‌চিনের সামাজিক-নিসর্গনীতি মূলত 'হিউম্যানিস্ট এনলাইটেনমেন্ট' বা মানবিক জ্ঞানালোকবাদের অনুগামী। প্রসঙ্গত বলা যায় যে এই মতের সঙ্গে মরমী চেতনা বা মিস্টিসিজম বা অধ্যাত্মবাদ কোনোটাই খাপ খায় না। বুক্‌চিনের মতে মানুষ যে শুধু যুক্তিবাদী জীব তাই নয়, তার এই পরিচয় তাকে করে তোলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। যুক্তির অধিকারী বলে সমগ্র নিসর্গ প্রকৃতি পরিচালনার দায়িত্ব ন্যায্যতই তার ওপর ন্যস্ত রয়েছে। নারী-নিসর্গনীতিবাদীরা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি আছে এটা স্বীকার করেও মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন না। তাঁরা মনে করেন সামাজিক-নিসর্গনীতিবাদীরা অযথা মানুষের যৌক্তিক স্বরূপের সঙ্গে তার ক্ষমতাশালী হওয়ার একটা আবশ্যিক সম্পর্ক দেখতে পান। যুক্তির নিরিখে সব কিছুকে পরিচালনা করার তাঁদের এই চেষ্টার মধ্যে যেন কাজ করে যাচ্ছে এক ধরনের যুক্তির সাম্রাজ্যবাদ।

নারী-নিসর্গনীতিবাদীরা বুক্‌চিনের সঙ্গে একমত হয়ে বলেন মানুষের প্রতি মানুষের বৈষম্যমূলক আচরণ আর প্রকৃতির প্রতি প্রভুত্বের ভাব পোষণের মধ্যে যোগ অবশ্যই আছে। তবে তাঁরা মনে করেন না যে এই ব্যবহারের মূলে আছে বিচার-বুদ্ধির অভাব। তাই এও তাঁরা বিশ্বাস করেন না যে মানুষের যৌক্তিক প্রেক্ষিত প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে সমদর্শী হয়ে উঠবে। বরঞ্চ নারী-নিসর্গনীতিবাদীরা অভিযোগ করেন যে মানুষ খুব সুচিন্তিতভাবে যুক্তিকে কাজে লাগিয়েই (যুক্তির দোহাই দিয়ে) মানুষকে ও প্রকৃতিকে পীড়ন করে চলে। যুক্তির চালিকাশক্তির ওপর সম্পূর্ণ আস্থাশীল হতে পারেন না বলে নারী-নিসর্গনীতিবাদীরা সামাজিক-নিসর্গনীতিবাদের

ওপরও ভরসা করেন না। পিতৃতন্ত্রই মানুষের দমনমূলক, বিভেদমূলক আচরণের জনক।

আমরা বলেছি 'ইন্টারনাল গ্রীন ডিবেট'-এর তিন শরিক। তাদের মধ্যে সামাজিক-নিসর্গনীতিবাদের কথা কিছুটা জানা গেল, এবার বিচার করা যাক 'ডিপ-ইকোলজি' বা নিবিড়-নিসর্গনীতির বক্তব্যটিকে। 'ডিপ-ইকোলজি' পদটি প্রথম ব্যবহার হয় নরউয়েজিয়ান দার্শনিক আরনে নেস্-এর "দ্য শ্যালো অ্যান্ড দ্য ডিপ, লঙ রেঞ্জ ইকোলজি মুভমেন্ট" প্রবন্ধে ১৯৭৩-এ। এই মতবাদ সামাজিক নিসর্গনীতিবাদের ঘোর বিরোধী। নিবিড়-নিসর্গনীতিবাদীরা মনে করিয়ে দেন যে মানুষের যেমন স্বকীয় মূল্য আছে তেমনই অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদেরও স্বকীয় মূল্য আছে। প্রাকৃতিক সম্পদ স্বতই মূল্যবান—একটি গাছ বা পাথরের মূল্য মানুষের নিরিখে স্থির হয় না। প্রকৃতির অন্তর্নিহিত মূল্য স্বীকার করাটা নিবিড়-নিসর্গনীতিবাদের গোড়ার কথা।

গভীর-নিসর্গনীতিবাদের মূল প্রতিপাদ্যটি মেনে নিয়ে নানা ধরনের মতবাদ গড়ে উঠেছে। পিটার সিঙ্গারের রচনায় আমরা এক ধরনের নিবিড়-নিসর্গনীতিবাদের সমর্থন পাই। তিনি মনে করেন না যে নৈতিক অধিকার মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তাঁর মতে প্রকৃতিরও নানা অধিকার আছে। এই অধিকারগুলি আরোপিতও নয়, পরাশ্রয়ীও নয়। যেমন গাছ, ফুল, পাখি সবেরই অধিকার আছে টিকে থাকার, বিকশিত হওয়ার। নিবিড়-নিসর্গনীতির সব সমর্থকরা স্বীকার করেন যে মানবকেন্দ্রিকতা দুষ্য। এই অংশে নারী-নিসর্গনীতিবাদীদের কাছে নিবিড়-নিসর্গনীতিবাদ প্রশংসনীয়।

সিঙ্গারের মতো দার্শনিকরা যখন মানবকেন্দ্রিকতা থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে নিসর্গপ্রকৃতির স্বকীয় মূল্য স্বীকারের কথা বলেন তখন তাঁরা পুরুষতন্ত্র থেকে সরে আসার আবশ্যকতা অনুভব করেন না। এঁরা নতুন করে মানুষ আর প্রকৃতির সম্পর্ক ঢেলে সাজানোর সময় পুরুষতান্ত্রিক সভ্যতার অন্তর্নিহিত সঙ্কট সম্বন্ধে অনবহিত থেকেই যান। এর ফলে তাঁরা জড়িয়ে পড়েন একটা প্যারাডক্স বা কূটাভাসে। একদিকে তাঁরা মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নিজেদের মুক্ত করতে চাইছেন আর অপরদিকে পিতৃতন্ত্রের চিন্তাকাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ রয়ে যাচ্ছেন। মানুষের সমাজকে তাঁরা ঢেলে সাজানোর কথা ভাবছেন না অথচ প্রকৃতিকে স্বাধিকার দেওয়ার চেষ্টা করছেন—এইভাবে সৃষ্টি হচ্ছে একটা দ্বান্দ্বিক অবস্থা।

নারী-নিসর্গনীতিবাদীরা মনে করেন পিতৃতন্ত্রের চিন্তা-ভাবনার মধ্যে একটা ধারণা

Scanned with

বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এই ধারণাটি জড়িয়ে আছে ফ্রয়েডের মনস্তাত্ত্বিক বিচারের সঙ্গে। পিতৃতন্ত্রে যাঁরা দীক্ষিত তাঁরা মনে করেন প্রতিটি পূর্ণাঙ্গ মানুষ স্বতন্ত্র এবং স্বনির্ভর। সম্পূর্ণ মানসিক স্বনির্ভরতা অর্জন করতে না পারলে কারোর ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটে না—তা সে পুরুষই হোক বা নারীই হোক। এই ফ্রয়েডীয় ধারণা অনুসারে পুরুষ বা নারী যতক্ষণ অপরের সাহায্যে সিদ্ধান্ত নেয় ততক্ষণই বলা যায় তার শৈশব কাটেনি—সে প্রাপ্তবয়স্ক জীবন যাপন করছে না।

এমন স্বনির্ভর হয়ে ব্যক্তিত্ব বিকাশের অনুশীলনের গোড়ায় গলদ আছে বলে নারী-নিসর্গনীতিবাদীরা মনে করেন। তাঁরা বলেন, পুরুষ বা নারী কেউই সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর হতে পারে না। পরস্পরের ওপর ভর করেই গড়ে ওঠে আমাদের ব্যক্তিত্ব। এ ছাড়াও আছে পুরুষদের মধ্যে নারীসুলভ গুণ, যদিও পুরুষতন্ত্র তা অস্বীকার করতে বা খাটো করতে শেখায়। তাদের মতে মেয়ের পুরুষালি গুণ বা পুরুষের মেয়েলি গুণ থাকার অর্থ প্রাপ্তবয়সসুলভ ব্যক্তিত্বের অভাব। পুরুষতন্ত্র শুধু যে পুরুষ ও নারীর মধ্যে পার্থক্য বজায় রাখার পরামর্শ দেয় তা নয়, মানুষ ও প্রকৃতির ক্ষেত্রেও অনুরূপ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয়। পাশাপাশি এটাও বলা হয় পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে যতটা ভেদ আছে নারী ও প্রকৃতির ভেদ ততটা নয়—যেহেতু নারী ও প্রকৃতি উভয়ের রয়েছে পালিকা-শক্তি, জীবনদায়িনী-শক্তি এবং এ জাতীয় আরো নানা সাদৃশ্য। এমন স্বনির্ভর হয়ে ব্যক্তিত্ব বিকাশের গোড়ায় গলদ আছে বলে নারী-নিসর্গনীতিবাদীরা মনে করেন—পুরুষ বা নারী কেউই সম্পূর্ণত আত্মনির্ভর হতে পারে না। পরস্পরের ওপর ভর করেই গড়ে ওঠে আমাদের ব্যক্তিত্ব।

নারী-নিসর্গনীতিবাদীরা বিভাজন স্বীকার করেন কিন্তু বিভেদ স্বীকার করেন না। ফলে পুরুষ/স্ত্রী, মানুষ/প্রকৃতি, সংস্কৃতি/প্রকৃতি এই বিভাজনগুলি মেনে নিয়েও তাঁরা বলবেন না যে এই জুটিগুলির প্রথম পদটি সর্বদাই তুলনামূলক ভাবে দ্বিতীয় পদটির চেয়ে উৎকৃষ্ট। তাঁরা জোরের সঙ্গে এও বলেন যে একটি জুটির কোনো পক্ষ দুর্বল হলে অপরপক্ষের তাকে শাসন বা পরিচালনার অধিকার জন্মায় না, ঠিক যেমন পার্থক্য থাকলেই তা থেকে একপক্ষকে উৎকৃষ্ট ও অপরপক্ষকে নিকৃষ্ট বলা সঙ্গত নয়, যদিও আমাদের এইভাবেই চিন্তা করতে শেখানো হয়। একটা বিভাজন করা মাত্রই উভয় বিভাজ্য পদে পৃথক পৃথক মূল্য আরোপ করতে শেখায় পিতৃতন্ত্র।

'ডিপ ইকোলজি' বা নিবিড়-নিসর্গনীতির সঙ্গে নারী-নিসর্গনীতির বিতর্ক কখনও কখনও খুব সূক্ষ্ম আকার ধারণ করে। যে নিবিড়-নিসর্গনীতিবাদীরা পুরুষতন্ত্রের সমালোচনা না করে কেবলমাত্র প্রকৃতির বাড়তি অধিকার মেনে নেওয়ার মধ্যে তাঁদের কর্মসূচিকে সীমাবদ্ধ রাখেন তাঁদের সঙ্গে নারী-নিসর্গনীতিবাদীদের পার্থক্যটা স্থূল। কিন্তু আর এক দল নিবিড়-নিসর্গনীতিবাদী আছেন যাঁরা প্রকৃতির তুলনায় মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব, পার্থক্য সবই অস্বীকার করে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হওয়ার কর্মসূচি গ্রহণ করেন। তাঁদের শ্লোগান হল 'নেচার ফার্স্ট' (nature first)— প্রকৃতির দাবি আগে। মানুষকে সবরকম আসক্তি ত্যাগ করে, আত্মশ্লাঘা ত্যাগে ব্রতী হয়ে, প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হতে হবে। এই একাত্মতার জন্য চাই মানসিক স্তরে পরিবর্তন। আধ্যাত্মিক উত্তরণ-ছাড়া এটা ঘটানো সম্ভব নয়। ফলে নিবিড়-নিসর্গবাদের প্রকল্প হয়ে দাঁড়ায় নৈতিক, রাজনৈতিক নয়। তাঁদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করা যাবে না যে তাঁরা যুক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে বা সংস্কৃতিকে প্রাধান্য দিয়ে পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেন।

নারী-নিসর্গনীতিবাদীরা মনে করেন যে নিসর্গনীতির সমস্যাটি মূলত 'ইকো-জাস্টিস' বা 'নিসর্গ-ন্যায়' সম্পর্কিত প্রশ্ন, যার সমাধান একমাত্র রাজনৈতিক উপায়েই হতে পারে। এর ফলে একদিকে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে নতুন করে সাজাতে হবে আর অন্যদিকে সংস্কৃতির মধ্যে নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্বন্ধের নববিন্যাস ঘটাতে হবে। ইকো-জাসটিস-এর ভাগ-বণ্টনে প্রকৃতি নিষ্ক্রিয় দাবি-হীন শরিক যেমন নয় তেমনি সংস্কৃতি নির্মাণের ক্ষেত্রটিও একচেটিয়া পুরুষের নয়—এই নির্মাণে স্ত্রীরও ভূমিকা আছে। এমন ভাবলে ভুল হবে যে স্ত্রী, পুরুষ ও প্রকৃতি তিনেরই স্বতন্ত্র অধিকারের এলাকা আছে এবং ইকো-জাস্টিস-এর দায়িত্ব হল এই তিনের মধ্যে অধিকারের নৈতিক বণ্টন ঘটানো বা নৈতিক দায়-দায়িত্ব বণ্টন করা। নারী-নিসর্গনীতিবাদীরা মনে করেন এই বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রতিটি ভাগীদারের দায়-দায়িত্ব কোথাও স্বতন্ত্র, কোথাও স্বতন্ত্র নয়, কখনও এককভাবে দায়িত্বপালন করতে হয়, কখনও আবার যৌথভাবে দায়িত্ব পালনের দায় বর্তায়। এই নির্ভরশীলতা ও স্বনির্ভরতার সীমানা বদল হতে থাকে। কোনো এক-কালে দাঁড়িয়ে সর্বকালের জন্য অধিকার ও দায়িত্ব বণ্টনের বিধিব্যবস্থা করা যায় না।

নারী-নিসর্গনীতিবাদীরা তাঁদের বক্তব্য বোঝানোর জন্য তালি দেওয়া কাঁথার

Scanned with

রূপক ব্যবহার করে থাকেন। কাঁথার প্রতিটি তালির নিজস্ব জীবনেতিহাস আছে—এখানে তারা স্বতন্ত্র। তালিগুলি একই কাঁথায় গাঁথা থাকে বলে কাঁথাটির একটি সমগ্ররূপ তৈরি হয়, এখানে তালিগুলি সমন্বিত। সে রূপের মধ্যে বৈচিত্র্যগুলি বিধৃত হয়ে থাকে। অথচ এই তালিগুলির কোনো আবশ্যিক 'সামান্য লক্ষণ' নেই। এই রূপকের সাহায্যে আমাদের নিসর্গ-নীতির সমস্যা বুঝতে হবে। বিচিত্র গুণের বিচিত্র মানের সদস্য যখন জড়াজড়ি করে বাঁচতে চায়, অর্থাৎ কেউ-ই তার স্বকীয়তা বিসর্জন দিতে চায় না, তখন একটা একরৈখিক সমাধান দিয়ে তাদের সমস্যা দূর করা যায় না—সমস্যার সরলীকরণ হয় মাত্র। এতদিন যাবৎ পিতৃতন্ত্র সরলীকরণের পন্থা অবলম্বন করে চলেছে। নারী-নিসর্গনীতিবাদীরা মনে করেন যে সমস্যার প্রকৃত স্বরূপ যদি তাঁরা তুলে ধরতে পারেন তা হলে তা হবে একটা বড় মাপের কাজ যা ভবিষ্যৎ কর্মীদের নির্দেশ যোগাবে।

তাঁরা এই সমস্যার সমাধান খুঁজে বার করতে চান শান্তির রাজনীতির মাধ্যমে। তার জন্য তাঁরা কিছু কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেছেন। যে মতবাদ মানব-অতিরিক্ত 'নন-হিউম্যান' পরিবেশকে অযথা দমন করে বা কষ্ট দেয় নারী-নিসর্গনীতি সে মতের বিরোধী। সেইসঙ্গে নারী-নিসর্গনীতিবাদীরা পিতৃতন্ত্রের প্রচ্ছন্ন অবদমনের মুখোস খোলার নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যান।

পিতৃতন্ত্রের একটা বিপজ্জনক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়—বলার চেষ্টা করা হয় যে, যে ভুক্তভোগী তার অসুবিধে সে নিজে যতটা ভাল বোঝে বাইরের লোকে তা তার চেয়ে ঢের ভাল বোঝে। নারী-নিসর্গনীতিবাদীরা মনে করেন সকলকে তাদের নিজের মতো করে সুখ-দুঃখের উপলব্ধি ব্যক্ত করতে দেওয়া উচিত। তত্ত্বের অনুষঙ্গে নারী-নিসর্গনীতিবাদীরা বহু-তত্ত্ববাদী। একই সমস্যার বহু ব্যাখ্যা সম্ভব, বহুবিধ সমাধানও সম্ভব। আমরা একই সঙ্গে বিবিধ তত্ত্ব নিয়ে কাজ চালাতে পারি এবং চালানো উচিতও। শেষ উত্তর দেওয়ার অধিকার কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নেই। এই কারণেই তাঁদের মতে কোনো তত্ত্বই ইতিহাস-নিরপেক্ষ নয়, সব তত্ত্বই প্রেক্ষাপট নির্ভর। নারী-নিসর্গনীতিবাদের গোড়ার কথা এই যে তাঁরা মনে করেন মানুষ আবশ্যিকভাবে একে অপরের সঙ্গে ও নিসর্গের সঙ্গে সম্পর্কিত—এই সম্পর্ক আপতিক নয়—এই সম্পর্কগুলি সামাজিক নির্মাণের ফসল। সমাজকে অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই—সমাজকে বদল করা যায় মাত্র। একমাত্র দরদ থাকলেই আমরা প্রভেদ সত্ত্বেও

বি-সম আচরণ থেকে বিরত থাকতে পারি, ক্ষমতার তারতম্য আছে জেনেও দুর্বলকে পীড়ন করা থেকে ক্ষান্ত হতে পারি।

নারী-নিসর্গনীতিবাদীরা যে সব নৈতিক গুণ সমর্থন করেন তার মধ্যে রয়েছে দরদ বা 'কেয়ার', মৈত্রী, আস্থা, ভালবাসা, দেওয়া-নেওয়ার ক্ষমতা। এই আচরণ অনুশীলনের প্রসঙ্গ উঠছে কারণ এই মতে মানুষের নৈতিক গুণ তথা ব্যক্তিত্ব সর্বদাই সৃজিত, জন্মদত্ত নয়। নারী-নিসর্গনীতিবাদ ভবিষ্যৎ সমাজের নৈতিক চিন্তাধারার একটা প্রকল্প মাত্র। এঁদের কাছ থেকে 'ইকো-জাস্টিস'-এর নির্দিষ্ট বিধি কী হবে তার কোনো তালিকা পাওয়া যায় না, যা পাওয়া যায় তা হল নৈতিক বিধির কতকগুলি নির্দেশিকা যার থেকে বিশেষ বিধি প্রয়োজনমতো নির্মাণ করা যায়।

এঁদের প্রাথমিক কর্মসূচি প্রধানত দুটি:

এক, প্রতিটি ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব যে অপরাপর ব্যক্তি ও নিসর্গের সঙ্গে নানা সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠে তা স্বীকার করা। ব্যক্তি কখনই একটা আণবিক তন্মাত্র নয়। এই চিন্তাধারা ভারতীয় দর্শনে কিয়দংশে প্রতিফলিত হয়েছে—বিশেষ করে যেখানে মানুষের বিভিন্ন জন্মদত্ত ঋণের কথা বলা হয়েছে। মানুষ, জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ, সবই পৃথক পৃথক সত্তা নিয়ে আসে—তারপর কোনো এক পদ্ধতিতে তাদের একত্রে রাখা হয়—এমনটি নয়। মনে করতে হবে এরা সবাই গোড়া থেকেই পরস্পরনির্ভর।

দুই, যে কথাটা বলা হচ্ছে, তা হল গবেষণার পদ্ধতি বা মেথডলজি বিষয়ে। নারী-নিসর্গনীতিবাদীরা একযোগে বহু পদ্ধতি স্বীকার ও প্রয়োগে বিশ্বাসী, তাই এ মতটিকে বলা যায় 'মেথডলজিকাল প্লুরালিজম' বা 'বহুপদ্ধতিবাদ'। কোনো একটি মেথডকে প্রাধান্য দিলে জ্ঞানের চাবিকাঠির মালিকানা তাকেই দেওয়া হয়। বহুপদ্ধতিবাদ এই প্রচলনের বিরোধী।

এ দুটি শর্ত মেনে নিলে—অর্থাৎ মানুষ প্রকৃতি সৃষ্টির প্রথমক্ষণ থেকে নানা আবশ্যিক সম্বন্ধে আবদ্ধ এবং বহুজনের অভিজ্ঞতা দিয়ে, বোঝা দিয়ে, ব্যাখ্যা দিয়ে, জ্ঞানের নকশি-কাঁথা সৃজিত হয়—মানুষের রাজনীতির উদ্দেশ্য বদলে যাবে। এবার লক্ষ্য হবে কী করে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ঠেকানো যায়, কী করে মানুষ তার বিভিন্ন ঋণ শোধ করতে পারে। নারী-নিসর্গনীতিবাদীরা মনে করেন এটা হবে একটা দীর্ঘমেয়াদি লড়াই, কারণ আমাদের এতদিনের চিন্তা-ভাবনার সংস্কার কখনোই রাতারাতি বদল হবে না।

Scanned with

এই দীর্ঘমেয়াদি লড়াই-এর উদ্দেশ্য হবে নারীকে তার নিজের কথা নিজের মতো করে বলতে দেওয়া। এ যে কত কঠিন কাজ তা আমাদের দেশের অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যায়। সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ নেওয়া সত্ত্বেও নারীর এম্পাওয়ারমেন্ট হচ্ছে না। এই সমস্যাটির নানা মাত্রা একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, জট ছাড়ানো কঠিন। খাতায়-কলমে বিধি-ব্যবস্থার পরিবর্তন হলেও বাস্তবে তা রূপায়িত হয় না। কেন হয় না, তার বিবিধ সমস্যা নিয়ে পরের অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

অষ্টম অধ্যায়

* এম্পাওয়ারমেন্ট

ইদানীং সরকারি এবং বেসরকারি মহলে খুব বেশি করে যেন নারীর ক্ষমতা অর্জন বা 'এম্পাওয়ারমেন্ট' নিয়ে চিন্তাভাবনা হচ্ছে। তারই একটা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় কেন্দ্রীয় সরকারের 'স্বয়ংসিদ্ধা' প্রকল্পে। 'স্বয়ংসিদ্ধা'—এই সমাসবদ্ধ পদের মধ্যে রয়েছে একটা অর্জনের দ্যোতনা, নিজে থেকে একটা কিছু হয়ে ওঠার প্রতিশ্রুতি। ২৯ নভেম্বর ২০০১ দিল্লিতে প্রকল্পটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদঘাটিত হয়। প্রধানমন্ত্রী এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এর থেকে এই কর্মসূচির গুরুত্ব খানিকটা অনুমান করা যায়। এই প্রকল্পের জন্য ১১৬.৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে যে প্রায় নয় লক্ষ মহিলাকে এর আওতায় আনা যাবে।

ঘোষিত পরিকল্পনা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে এন জি ও প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত সকলের ওপর দায়িত্ব থাকবে এই প্রকল্প রূপায়ণের। 'স্বয়ংসিদ্ধা' যোজনার দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য নারীকে সর্বতোভাবে বলীয়ান করে তোলা, তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা অর্জনও এর অন্তর্ভুক্ত। উদ্দেশ্য হবে নারীকে সরাসরি ধন উপার্জনের সংস্থান করে দেওয়া এবং তাকে সেই সংগতি লগ্নির ক্ষমতা দেওয়া।

দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যের পাশাপাশি একটি স্বল্পমেয়াদি লক্ষ্যের তালিকাও এই যোজনার অন্তর্ভুক্ত। এই তাৎক্ষণিক লক্ষ্যগুলি হল:

(ক) স্বনির্ভর মহিলাগোষ্ঠী নির্মাণ ;

(খ) এই গোষ্ঠীর মহিলাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ানো ও তাদের সজাগ করে তোলা ;

(গ) গ্রামীণ মহিলাদের সঞ্চয়ের অভ্যাস তৈরি করা ;

(ঘ) মহিলাদের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ সহজলভ্য করা ;

(ঙ) স্থানীয় উন্নয়নের কর্মসূচিতে মহিলাদের শামিল করা।

Scanned with

'স্বয়ংসিদ্ধা' যোজনার অনুষঙ্গে উল্লেখ করা যায় এই জাতীয় আর একটি সরকারি কর্মসূচির কথা—'দ্য ন্যাশনাল পলিসি ফর দ্য এম্পাওয়ারমেন্ট অব উইমেন, ২০০১'। একই বছরে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ভারতের মেয়েরা দুটি প্রকল্প পেলেন। উভয় প্রকল্পে নারীকে আরও সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা দেওয়ার সুপারিশ আছে এবং সামাজিক চর্যায় নারীকে স্থান দেওয়ার নির্দেশ আছে।

প্রশ্ন হচ্ছে ভারতের নারীকে সক্ষম করে তোলার জন্য যুগপৎ এতগুলি প্রকল্প এবং তদন্তরবর্তী সুপারিশ ও নির্দেশ প্রয়োজন হচ্ছে কেন? এই প্রশ্নের আংশিক উত্তর পাওয়া যায় ২০০১-এর পলিসির মুখবন্ধে। সেখানে বলা হয়েছে যে, ভারতীয় সংবিধান রচনার সূচনাপর্বেই লিঙ্গ-সাম্যের উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া সংবিধানের একাধিক ধারায়ও বলা আছে যে লিঙ্গের ভিত্তিতে বৈষম্য অনুমোদন করা হবে না। এই কথাটা সংবিধানের মুখবন্ধে আছে, মৌলিক অধিকার অংশে আছে, মৌলিক কর্তব্যের তালিকার মধ্যেও আছে; এমনকি সংবিধানের ডিরেক্টিভ প্রিন্সিপল বা নিয়ামক বিধির মধ্যেও আছে। ভারতের সংবিধানে শুধু যে নারী ও পুরুষের সাম্যের কথা বলা হয়েছে তা নয়, সেই সঙ্গে রাষ্ট্রকেও বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া আছে যার বলে রাষ্ট্র নারীর প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করতে পারে।

এত সত্ত্বেও সংবিধান প্রণয়নের ৫০ বছর পরে ২০০১ সালে মেয়েদের জন্য আলাদা একটা 'পলিসি'র প্রয়োজন কেন হল তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পলিসির ভূমিকায় বলা হয়েছে যে ভারতবর্ষে মেয়েদের হাল ফেরানোর উদ্দেশ্যে সংবিধানে, আইন-আদালতে এবং বিভিন্ন পলিসি ও প্রকল্পে যে লক্ষ্য সামনে রাখা হয়েছে আর কার্যত দৈনন্দিন জীবনে যা পালিত হচ্ছে এই দুই-এর মধ্যে রয়েছে বিস্তর ব্যবধান। এই প্রসঙ্গে পলিসির ভাষাটি এরকম: 'However, there still exists a gap between the goals enunciated in the Constitution, legislation, policies, plans, programmes and related mechanisms on the one hand and the situational reality of the status of women in India, on the other.'

বিভিন্ন পলিসির সঙ্গে 'সিচুয়েশনাল রিয়ালিটি' বা বাস্তব অবস্থার ব্যবধান যে রয়েছে তার তথ্যসূত্র এ ক্ষেত্রে দুটি। পলিসিটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে প্রধানত দুটি রিপোর্টের ভিত্তিতে। তাদের একটি হল ১৯৭৪এ প্রস্তুত 'রিপোর্ট অব দ্য কমিটি অন দ্য স্টেটাস অব উইমেন ইন ইন্ডিয়া', আর অপর রিপোর্টটি ১৯৮৮-র 'শ্রমশক্তি রিপোর্ট'।

'ন্যাশনাল পলিসি ফর দ্য এম্পাওয়ারমেন্ট অব উইমেন ২০০১'-এ বাস্তব দুরবস্থার কথা বলা হয়েছে—পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে প্রতিবছর ১৫,০০০ নারী ও শিশু বাংলাদেশ থেকে ভারতে পাচার হয়, আর ১০,০০০ আসে নেপাল থেকে। আমাদের দেশে অনৈতিক পাচার সম্বন্ধে 'Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956' থাকা সত্ত্বেও তার প্রয়োগ খুবই বিরল। ১৯৯৯ সালে সারা দেশে মাত্র ৮,৫০০ ঘটনা নথিভুক্ত করা হয়, যার ছয় শতাংশ নথিভুক্ত হয় তামিলনাড়ুতে, পশ্চিমবঙ্গে ২৫,০০০ ঘটনার মধ্যে ৪,০০০-এরও কম নথিভুক্ত হয়। কাজেই বোঝা যাচ্ছে উদ্বেগের যথেষ্ট কারণ আছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার এত বছর পরেও মেয়েদের জন্য প্রকল্প ও তার রূপায়ণের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান নিরাশ করে।

সব দেশেই ক্ষমতা বিন্যাসের একটা প্রতিষ্ঠিত ছক রয়েছে যার প্রান্তে রয়েছে মেয়েরা। সমস্যা হল, কী করে প্রান্তিক অবস্থা থেকে মেয়েদের ক্ষমতার কেন্দ্রে আনা যায়? আমাদের দেশের যোজনাগুলির পেছনে যে চিন্তাধারা কাজ করে চলেছে তা যেন অনেকটা এরকম: মেয়েরা যেন আইনের অপ্রণিধানবশত তাদের স্বাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে, কখনও আবার আইনের অ-প্রয়োগের ফলে তারা দুর্বল রয়ে গিয়েছে। এবার প্রয়োজন প্রায়শ্চিত্তের, কারণ সমাজ যাদের নামিয়ে রেখেছে তারা আজ সমাজকে নামাচ্ছে। এই বোধ থেকে ২০০১-এর পলিসিতে বলা হচ্ছে নারীকে সব মানব অধিকারের 'ডি জুরে' (*'de jure'*)বা আইনি অধিকার এবং ডি ফ্যাক্টো (*'de facto'*) অর্থাৎ কার্যকরী অধিকার দিতে হবে। এও বলা হচ্ছে যে মেয়েদের বিরুদ্ধে সবরকম বৈষম্য দূর করার জন্য আইন-আদালতে উপযুক্ত পরিবর্তন আনতে হবে। পলিসিটির প্রতিটি সুপারিশের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ না করেও মোটা দাগে তার বক্তব্যটি বিচার করলে বোঝা যাবে আবারও কেন পলিসির লক্ষ্যের সঙ্গে বাস্তব অবস্থার ব্যবধান অপরিবর্তিত থাকার আশঙ্কা রয়ে গিয়েছে।

আইনানুগ অধিকার ও বাস্তব অধিকারকে মিলিয়ে দেওয়ার এই সুপারিশটিকে পর্যালোচনা করা যেতে পারে। ধরা যাক, আদালত আদেশ দিলেন যে একটি মহিলা বা পুরুষের দাম্পত্য অধিকার পুনর্বহাল করা হোক, আইনের পরিভাষায় যাকে বলে 'রেস্টিটিউশন অব কনজুগাল রাইটস' (restitution of conjugal rights)। এবার বাস্তবে এই আদেশটি পালিত হচ্ছে কিনা তার নজরদারি কে করবে?

আইনের মাধ্যমে লিঙ্গ-বৈষম্যের মোকাবিলার সমস্যার অন্য একটা দিকও আছে।

Scanned with

আমাদের যাপনের পরিমণ্ডলের মধ্যে যদি লিঙ্গ-বৈষম্য প্রোথিত থাকে তাহলে তা দেশের বিধি-ব্যবস্থাতেও প্রতিফলিত হবে; কারণ আইনে আমাদের চর্যার প্রতিফলন ঘটে। আইন-আদালত, পুলিশিব্যবস্থা, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, পরিবার সবই একটি অখণ্ড জীবন-যাপনের পরিমণ্ডলের মধ্যে অনুস্যূত হয়ে থাকে, একই সঙ্গে তারা একটি ক্ষমতার বলয়ও নির্মাণ করে। সমাজের অনুশাসন মেনে চললে নারী এই প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে যে সহানুভূতি ও মর্যাদা পাবে, অনুশাসন না মানলে ঠিক সেই অনুপাতে সে অবজ্ঞা ও অবহেলা পাবে।

এত বছর ধরে এত আলোচনা, এতভাবে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা, এত প্রতিবাদ ও লড়াই সত্ত্বেও নারী যে পারছে না সক্ষম হতে, পারছে না 'আপন ভাগ্য জয়' করে নিতে তার একটা প্রধান অন্তরায় সামাজিক অনুশাসন। অনুশাসন মাত্রই খারাপ নয় কিন্তু যে অনুশাসনে দ্বিচারিতা আছে, যেখানে ঘোষিত নীতি ও পালিত নীতির মধ্যে প্রভেদ আছে সে অনুশাসন অশুভ। তাছাড়া যাদের জন্য অনুশাসন তাদের মঙ্গল যদি ভাবা না হয়, অনুশাসন প্রণয়নে যদি তাদের ভূমিকা না থাকে, তবে সে অনুশাসন অকল্যাণকর। তবে এমন অনুশাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোরও কতকগুলি বিপদ আছে। যে সমাজে লিঙ্গ-বৈষম্য বর্তমান, যেখানে নারীর ক্ষমতা খর্ব করা হয়, সেই সমাজে রুখে দাঁড়াতে গেলে মেয়েদের অপবাদ, অবজ্ঞা, কটূক্তি সবই সহ্য করতে হবে। চিরাচরিত ভূমিকা থেকে নারীর আচরণের পার্থক্য ঘটলে সেই আচরণকে নিছক ব্যতিক্রমী বলা হবে না। বলা হবে অস্বাভাবিক, স্বার্থপর বা অনৈতিক, অধার্মিক, অসামাজিক ও ব্যভিচারী।

নারীকে পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী হতে-না-দেওয়ার পেছনে নিশ্চয় কোনও স্বার্থের যোগ আছে। কোনো গোষ্ঠীর প্রয়োজনসিদ্ধির সঙ্গে যোগ না থাকলে এমন বৈষম্য কায়েম থাকতে পারত না। শুধু স্বার্থ নয় সেই সঙ্গে স্বার্থসিদ্ধির ক্ষমতাও নিশ্চয় কোনও মহলের আছে। একদিকে ক্ষমতার স্থিতাবস্থা অটুট রাখার স্বার্থ, আর অন্য দিকে অবস্থান্তর ঘটানোর জন্য রয়েছে নানা মহল থেকে চাপ। ইদানীং নারীকে সক্ষম করার জন্য আন্তর্জাতিক মহলের কাছে ভারত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ; এছাড়া আছে ভোটের রাজনীতি এবং স্ব-দেশে মহিলা সংগঠনগুলির চাপ। এমনই নানা চাপে এক-একটা প্রকল্পের জন্ম হয়, নতুন নতুন আইন প্রণীত হয়। অথচ এই বদলগুলো মন থেকে মেনে-না-নেওয়ার ফলে আইনের সঙ্গে একটা লুকোচুরি খেলা চলতে থাকে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের অধিকার কে দিল? সমাজে যখন একটা ক্ষমতার বিন্যাস দীর্ঘদিন ধরে চলতেই থাকে তখন তার আদি কারণ বা যৌক্তিকতা কী ছিল তা আর মনে থাকে না। কারণ বা যৌক্তিকতা ছাড়াই ক্ষমতার আস্ফালন কায়েম থাকে। যেমন দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'যোগাযোগ' উপন্যাসটিতে। সেখানে তিনি বলছেন, 'ক্ষমতা জিনিসটা যেখানে পড়ে-পাওয়া জিনিস, যার কোনও যাচাই নেই, অধিকার বজায় রাখবার জন্যে যাকে যোগ্যতার কোনও প্রমাণ দিতে হয় না, সেখানে সংসারে সে কেবলই হীনতার সৃষ্টি করে'।

পড়ে-পাওয়া ক্ষমতা যেমন হীনতার সৃষ্টি করে তেমনি এর মাতব্বরি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া দুষ্কর। কারণ যারা ক্ষমতা-ভোগে অভ্যস্ত তারা স্বেচ্ছায় সে সুযোগ ছাড়তে চায় না। অপরপক্ষে যারা ক্ষমতাকে ভয় পেতে অভ্যস্ত অথবা মেনে চলতে শিখেছে তাদেরও মুক্তমনে অবদমনের কোনও বিকল্প চিন্তা করতে অসুবিধে হয়। ক্ষমতার অর্থহীন আস্ফালনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এমনি হওয়াই তো স্বাভাবিক।

পুরুষের দ্বারা নিপীড়িত নারীর সম্বন্ধে 'যোগাযোগ'-এ রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'তারা আপনার আলো আপনি নিবিয়ে বসে আছে। তার পরে কেবলই মরছে ভয়ে, কেবলই মরছে ভাবনায়, অযোগ্য লোকের হাতে কেবলই খাচ্ছে মার, আর মনে করছে সেইটে নীরবে সহ্য করাতেই স্ত্রীজন্মের সর্বোচ্চ চরিতার্থতা'। তাঁর এই আক্ষেপ থেকে বোঝা যায় যে তিনি সমস্যাটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। পড়ে-পাওয়া ক্ষমতার চাপে 'যোগাযোগ'-এর কুমুও পিষ্ট হচ্ছিল। সে স্থির করল প্রতিবাদ করবে এবং শেষ অবধি শ্বশুরবাড়ি না ফেরার সিদ্ধান্ত নিল, কারণ সে আর পাঁচজন মেয়ের মতো 'আপনার আলো আপনি নিবিয়ে' রাখেনি। এ সত্ত্বেও দেখি প্রতিবাদের পরে এল কুমুর শ্বশুরবাড়িতে প্রত্যাবর্তন যেহেতু সে তখন মা হতে চলেছে। প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার স্থিতাবস্থা বহাল থাকল, কুমু ফিরে গেল। অনুমান করা যায় এর পর কুমুর ওপর ক্ষমতার আস্ফালন আরো বাড়ল।

'যোগাযোগ' উপন্যাসে কুমুর এই পরিণতির পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ কিন্তু মেয়েদের জন্য আরো সার্থক এবং আরো বড় একটা স্বপ্নের ইঙ্গিত দিয়েছেন। কুমুর শ্বশুরবাড়ি চলে যাওয়ার দিনে তার দাদা বিপ্রদাস বললেন, 'তুই আজ চলে যাচ্ছিস কুমু, আর হয়তো দেখা হবে না, আজ সকালে তোকে সেই-সকল বেসুরের সকল অমিলের পরপারে এগিয়ে দিতে এলুম। শকুন্তলা পড়েছিস—দুষ্মন্তের ঘরে যখন

Scanned with

শকুন্তলা যাত্রা করে বেরিয়েছিল, কণ্ব কিছুদূর পর্যন্ত তাকে পৌঁছিয়ে দিলেন। যে লোকে তাকে উত্তীর্ণ করতে তিনি বেরিয়েছিলেন, তার মাঝখানে ছিল দুঃখ-অপমান। কিন্তু সেইখানেই থামল না তাও পেরিয়ে শকুন্তলা পৌঁচেছিল অচঞ্চল শান্তিতে।' রবীন্দ্রনাথ মনে করেছিলেন সমাধানের এই পথে গেলে সৃষ্টির আনন্দলোক প্রাপ্তির মাধ্যমে সম্পর্কের সমস্ত গ্লানিকে সরিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ানো যাবে। আস্থা রাখতে হবে 'সেই-সকল বেসুরের, সকল অমিলের পরপার' একটা আছে।

এটা ঠিকই যে মেয়েদের একটা স্বপ্ন নিয়ে বাঁচতে হবে। তবে এখানে যে স্বপ্নের কথা বলা হচ্ছে তা অনেকটা 'একলা চলো রে'-র স্বপ্ন। সম্পর্কের মধ্যে থেকে সম্পর্ক উত্তরণের একটা শৈল্পিক প্রকল্প। প্রথমেই মনে হয় এটা কি সম্ভব? তারপর মনে হয় এটা কি বাঞ্ছিত? দেশ-কাল-অনপেক্ষ কোনও ব্যক্তিসত্তা যদি থেকে থাকে তবে এমন সম্পর্ক উত্তরণের প্রস্তাবের অর্থ হয়। কিন্তু নারীমুক্তি আন্দোলনের জন্য এমন প্রস্তাব যথাযথ নয়। কারণ নারী, আন্দোলনের মাধ্যমে, সম্পর্ক থেকে মুক্তি চাইছে না, সে চায় সার্থক সম্পর্ক।

'সার্থক সম্পর্ক' বর্তমান প্রেক্ষিতে অনেকটা সোনার পাথরবাটির মতো শোনাবে। তাই এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে বর্তমান প্রেক্ষিতের পরিবর্তন ঘটানো জরুরি। এর জন্য সমাজে আমূল বদল ঘটাতে হবে। ২০০১-এর পলিসিতে এই পরিবর্তন তথা কৌমের আচরণ পরিবর্তনের প্রয়োজনের কথা বলা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে যে এই কাজে নারী ও পুরুষ উভয়কেই সক্রিয়ভাবে লিপ্ত করতে হবে।

নারী ও পুরুষ উভয়কেই সক্রিয়ভাবে লিপ্ত করার প্রস্তাবটি অতি উত্তম। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কোন নারী এবং কোন পুরুষ। বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে যখন প্রাতিষ্ঠানিক রক্ষকরাই ভক্ষক তখন তাঁদের সঙ্গে আলোচনা কতটা ফলপ্রসূ হবে সে বিষয়ে সংশয় জাগে। একটি ইংরিজি দৈনিকের সংবাদে প্রকাশ বর্তমানে আমাদের দেশে প্রতি দুটি শিশুকন্যার মধ্যে একজন আঠারো বছর বয়সের আগেই যৌন হেনস্থার শিকার হয়। আরও বলা হয়েছে যে এই অন্যায়কারীদের ৭১ শতাংশই আত্মীয় বা পরিচিত ব্যক্তি। অপরপক্ষে যে নারীর স্বর সঙ্কুচিত হয় সে তার স্বর খুঁজে পায় না, অপরের পরিচালনায় জীবন যাপন করে চলে, সে কারোর মেয়ে, কারোর স্ত্রী, কারোর মা বা কারোর বোন হওয়াটাই নিজের প্রকৃত পরিচয় বলে মনে করে। নানা সম্পর্কের টানাপোড়েনে নিঃসন্দেহে আমাদের ব্যক্তিক-সত্তা তৈরি হয়।

আমরা কিন্তু ভুলে যাই যে আমরাও সম্পর্ককে তৈরি করতে পারি, এখানেই আমাদের নিজস্বতা। এই অনবধানতার ফলে সম্পর্কিত-নিজস্বতার ধারণাটি আমাদের কাছে ধোঁয়াটে ঠেকে। সমাজের ধ্যান-ধারণা পরিবর্তনে নারী পুরুষের লিপ্ত থাকার কতকগুলি অন্তরায়ের উল্লেখ করা যায়। প্রথমত, যে পুরুষের সঙ্গে আলোচনা করা হবে সে হয়তো নিজেই অন্যায়কারী; অপরপক্ষে যে নারীর সঙ্গে আলোচনা করা হবে সে হয়তো নিজের নিজস্বতা সম্বন্ধে অনবহিত। তাছাড়া ক্ষমতার উপনিবেশ বহাল রাখার জন্য অনেক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপায় অবলম্বন করা হয়। কোনো সিদ্ধান্ত না নিতে চাইলে আলোচনাকে প্রলম্বিত করা যায়। তখন সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিকল্প হিসেবে আলোচনার প্রক্রিয়াটিকে ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া ক্ষমতার অদৃশ্য দাপট সহজ আলোচনার অন্তরায় হতে পারে।

ক্ষমতাবান মাত্রই অপরকে নিয়ন্ত্রণ করে চলে, এর জন্য তার সবসময় ক্ষমতা প্রদর্শনের প্রয়োজন হয় না। কারোর ক্ষমতা আছে মনে করেও অপরে ভয়ে জুজু হয়ে থাকতে পারে। সমাজে কতকগুলি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ক্ষমতার প্রতীক বলে মনে করা হয়। এই মনে হওয়ার ফলস্বরূপ যারা ক্ষমতার বলয়ের প্রান্তে আছে তারা অধস্তনের মতো আচরণ করে। তবে ক্ষমতার অধিষ্ঠানকে সবসময় যে খুব স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায় তা নয়। ক্ষমতা কিছুটা অস্পষ্ট ও কিছুটা প্রচ্ছন্নভাবে কাজ করে চলে। মনে পড়ে যায় কাফ্‌কা বর্ণিত সেই সব পরিস্থিতির কথা যেখানে একজন সদাই ত্রস্ত হয়ে আছে অথচ তার ত্রাসের জন্য কে বা কারা দায়ী তা বোঝা যাচ্ছে না। এটা বোঝার জন্য অনেক সময় একজন সহমর্মীর প্রয়োজন হয়। 'স্বয়ংসিদ্ধা' প্রকল্পে এ জাতীয় সহমর্মী গোষ্ঠীর প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ আছে, সেখানে 'সেলফ-হেলপ গ্রুপ' বা স্ব-সহায়ক গোষ্ঠী গঠনের পরামর্শ যে শুধু দেওয়া হয়েছে তা নয়, এই গোষ্ঠীর ভূমিকার গুরুত্বের কথাও বলা আছে।

স্ত্রী-শক্তি বাড়ানো বা মহিলাদের একজোট করে সংঘবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। এর ফলে দুটো উদ্দেশ্য সফল হয়। প্রথমত, যারা একই ধরনের অবদমনের শিকার হয়ে আসছে অথচ তা নীরবে সহ্য করে চলেছে তারা স্ব-সহায়ক গোষ্ঠীর মাধ্যমে মন খুলে কথা বলার একটা জায়গা পায়, নয়তো তাদের 'বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না'। সেই অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে গেলে নিজের কাছে নিজেই সমস্যা হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ার ইতিহাস স্পষ্ট করে বুঝতে হবে।

Scanned with

একজন মহিলার ব্যথা ঠিক কোথায়, তার হতাশা কী নিয়ে, তার দুর্বলতা কোথায়, কোনটা বা তার শক্তির স্থল, তার সামনে কী কী বিকল্প আছে, ইত্যাদি বিষয়গুলি স্পষ্ট করে বোঝার জন্য পরস্পরের সঙ্গে কথা বলা দরকার। একই জাতীয় সমস্যা যাদের পীড়িত করে, যারা একই জাতীয় সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে চায়, তাদের নিয়ে স্ব-সহায়ক গোষ্ঠী তৈরি করলে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা বুঝতে আরও সুবিধে হয়। অন্যের চোখ দিয়ে নিজেকে দেখলে বা নিজের স্বর নিজের কানে শুনলে স্বনুচ্চারিত অভিজ্ঞতাগুলো নিঃসন্দেহে একটা নতুন স্বচ্ছতা পায়। মেয়েদের নিজের স্বরে নিজের সমস্যা শোনা এবং বোঝার মধ্যে দিয়েই সমস্যার নিরসন হয় না ঠিকই, সমস্যা আরও স্পষ্ট হয় মাত্র। দ্বিতীয়ত, স্ব-সহায়ক গোষ্ঠীগুলি একটি নির্ভরশীল আঁতাত গড়ে তুলতে সাহায্য করে যার মাধ্যমে সংগ্রামশীল মহিলারা নানা ধরনের মদত ও পরামর্শ পেতে পারে।

অনেকে মনে করেন মেয়েদের ক্ষমতা অর্জনের পদ্ধতিটি একটা ভিতর থেকে হয়ে-ওঠার প্রক্রিয়া, অনেকটা আত্মশক্তিতে বলীয়ান হওয়ার মতো। বলা হয় ক্ষমতা কেউ কাউকে দিতে পারে না, এটা একটা হয়ে-ওঠার অনুশীলন। ক্ষমতা অর্জন করতে হয়, সরকার বা প্রতিষ্ঠান আইনের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতার বনিয়াদ দৃঢ় করতে পারে মাত্র। 'স্বয়ংসিদ্ধা' পদটির মধ্যে এরকমই একটা দ্যোতনা আছে। স্বয়ম্ভূ যেমন নিজেই জন্ম নেয়, স্বয়ংসিদ্ধা তেমনি এককভাবে সিদ্ধিলাভ করে। মানুষ যেন নানা প্রতিকূলতার প্রভাবে পঙ্গু হয়ে থাকে, এই অবস্থাটাকে কাটিয়ে উঠতে গেলে সাধনার দ্বারা সব বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে তাকে তার স্বকীয়তা ফুটিয়ে তুলতে হবে।

স্বয়ংসিদ্ধা হওয়ার পরামর্শ তখনই ফলপ্রসূ হতে পারে যখন ধরে নেওয়া যায় যে মানুষের একটা দেশ-কাল-অনপেক্ষ স্বকীয়তা আছে, যার ফলে সংসারযাত্রায় নানাভাবে পীড়িত হয়েও আত্মশক্তির বলে অবশেষে তার উত্তরণ ঘটতে পারে। এই উত্তরণের মুহূর্তই হল স্বয়ংসিদ্ধার মুহূর্ত, এই সেই রবীন্দ্রনাথের 'সকল বেসুরের সকল অমিলের পরপার'।

ধর্মের অনুষঙ্গে এমন একটা মুক্তির প্রতিশ্রুতি হয়তো প্রেরণা জোগায়, হয়তো আশ্বাসও দেয়। অধিবিদ্যার তাত্ত্বিক কূটকচালিতে এই ধরনের ব্যাখ্যা বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে। কিন্তু লিঙ্গ-বৈষম্যের সমস্যাটি দেখা দেয় কোনও-না-কোনও সম্পর্ককে ঘিরে। সম্পর্ক উত্তরণের পরে বৈষম্যের প্রশ্নের প্রাসঙ্গিকতা আর

থাকে না। সমর্থ হওয়ার অর্থ সম্পর্ক—অনপেক্ষ একটি ব্যক্তিসত্তা নির্মাণ নয়। সিগমুন্ড ফ্রয়েড যতই বলুন না কেন যে স্বকীয়তা অর্জনের অর্থ মায়ের সঙ্গে নাড়ির টান কাটিয়ে উঠে নিজের পরিচয়ে দাঁড়ানো এবং স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী হওয়া—বাস্তবে তা হয় না। আমাদের সম্পর্কগুলোর মানে বদল হয়, অনেক সময় এক সম্পর্কগুচ্ছ ত্যাগ করে অন্য সম্পর্কগুচ্ছে প্রবেশ করতে হয়; তবুও মানুষ কখনই সম্পর্কবিহীনভাবে ব্যক্তিস্বরূপ প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। সম্পর্কিত আদানপ্রদানে ব্যক্তিস্বরূপ নিয়ত হয়ে-ওঠার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে চলে। কে কার দ্বারা কতটা প্রভাবিত হবে বা হবে না তার কোনও পূর্বনির্ধারিত ছক নেই। নিজেকে নির্মাণ করার ও অপরের দ্বারা নির্মিত হওয়ার একটা অনেকান্ততা চলে।

'স্বয়ংসিদ্ধা' প্রকল্পটিতে পুরুষের ভূমিকার কোনও উল্লেখ নেই। মানবীবিদ্যাচর্চায় পুরুষদের শামিল হওয়া সমীচীন কিনা বা নারী আন্দোলনে পুরুষের স্থান কোথায় এ নিয়ে প্রায়শ বিতর্ক শোনা যায়। মেয়েদের সমস্যা মেয়েরা যেভাবে বুঝতে পারে, ভাষায় ফুটিয়ে তুলতে পারে, বা যতটা আপন মনে করে সমস্যার সঙ্গে যুঝতে পারে, ছেলেরা তা পারে কিনা তাই নিয়ে একটা বিতর্ক আছে। এছাড়া বলা হয় মেয়েরা মেয়েদের মধ্যে যতটা নিসংকোচ হতে পারে পুরুষদের উপস্থিতিতে তা পারে না, কারণ তখন তারা হয়ে যায় ভীত ও দ্বিধাগ্রস্ত। এই প্রসঙ্গটি অত্যন্ত জটিল। হয়তো প্রাথমিক স্তরে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার প্রক্রিয়া যখন চলে তখন একটা সম-লিঙ্গ গোষ্ঠীর মধ্যে আলাপ-আলোচনার প্রয়োজনবোধ থাকে। তবুও পুরুষকে বাদ দিয়ে আলোচনা করার কথা ভাবলেই কি তা পারা যায়? যে প্রভু বাইরে থেকে প্রভুত্ব করছে বলে মনে হয় পরবর্তী পর্যায়ে দেখা যায় যে সে ভৃত্যের চেতনার অন্তঃস্তলে থেকেও প্রভুত্ব করছে। রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যে হয়তো প্রকৃতি এই ভয় থেকে গেয়ে উঠেছিল 'ভয় করি মা, পাছে সাহস যায় নেমে—পাছে নিজের আমি মূল্য ভুলি'।

নারীর ক্ষমতাহীনতার কার্য-কারণ-সূত্র কেবল বহিরঙ্গে চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, অন্তরঙ্গ চাওয়া-পাওয়ার হিসেবটাও কম জরুরি নয়। প্রাতিষ্ঠানিক গণ্ডির বাইরে ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যেও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব বিধৃত হয়ে আছে। ব্যক্তিগত অনুষঙ্গে রাজনীতি' বলতে ক্ষমতার এই দ্বন্দ্বটিকেই বোঝায়। দাম্পত্য জীবনে ধর্ষণ হল ব্যক্তি-জীবনে রাজনীতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রথমে বহিরঙ্গের

Scanned with

কোটি ও অন্তরঙ্গ কোটির মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। ন্যায়-অন্যায় বিচার সীমাবদ্ধ ছিল বহিরঙ্গের কোটিতে। ক্রমশ অন্তরঙ্গ কোটিতে সুবিচার পাওয়ার আশায় আইন-আদালতের শাসনকে সেখানে প্রবেশ করতে দেওয়া হল। নারী আন্দোলনের চাপেও খানিকটা বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গের প্রভেদটা নড়বড়ে হয়ে গেছে। অনেক অনুচ্চারিত সমস্যাকে বিচারের অঙ্গনে আনা গেছে। এরপর দেখা দিয়েছে আর এক ধরনের সমস্যা, আদালতের রায়কে বলবৎ করার জন্য যে পাহারাদারি দরকার তা রাষ্ট্র করতে পারছে না।

প্রশ্ন হল, সব অনুচ্চারিত সমস্যাকে আইনের অঙ্গনে আনা যায় কিনা। আইন-আদালত যে ছকে কাজ করে তা অনেকটা এরকম: বিচারযোগ্য সমস্যাকে সবসময় চুক্তিভঙ্গের সমস্যার আদলে সাজানো হয়। এরপর আইনের বিচার্য বিষয়টিকে তিন ধরনের বিকল্প সমাধানের ছকে বিচার করার চেষ্টা করা হয়। প্রথম বিকল্পটি হল বিচারের মাধ্যমে চুক্তি পুনর্বহালের সমাধান, যেমন করা হয় রেস্টিটিউশন অব কনজুগাল রাইটস বা দাম্পত্য অধিকার পুনর্বহালের ক্ষেত্রে। আদালত আইনানুগ চুক্তি রদ ও ক্ষতিপূরণের সুপারিশের মাধ্যমে কখনও কখনও বিপরীত সমাধানের দিকেও যায়, এটা বিচার-ধারার দ্বিতীয় বিকল্প। বিচারের তৃতীয় বিকল্পটি হল, চুক্তিভঙ্গের অপরাধে শাস্তির সুপারিশ করা। সহজেই বোঝা যায় যে বিচারের যে বিকল্পগুলির মধ্যে সমাধান খোঁজা হচ্ছে তা দু-ধরনের ন্যায়নীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ। হয় 'ডিস্ট্রিবিউটিভ জাস্টিস'-বা বিতরণ-ধর্মী ন্যায়নীতি অথবা 'রেট্রিবিউটিভ জাস্টিস' বা শাস্তিমূলক ন্যায়নীতির ছকে সমাধান খোঁজা হচ্ছে। বিতরণ-ধর্মী ন্যায়নীতির পথে ক্ষমতা অর্জনের প্রস্তাবটিকে মোটাদাগে বলতে গেলে এরকম দাঁড়ায় — ধরা যাক, রমার ক্ষমতা কানাই হরণ করেছে বা তার ন্যায্য অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করেছে। অপরদিকে ধরা যাক হৃত ক্ষমতাটি আইনের সাহায্যে রমাকে ফিরিয়ে দেওয়া হল। ক্ষমতা যেন রূপকথার ভ্রমরের মতো কোনও দুর্লভ কৌটোর মধ্যে থাকে, কৌটোটি কোনওরকমে ফিরিয়ে দিতে পারলে ক্ষমতা ফিরে পাওয়া যায়।

আইন-নিয়ন্ত্রিত সমাজে ব্যবস্থা করা হয় যাতে সম্পর্কগুলি আইনানুগ নির্বাহ করা যায়। তা নিতান্ত সম্ভব না হলে সম্পর্ক থেকে মুক্তি পাওয়ার আইনি ব্যবস্থা আছে। বিকল্প সম্পর্ক গড়ার বা একক জীবনযাপনেরও পথ আছে। এ যেন জল-পুলিশের

অধীনে ক্ষমতা খর্ব হলে স্থল-পুলিশের আওতায় গিয়ে সক্ষমতা অর্জনের প্রকল্প। নানা বিকল্প অবস্থানের সুযোগ নিঃসন্দেহে জরুরি। তবু বিকল্প অবস্থানে গেলেই যে মেয়েদের ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়ার সুযোগ বাড়বে তা নয়।

দৃষ্টান্ত দিয়ে বলি, ধরা যাক এক মহিলা আইনের মাধ্যমে বিবাহবিচ্ছেদ মঞ্জুর করাতে পেরেছে। সেই সঙ্গে সে খোরপোষ পেয়েছে এবং তার শিশুর অভিভাবকত্বও সে পেয়েছে। তার অধিকার অর্জন হল ঠিকই কিন্তু সেই সঙ্গে সে নতুন করে অশক্ত বোধ করতে পারে। নতুন কিছু সমস্যা দেখা দেওয়ার ফলে তার আগের তুলনায় ক্ষমতা খর্ব হওয়ার সম্ভাবনা আছে। যেমন আইনের বাধা না থাকা সত্ত্বেও স্কুলে তার সন্তানকে ভর্তি করতে অসুবিধে হবে, বাড়ি ভাড়া পেতে অসুবিধে হবে। আইনের মাধ্যমে অর্জিত অধিকারকে ক্ষমতার উৎসরূপে উপলব্ধি করতে গেলে আরও কিছু প্রয়োজন যা আইন দিতে পারে না। আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন আনা চাই। এ কথাটা পুরুষ ও মহিলা উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মেয়েদের মনেও কতকগুলি সংস্কার যে কীভাবে তার মুক্তির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তার উদাহরণ অনেক আছে। দেখা যাচ্ছে যে সুযোগ পাওয়ার পরেও নারী যেভাবে তা ব্যবহার করছে তাতে তার সমর্থ হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ছে না, বরঞ্চ কমে যাচ্ছে। কেরল প্রদেশের বহু মেয়ে নার্সিং শিখে আরবদেশে গিয়ে ভালো রোজগার করে। কিছু অর্থসঞ্চয় করার পরে তারা স্বদেশে ফিরে সেই অর্থ নিজের যৌতুক বাবদ ব্যয় করে।

ক্ষমতা পেয়ে যদি তা সমাজের পরিকাঠামো বদলের জন্য প্রয়োগ করা না হয় তাহলে নারীর অবদমনের উৎসগুলো নির্মূল হয় না। নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। দৈনন্দিন জীবনযাপনে যেমন বৈষম্য দেখা যায় তেমনি প্রাতিষ্ঠানিক স্তরেও এর শাখা-প্রশাখার বিস্তার হয়ে থাকে। শুধু প্রতিষ্ঠানে নয়, আর একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে আমাদের ধারণার কাঠামোর মধ্যেও বৈষম্যভাবনা নিহিত আছে। চর্যা, প্রতিষ্ঠান ও ধারণার কাঠামো: এই তিনটি স্তরকে সাধারণত একসঙ্গে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয় না। নারীর ক্ষমতা অর্জনের সমস্যাটিকে বুঝতে হলে স্বার্থ এবং ক্ষমতার এই বৃহত্তর প্রেক্ষাপটটিকে বোঝা দরকার। সমস্যার অনুষঙ্গের দিকে দৃষ্টি না দিলে পলিসি এবং প্রকল্পগুলি ব্যর্থ হবে। অথচ প্রতিটি প্রকল্পে দেখা যায় এই বিশ্লেষণ অনুপস্থিত। হয়তো ভাবা হচ্ছে যে সামাজিক স্তরে এবং

Scanned with

মনোজগতের কোটিতে আমূল পরিবর্তন না ঘটিয়েও বিচ্ছিন্নভাবে নারীসক্ষমতার প্রকল্প রূপায়ণ করা যায়।

ভাবনার চালচিত্রের প্রসার ঘটলেই সমস্যাটির মোকাবিলা যে করা যাবে তা নয়, বিশেষ করে সমস্যাটিকে যখন অধিকার, দায়িত্ব আর আইনের ছকের মধ্যেই ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়। নারীর অবদমনের সূত্রগুলির পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে অধিকারের পরিভাষায় ক্ষমতার প্রতিটি অভিব্যক্তিকে ধরা যায় না। অধিকার-অতিরিক্ত একটা ক্ষমতার বনিয়াদ আছে বলেই তা অধিকারের কোটিতে প্রতিফলিত হয় এবং ওই অন্যতর কোটিতে পরিবর্তন না এলে নারী স্বাধিকার লাভ করবে না। সেই অন্য কোটিটি অবশ্য 'স্বয়ংসিদ্ধা'র অধিবিদ্যক স্তর নয়। হয়তো সমস্যার এই মাত্রাটির কথা ভেবেই ২০০১-এর পলিসিতে বলা হয়েছে 'সামাজিক ধ্যান-ধারণা পরিবর্তন তথা কৌমের আচরণের পরিবর্তন করতে হবে এবং এই কাজে নারী ও পুরুষকে সমানভাবে লিপ্ত থাকতে হবে।'

যে কোনও সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়ার পর সম্পর্কিত ব্যক্তিদের বিবিধ আচরণবিধি দিয়ে বেঁধে রাখার রেওয়াজ আছে। শুধু প্রতিষ্ঠান নয়, ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে সম্পর্কগুলিকেও যতদূর সম্ভব আইনের পাশে বাঁধতে পারলে আমরা নিশ্চিন্ত বোধ করি। ভারতের নারী আন্দোলন তার আধুনিক পর্বে অনেকাংশে আইন সংশোধনের মাধ্যমে বৈষম্য দূর করার চেষ্টা করছে। এর ফলে আমাদের দেশের বিভিন্ন আইনের পরিবর্তন আনা হয়েছে। আইন বিবিধ সম্পর্কের বহিরঙ্গের আদলকে সুস্থ ও সবল করে তুলতে পারে কিন্তু যেখানে একজনের দেখা এবং বোঝা বা না-দেখা এবং না-বোঝা অপরজনকে সমৃদ্ধ অথবা সঙ্কুচিত করে সেখানে আইনের কোনও ভূমিকা নেই। নারীকে সক্ষম করার অর্থ এই নয় যে তাকে কতকগুলো ক্ষমতার অধিকারী করা হল এবং তাকে সেই সঙ্গে কিছু পুঁজি দেওয়া হল। সমাজের সঙ্গে নারীকে একটি সমৃদ্ধ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। কীভাবে একটি সমৃদ্ধ সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়, বা ধরে রাখা যায় এবং তাকে কীভাবে লালন করা যায় তার নির্দেশাবলী আইনের ধরাপাতের অগম্য। সম্পর্কের অন্তরঙ্গ দেশটির রক্তলাবেক্ষণ আইন করতে পারে না—হয়তো সাহিত্য পারে, দর্শন পারে, চারুকলা পারে।

সম্পর্কের অন্তরঙ্গ দেশের পরিচয় মনস্তত্ত্বকে বাদ দিয়ে পাওয়া সম্ভব নয়। তার কারণ লিঙ্গ-পরিচয়ের সবটুকু নারীর চর্যার মধ্যে প্রতিফলিত হয় না। অবদমনের ফলে

অবচেতন মনের কিছু স্বাঙ্গীকৃত লিঙ্গ-ভাবনা হয়তো কখনোই চর্যায় প্রকাশ পায় না, একমাত্র মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে তাদের পাওয়া যায়। এই কথাটি নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। একটা সম্পর্কে একবার আবদ্ধ হলে তার প্রভাবে ব্যক্তিক-সত্তার পরিবর্তন হয় এবং সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পরেও তার প্রভাব থেকে যায়। নতুন নতুন সম্পর্ক ব্যক্তিত্বকে নতুন মাত্রা দেয়। মানুষ যেহেতু সম্পর্ককে নির্মাণ করে এবং সম্পর্ক মানুষকে নির্মাণ করে সেহেতু সম্পর্ক এবং সম্পর্কিত ব্যক্তির মধ্যে একটা উভমুখী রূপান্তর চলতে থাকে। এই রূপান্তরের প্রতিফলন দেখা যায় মনোজগতে ও শব্দার্থ নিরূপণে।

নারী-পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে একটা জৈবিক আকর্ষণ থাকে, অনেক সময় তাদের মধ্যে প্রেমেরও সম্পর্ক থাকে। এর ফলে অন্যান্য ক্ষমতার লড়াই-এর তুলনায় লিঙ্গ-রাজনীতিতে একটা অতিরিক্ত মাত্রা থাকে। অপরাপর অনুষঙ্গে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক থাকে, সেখানে একান্ত ব্যক্তিগত মাত্রাটি অনুপস্থিত। নারী-পুরুষের সম্পর্কের অন্তরঙ্গতার দরুন একটা টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়। মেয়েরা ব্যক্তিগত স্তরে অবদমনের সঙ্গে যুঝতে গিয়ে তাই মনে করতে পারে:

'জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই —
ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে।
. . . . . .
তোমারে আবরিয়া ধুলাতে ঢাকে হিয়া,
মরণ আনে রাশি রাশি —
আমি যে প্রাণ-ভরি তাদের ঘৃণা করি
তবুও তাই ভালবাসি।' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

অনুভূতির দ্বান্দ্বিকতার মূলে রয়েছে সম্পর্কের বহুমাত্রিকতা; অধিকার, সম্পত্তি, চুক্তি এই সব কিছু ছাপিয়ে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কের আরও যে কত বিচিত্র অনুষঙ্গ আছে। 'ঘৃণা' আর 'ভালবাসার' যুগপৎ অনুভূতি কোনও অপরিণত বুদ্ধির সূচক নয়। মানুষের সম্পর্কগুলি বহুমাত্রিক হওয়ার ফলে বস্তুতই এমন বিচিত্র অনুভূতি হয়, আর তাই বৈষম্যভাবনার একটা সোজাসাপটা প্রতিবিধান পাওয়া দুষ্কর। গোটা সমস্যাটিকে কতকগুলি মোটা সাদা-কালো দাগের ছকে ফেলে বলা যাবে না যে এটি আদর্শ-সম্পর্কের রূপরেখা, এটি তার নিয়ামক বিধি এবং এটি সম্পর্ক-সম্বন্ধিত দায়-

Scanned with

দায়িত্বের তালিকা। এমন হলে নিঃসন্দেহে নারী-পুরুষের সম্পর্কের অঙ্ক মেলানো যেত।

আইনের মাধ্যমে বৈষম্য দূর করার সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করেই অনেকে কৌমের ভূমিকাকে আরও শক্তিশালী করতে চায়, সিভিল সোসাইটি বা পৌরসমাজের গুরুত্ব তাতে বাড়ে। ২০০১-এর পলিসিতে সামাজিক ধ্যান-ধারণায় পুরুষ ও নারীকে সমানভাবে শামিল করার সুপারিশটি প্রণিধানযোগ্য। আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গেলে কতকগুলি আচরণ-বিধিও পালন করা প্রয়োজন। সব শরিককে শ্রদ্ধা, সহবত ও সহৃদয়তার সঙ্গে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে হবে। ক্ষমতা যারা ভোগ করে তারা এমন নির্দেশ উপেক্ষা করতেই পারে। ক্ষমতার স্থিতাবস্থা বজায় রাখলে যাদের সুবিধে হয় তারা হঠাৎ লিঙ্গ-বৈষম্য দেখে কাতর হবেই বা কেন?

সমাজ এবং রাষ্ট্র যত দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, যত দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে, পরিবারের ওপর ততই দায়িত্ব চাপানো হচ্ছে। শুধু তাই নয়, সমাজ এবং রাষ্ট্র যে অনুপাতে দুর্বল হচ্ছে পরিবারের ক্ষমতার স্তর-বিন্যাস সেই অনুপাতে দৃঢ় হচ্ছে। সাধারণ মানুষ চায় নির্বিবাদে মানিয়ে নিয়ে টিকে থাকতে। জীববিজ্ঞানীরা বলেন আরশোলার মতো প্রজাতি পরিবর্তনশীল পৃথিবীর ৩৫ কোটি বছরের ইতিহাসকে অস্বীকার করেও অপরিবর্তিত আছে।

লিঙ্গ-বৈষম্যের রাজনীতির ফলে পীড়িতের সঙ্গে পীড়কেরও অবনমন ঘটে, কোনও পক্ষই এতে ভালো থাকে না। নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ থেকে মুক্ত হলে পুরুষও নতুন বলে বলীয়ান হবে। অথচ লিঙ্গ-বৈষম্যের এই দিকটির ওপর জোর দেওয়া হয় না। মেয়েদের ক্ষমতাহীনতার সমস্যায় উভমুখীনতার দিকটা এড়িয়ে গেলে 'স্বয়ংসিদ্ধা'-র মতো সমাধান-সূত্রকে নির্ভরযোগ্য মনে হতেই পারে। পুরুষের এই উপলব্ধি না হওয়া অবধি তার সঙ্গে সামাজিক ধ্যান-ধারণা বদলের আলোচনাটা হবে মেয়েদেরই দায়ে, মেয়েদেরই জন্যে।

নবম অধ্যায়

নারীবাদী স্রোতের দোলাচল

কথাপ্রসঙ্গে বার বার দর্শনের মূলস্রোতের উল্লেখ করা হয়ে থাকে। অভিযোগ শোনা যায় যে মূলস্রোতটি পুরুষ-প্রধান ও পুরুষ-শাসিত। বলা হয় 'the mainstream is the male stream'। নারী এই মূলস্রোতের ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করে। সে জানতে চায় মূলস্রোতে নারীর জীবনযাপনের পরিমণ্ডল অদৃশ্য হয়ে থাকে কেন? কেন তার স্বর অশ্রুত থেকে যায়?

এই 'কেন' প্রশ্নটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে দ্বিতীয় একটি প্রশ্ন — 'কী করণীয়'? কী করে নারীকে সক্ষম করে তোলা যায়, অথবা নারী নিজে কী করে এম্পাওয়ারড (empowered) হতে পারে?

'কেন?' এবং 'কী করে?' প্রশ্ন দুটি একে অপরের সঙ্গে যুক্ত। একটি সমস্যার উৎস কী না জানলে তার সমাধান কী তা বলা যায় না। এই প্রশ্নগুলি খুব বড় প্রশ্ন, এগুলির কোনো তৈরি উত্তর হয়ত নেই। চলতে চলতে ভাবতে হয়, আবার ভাবতে ভাবতেই চলতে হয়। তত্ত্বের পরিমণ্ডল, প্রাতিষ্ঠানিক চর্যা ও ব্যক্তিগত মননের জগৎ থেকে নারীর প্রয়োজন, তার অভিজ্ঞতা, তার স্বপ্ন কী করে অদৃশ্য হয়ে গেল তার কোনো সহজ ব্যাখ্যা নেই। আবার কোনটির প্রভাবে কখন, কীভাবে নারীর জীবনে বদল আসবে তাও বলা কঠিন।

অনেকসময় দেখা গেছে প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে পরিবর্তন অনেক আগে এলেও ব্যক্তিমানসে পরিবর্তন আসতে সময় লেগেছে। আইন করে বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন করার বহু বছর পরে দেশের মানুষ মন থেকে এই পরিবর্তন মানতে পেরেছেন। এর বিপরীত অবস্থাও দেখা গেছে—মানসিকতার বদল হওয়া সত্ত্বেও বিধিব্যবস্থায় পরিবর্তন আসতেও সময় লাগে। ফলে কী করলে নারীর প্রান্তিকতার অবস্থান্তর ঘটবে তার কোনো একরৈখিক কার্য-কারণ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। তত্ত্ব, প্রতিষ্ঠান ও

Scanned with

ব্যক্তির মানসিকতার মধ্যে একটা নিরন্তর ডায়ালেকটিকস্ (dialectics) চলতে থাকে। চেষ্টা করতে হবে প্রতিটি ক্ষেত্রে সংগ্রাম বজায় রাখতে। প্রতিবাদের এই প্রকল্পগুলির মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ যোগ থাকলেও আন্দোলনের স্বার্থে কোনো একটা মুহূর্তে বিচ্ছিন্নভাবে ভাগ ভাগ করে সমস্যাগুলিকে বিশ্লেষণ করলে সুবিধে হতে পারে। অথচ একটি মুহূর্তের প্রয়োজন সর্বকালের প্রয়োজনে পর্যবসিত হলে শুধু খণ্ডিত প্রেক্ষিতই পাওয়া যাবে। একটি সমস্যাকে বিশ্লেষণ করে ভাগ ভাগ করে দেখার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমরা আধুনিক পর্বে ফ্রেগে এবং হিট্‌গেন্‌স্টাইনের লেখায় পেয়েছি। একটি খণ্ডিত প্রেক্ষিতকে একমাত্র প্রেক্ষিত বলার যে অসুবিধে তা নারীবাদীরা অত্যন্ত স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করেছেন।

নারীবাদীরা ফ্রেগে বা হিট্‌গেন্‌স্টাইন-এর সঙ্গে দ্বি-মাত্রিক লজিকের অন্তর্নিহিত চর্যার তর্ক তুলে দেখিয়েছেন কী করে খুব সূক্ষ্ম স্তরে অস্বীকৃত নির্ভরতার (denied dependence) প্রশ্নে চলে যাওয়া যায়। সেই চর্যার পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া থেকে নারী কী করে মুক্তি পেতে পারে তার আলোচনা নারীর এম্পাওয়ারমেন্টের জন্য জরুরিও হবে। নারীবাদীদের বিচার করে দেখতে হবে লজিক নিয়ে সমস্যা কোথায় এবং দ্বি-মাত্রিক লজিকে আংশিক পরিবর্তন এনে সমস্যার সমাধান করা যায় কিনা। নচেৎ তাঁদের বিকল্প লজিকের কথা ভাবতে হবে। কিন্তু কেউ যদি মনে করেন যে আগে তত্ত্বের স্তরের সব লিঙ্গ-সমস্যা সমাধানের পরেই তাঁরা প্রয়োগের বৈষম্যের দিকে নজর দেবেন সেটা সম্ভব হবে না।

তত্ত্বের বিচার চলতে চলতেই সময়বিশেষে পথে দাঁড়িয়ে লিঙ্গ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হতে হয়। চারদিক থেকে যখন মার আসতে থাকে তখন সমাহিত হয়ে আত্মশক্তিকে উদ্দীপিত করে তোলারও প্রয়োজন আছে। এটা ক্ষমতা অর্জনের ব্যক্তিগত মাত্রা। র‍্যাডিকাল নারীবাদীরা যখন consciousness raising বা আত্মসচেতনতা বাড়ানোর প্রস্তাব দেন তখন তাঁরা একটি যৌথ-প্রক্রিয়ার কথা বলেন —সেও তো আত্মশক্তি গড়ে তোলার একটা উপায়। আবার রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ'-এর কুমুদিনীর সকল বেসুরের ওপারে যেতে চাওয়াটাও এক ধরনের আত্মশক্তি-গঠনের সাধনা।

নারী-নিসর্গনীতিবাদীদের পরামর্শ অনুসারে নারীবাদ যদি সত্যিই নারীবাদী আন্দোলনের মধ্যেও বৈচিত্র্যকে স্বীকৃতি দিতে চায় তাহলে সক্ষমতা অর্জনের বিভিন্ন

প্রকল্পকে তাঁদের খোলা মনে মানতে হবে। অবশ্যই এই স্বীকৃত-গ্রহণের একটা পূর্বশর্ত থাকবে—একে অপরকে গঠনমূলক সমালোচনার সুযোগ দিতে হবে। বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে প্রকৃত আলোচনা ও সমালোচনা চললে দেখা যাবে যে কোনো নারীবাদী অবস্থানই অপরিবর্তিত থাকছে না। মতবিনিময়ের জেরে পারস্পরিক অবস্থানের পরিবর্তনের নজির মূলস্রোতের দর্শনে বহু পাওয়া যায়।

আত্মসমালোচনার তাগিদ হারিয়ে ফেললে কোনো আন্দোলনই অগ্রসর হতে পারে না। আত্মসমালোচনার অবর্তমানে নারীবাদী আন্দোলন কতকগুলি নিটোল পক্ষ ও বিপক্ষে বিভক্ত হয়ে যাবে। এক-একটি অবস্থানের নিজস্ব বেষ্টন যত দৃঢ় হবে সার্বিক আন্দোলনে ততই বিভাজন সৃষ্টি হবে এবং পিতৃতন্ত্র ততটাই কায়েম হয়ে বসবে।

সক্ষমতা অর্জনের উদ্দেশ্যে যেমন তত্ত্ব, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি-মানসের প্রতি মনোযোগের একটা দোলাচল চলতে থাকে তেমনি একটি স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পের মধ্যেও মনোযোগের দোলাচল চলতে পারে।

এম্পাওয়ারমেন্টের স্বার্থে আন্দোলনের একটি পর্যায়ে লিবারাল নারীবাদীদের মতো কেউ—এমনকি র‍্যাডিকাল নারীবাদীও—মনে করতে পারেন যে প্রচলিত ক্ষমতার কেন্দ্রে অনুপ্রবেশ করাটাই আশু প্রয়োজন। ক্ষমতার কেন্দ্রে প্রবেশ করলেও পিতৃতন্ত্রকে সম্পূর্ণ উৎখাত করা যাবে না। ক্ষমতার মেরুকরণের স্থিতাবস্থায় আর একটু ক্ষমতার স্বাদ পাওয়া যাবে মাত্র। ইতিহাসের কোনো বিশেষ ক্ষণে এটাকেই চরম পাওয়া বলে মনে হতে পারে। তাছাড়া, ক্ষমতার রাজ্যে উপস্থিত থাকলে হয়ত অপ্রণিধানজনিত লিঙ্গ-বৈষম্য কিছুটা দূর করা যাবে।

র‍্যাডিকাল নারীবাদীরা ক্ষমতার কাঠামোর আমূল পরিবর্তন আনতে চান। অনেকে মনে করেন যে এর অর্থ হল পিতৃতন্ত্রের পরিবর্তে মাতৃতন্ত্রকে কায়েম করা। তা কিন্তু নয়। পিতৃতন্ত্র আর মাতৃতন্ত্রের ক্ষমতার কাঠামো দুটি অভিন্ন। দুটো তন্ত্রেই ক্ষমতার কেন্দ্র এবং প্রান্তভাগ আছে। পিতৃতন্ত্রে পুরুষের প্রেক্ষিত থেকে জগৎকে দেখা হয় আর মাতৃতন্ত্রে নারীর প্রেক্ষিত প্রাধান্য পায়। দরদী নীতিশাস্ত্রের দরদ, সহানুভূতি, বাৎসল্যের ওপর অতিমাত্রায় ঝোঁক থাকার ফলে এক-এক সময় মনে হয় যে এই শাস্ত্রটি হয়ত মাতৃতন্ত্রের দিকে চলে যাচ্ছে। অপরপক্ষে, ক্যারল গিলিগান যখন মূলস্রোতের দায়-দায়িত্ব-অধিকার-কর্তব্যের নৈতিক আদর্শের সঙ্গে দরদ-সহমর্মিতার আদর্শ যুক্ত করতে চান তখন মনে হয় তিনি ক্ষমতার স্থিতাবস্থা বজায় রেখে ক্ষমতার চেহারাটাকে আরো একটু মানবিক করতে চাইছেন।

Scanned with

পিতৃতন্ত্র বনাম মাতৃতন্ত্রের বিতর্ক থেকে মনে হয় ক্ষমতার একটা মেরুকরণ থাকবেই, লড়াইটা যেন সেই কেন্দ্রে কার প্রেক্ষিতটি বহাল থাকবে তাই নিয়ে। নারী-নিসর্গনীতিবাদীরা এমন একটি ভবিষ্যতের কথা ভাবেন যেখানে ক্ষমতা থাকবে অথচ ক্ষমতার কোনো বেষ্টনী থাকবে না, 'আমরা সবাই রাজা'র দেশের মতো হবে সেই 'আমরা সবাই রানি'র দেশ। এরকম একটা ভবিষ্যতের কথা ভাবতে ভালই লাগে যেখানে ক্ষমতার কেন্দ্র নেই অথচ ক্ষমতার বিস্তার আছে। একে অপরের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ করে নিলেই এটা সম্ভব হতে পারে।

সমস্যা হয় যখন দেখি বিভিন্ন তত্ত্ব-কাঠামো মোটামুটি একই ভবিষ্যতের কথা বলছে। রবীন্দ্রনাথ 'আমরা সবাই রাজা'র কথা বলেছেন, কান্ট বলেছেন kingdom of ends-এর কথা, আর নারী-নিসর্গনীতিবাদীরা power-with-power বা ক্ষমতার সমবণ্টনের কথা বলেন।

প্রশ্ন হচ্ছে, এরূপ একটি ক্ষমতার ভারসাম্যের লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে কোন তত্ত্ব-কাঠামোটি থেকে বেশি সাহায্য পাওয়া যাবে? সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অবশ্যই প্রতিটি অবস্থানের বৈশিষ্ট্যগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জেনে নেওয়া প্রয়োজন। তত্ত্ব-কাঠামো থেকে ভবিষ্যৎ চর্যা বিষয়ে সাহায্য নেওয়ার অর্থই হল এম্পাওয়ারমেন্ট-এর কর্মসূচীতে তত্ত্বকে স্থান দেওয়া। কোনো দার্শনিকের বক্তব্যের সবটুকু গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। যদি কোনো অংশ গ্রহণযোগ্য মনে হয়ও তা সর্ব অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে।

নারীবাদের লক্ষ্য খুব স্পষ্ট। তার উদ্দেশ্য নারীকে সক্ষম করে তোলা ও সেই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে ক্ষমতার পিতৃতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার অবসান ঘটানো। মনে করা হয় যে এই ব্রতে শামিল হলে নারী-পুরুষ উভয়ের প্রতি লিঙ্গের প্রেক্ষিত থেকে সুবিচার হবে। নারীবাদের লক্ষ্য খুব স্পষ্ট হলেও তার সাধন-প্রক্রিয়া বিবিধ ও বিচিত্র। এর ফলে অনেকে মনে করেন, নারীবাদী দার্শনিকরা সুবিধাবাদী তারা চায় 'যেনতেনপ্রকারেণ' লক্ষ্যে পৌঁছতে। এই বই-এর প্রতি অধ্যায়ের চুলচেরা বিশ্লেষণী বিচার থেকে আশা করি এই মন্তব্যের সারহীনতা স্পষ্ট হবে।

নারীবাদীরা অগ্রসর হওয়ার সময় প্রতিটি পদক্ষেপের তুল্যমূল্য বিচার করে সচেতনভাবে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করেন। নারীবাদের তাত্ত্বিক বহুগামিতার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন অনেকান্ততা আছে। এই অনেকান্ততাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় ক্ষমতা বণ্টনের একটা নৈতিক প্রেক্ষিত থেকে। নৈতিকতার প্রেক্ষিতের অবর্তমানে নারীবাদের এই দোলাচলটি কিন্তু স্বেচ্ছাচারিতায় পর্যবসিত হতো।

পরিশিষ্ট

নির্মাণ থেকে বিনির্মাণ

সংলাপ ১*

শেফালী মৈত্র তাঁর 'নির্মাণ থেকে বিনির্মাণ' প্রবন্ধে অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে এমন এক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন, যে বিষয়ে আলোচনা সচরাচর বাঙলা ভাষায় চোখে পড়ে না। এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ। নির্মাণ থেকে বিনির্মাণের দিকে যাত্রায় তিনি যে-পথ অনুসরণ করেছেন—দেকার্ত, কান্ট, ফ্রেগে, হ্বিট্‌গেনস্টাইন, কোয়াইন, ডেভিড্‌সন, দেরিদা — এই পথ-নির্বাচন, আধুনিকোত্তর ভাবুকদের মেটাফর ব্যবহার করে বলতে গেলে বলতে হয়, এও এক আখ্যানেরই রচনা, যা এই ক্ষেত্রে একই সঙ্গে এক টেলোস-এরও ইঙ্গিতবাহী। বস্তুত কোনো দার্শনিক বিষয়ের আলোচনা এর থেকে মুক্ত হতে পারে না, দর্শনের ইতিহাসের আলোচনা তো নয়ই। যে-কোনো ব্যাখ্যাই এবং তার পথ-নির্বাচন বা অন্য কথায় বিভিন্ন কলাকৌশলের মাধ্যমে যে আখ্যান রচিত হয়, রচনাকার তার মাধ্যমে বিষয় সম্পর্কে এক আবেষ্টন বা ক্লোজার সৃষ্টি করেন। কোনো একটি বিশেষ ক্লোজারই সত্য, বাকি সব মিথ্যা এরকম কিন্তু নয়। সঠিকভাবে বলতে গেলে অবশ্য বলতে হয়, আমাদের কোনো একটি 'বিষয়ের' ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা বা বর্ণনা থাকে না, থাকে ভিন্ন বিষয় এবং ভিন্ন ক্লোজার। প্রতিটি ক্লোজারই অন্যের থেকে আলাদা এবং প্রতিটি ক্লোজারই জগৎকে এক নির্দিষ্ট বিন্যাসে সাজায়, প্রতিটি ক্লোজারই আমাদের এই 'জগৎ' সম্পর্কে কিছু নির্দিষ্ট আচরণ ও উপায় অবলম্বন করতে সাহায্য করে।

*প্রদীপ বসু, অধ্যাপক, সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশাল সায়েন্স, কলকাতা। এখানে পরপর উল্লিখিত তিনটি সংলাপই প্রকাশিত হয় 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় (নবপর্যায়-৪) ১৪০২।

Scanned wit

শেফালী মৈত্র তাঁর রচনায় নির্মাণ থেকে বিনির্মাণের যে ব্যাখ্যা রচনা করেছেন তা এক নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা এবং ক্লোজারও। এই উক্তির মাধ্যমে লেখিকার কোনো সমালোচনা কিন্তু আমার উদ্দেশ্য নয়; বরং আমি বলতে চাইছি, কোনো একটি নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা, সম্ভাব্য ক্লোজারগুলি থেকে বেছে নিয়ে একটি ক্লোজারকে বিষয়ের উপর আরোপ করে। আমার এই রচনার ক্ষেত্রেও ওই একই উক্তি প্রযোজ্য। এই উক্তি বিভিন্ন দর্শনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যদি না দার্শনিক এই বিষয়ে সচেতন থাকেন। দুজন এই বিষয়ে সচেতন ছিলেন, তাঁরা হলেন নীট্‌শে (প্রচলিত বাংলা উচ্চারণই ব্যবহার করলাম) এবং হাইডেগার। আধুনিকোত্তর চিন্তাধারার যদি কোনো জিনিওলজি তৈরি হয়, তা হলে সেই জিনিওলজি আরম্ভ হবে নীট্‌শে ও হাইডেগার থেকে। বস্তুত বিনির্মাণবাদীদের একরকম পূর্বসূরীও এঁরা দুজন। লেখিকা কিন্তু এঁদের দুজনের সম্বন্ধে মোটামুটি নীরব। কেন নীরব, তার উত্তর হয়তো কোনো এক বিনির্মাণেই মিলবে। কিন্তু আপাতত সে চেষ্টা আমি করছি না। বরং লেখিকা যেমন দেকার্ত থেকে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন, সেই দেকার্তের সূত্র ধরেই বলব যে হাইডেগার তাঁর 'বিইং অ্যান্ড টাইম' (১৯২৭) এবং পরে আরও জোরালোভাবে 'দ্য কোয়েশ্চন কন্সারনিং টেক্‌নোলজি' বা 'পোয়েট্রি, ল্যাঙ্গুয়েজ, থট' গ্রন্থগুলিতে[১] দেকার্ত-প্রবর্তিত আধুনিকতার এই বনিয়াদী পদ্ধতির (ফাউন্ডিং মেথডোলজি) এক সমালোচনার উদ্ভব করেন, যে বনিয়াদী পদ্ধতিকে হাইডেগার দেখেছিলেন পশ্চিমে হিংসার উৎপাদক এবং জ্ঞানের এক অপর্যাপ্ত ভিত্তি হিসেবে। হাইডেগার মনে করতেন, দেকার্তীয় অনুমানের ফলেই জ্ঞাতা (নোয়িং সাবজেক্ট) এবং নির্জীব জ্ঞানের বস্তুর (ইনার্ট অবজেক্ট অব নলেজ) মধ্যে এমন এক বিভাজন সৃষ্টি হয়েছে ও এমন এক জগৎ নির্মিত হয়েছে যেখানে বৈজ্ঞানিকের নির্লিপ্ততা এক অদ্ভুত প্রাধান্য অর্জন করেছে এবং সমস্ত অস্তিত্বের মডেল ও ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই জগৎ এমন এক বিন্যাস যার মাধ্যমে মানুষ নিজেকে তৈরি করে নেয়, এই অভিজ্ঞতার বদলে পশ্চিমের মানুষ জগৎকে নিরীক্ষণ করতে শিখেছে এক অসাড়, নির্জীব বস্তু হিসেবে যাকে সে বিভিন্ন দ্বিত্বের মাধ্যমে নিপুণভাবে ব্যবহার করতে চায়। এই দ্বিত্বের উদ্ভব হয়েছে মূল দেকার্তীয় বিভাজন থেকে এবং এর পুনরাবৃত্তি হয়েছে বিভিন্নভাবে, যেমন: মন/শরীর, জড়/আত্মা, যুক্তি/অনুভূতি, পুরুষত্ব/নারীত্ব ইত্যাদি। ফলে আধুনিকতার শর্তই হয়ে উঠেছে জাগতিক সত্তাকে (বিইং ইন-দ্য-ওয়র্ল্ড) অস্বীকার করা। এ যেন

এক নির্লিপ্ত জ্ঞাতা নির্জীব জড় প্রকৃতিকে নিরীক্ষণ করছে, অনুধ্যান করছে, বিচার করছে এবং নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করছে। সব জাগতিক সম্পর্কই শেষ অবধি কার্যসাধনের উপায় হিসেবে পরিণত হচ্ছে। জাগতিক সত্তাও শেষ অবধি প্রায়োগিক ও প্রাযুক্তিক ইচ্ছাশক্তির প্রাধান্য স্বীকার করে নিচ্ছে। হাইডেগার চেয়েছিলেন এই প্রাধান্য থেকে মুক্ত হয়ে এই সত্তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হোক। তাঁর যুক্তি ছিল দেকার্তীয় এই উপস্থিতি (প্রেজেন্স) বহু সম্ভাব্য সম্পর্কগুলির মধ্যে একটি সম্পর্ক মাত্র। তাই দেকার্তীয় যুক্তির বিকল্প হিসেবে তিনি খুঁজে নিয়েছিলেন নান্দনিক ক্ষেত্র, যেমন কবিতা, যেখানে দেকার্তীয় সেই প্রত্যয়গত বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই, যা মানুষকে জগৎ থেকে আলাদা করে দেয়। বস্তুত আধুনিকোত্তর চিন্তাধারার প্রথম প্রতিফলন যে নান্দনিক ও সাহিত্যসমালোচনার ক্ষেত্রে দৃষ্ট হয় তার মূলে রয়েছে হাইডেগারের প্রভাব। এর বহু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যায়; আমি একটি মাত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করছি, যা আধুনিকোত্তর চিন্তাভাবনার একটি প্রভাবশালী পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য হয়। লেখাটি হল সুসান সন্টাগ-এর 'এগেইন্সট ইন্টারপ্রিটেশন' (১৯৬৬)[২]। এখানে সন্টাগ খুব স্পষ্টভাবেই হাইডেগার দ্বারা প্রভাবিত এবং হাইডেগারের মতোই যে-কোন ব্যাখ্যার প্রতি সন্দিগ্ধ ও প্রতিরোধী মনোভাবাপন্ন। সন্টাগ বরং বেশি উৎসাহী 'নৈঃশব্দ্যের নন্দনতত্ত্বের' (এস্থেটিক্‌স্ অব সাইলেন্স) প্রতি; শিল্প যেখানে পশ্চিমী প্রায়োগিক ও প্রাযুক্তিক যুক্তিকে প্রতিরোধ করবে এবং যে-কোনো ব্যাখ্যাকেই তার শরীরে পশ্চিমের যৌথ বৌদ্ধিক ইচ্ছাশক্তির আরোপণ হিসেবে অস্বীকার করবে।

নীট্‌শে ও হাইডেগারের প্রভাব আধুনিকোত্তর চিন্তায় নানাভাবে এসেছে। এর বিস্তারিত আলোচনা এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে সম্ভব নয়; কিন্তু দেরিদার আলোচনা করতে গেলেই মনে রাখতে হবে যে এঁরা তিনজনই দর্শনকে তার জ্ঞাতা-কেন্দ্রিক বিশ্লেষণের (দেকার্ত, কান্ট, প্রভৃতির জ্ঞানতত্ত্বের ফসল) আওতা থেকে সরিয়ে এনে দর্শনের কেন্দ্রে নিয়ে এসেছেন ভাষা, চিহ্ন ও রচনার ভূমিকা। এঁরা তিনজনই তাঁদের রচনার প্রতিবর্তী (রিফ্লেক্সিভ) চরিত্র সম্বন্ধে সচেতন এবং এই সচেতনতা এঁদের রচনাশৈলীতে প্রতিফলিত, যে কারণে এঁদের রচনার গতিপ্রকৃতি সহজবোধ্য নয়। এবং এঁরা তিনজনই দর্শনকে তার তথাকথিত উচ্চাসন দিতে নারাজ। এইসব কারণেই কোনো কোনো সমালোচক এঁদের রচনা খারিজ করে দেন এই বলে যে এইগুলি দর্শন নয়, সাহিত্য। এই যুক্তির মধ্যে পরোক্ষভাবে যে ধারণা কাজ করে তা হল: দর্শন যেন

Scanned with

সাহিত্যের অতিরিক্ত অন্য কিছু, দর্শনের দাবি সাহিত্যের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ তা কঠোর বিশ্লেষণ ও চিন্তাভাবনার ফসল। সমস্যা হল দেরিদা, নীট্‌শে, হাইডেগার দর্শনের এই তত্ত্ব নিয়েই প্রশ্ন তোলেন। তাই দেরিদাও আলোচনার জন্য বেছে নেন পল ভালেরির সেই রচনা যেখানে ভালেরি মন্তব্য করেন যে দর্শনও এক ধরনের লেখন (রাইটিং), যা তার লিখিত চরিত্রের কথা মনে রাখে না অথবা মুছে দিতে চায়।[৩] দার্শনিক ভাষার চরিত্রই বা কী সেটা দেরিদার কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।[৪] সেইজন্য দেরিদা ভালেরিকে বিনির্মাণবাদীদের পূর্বগামী হিসেবে গণ্য করেছেন।

শেফালী মৈত্রের আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে পাশ্চাত্য দর্শনে যুক্তি ও যুক্তিবিদ্যার দিকটি। সেইজন্য তাঁর আলোচনায় যেমন দেকার্ত ও কান্ট এসেছেন, তেমনই এসেছেন ফ্রেগে এবং কোয়াইন। এই আলোচনা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু বিনির্মাণের আলোচনায় আরও যে-কয়েকটি বিষয়ের বিবেচনা জরুরি হয়ে পড়ে তা হল ভাষা : চিহ্ন ও রচনার ভূমিকা। এবং এখানেই যুক্তিবিদ্যা এক কূটাভাসের (প্যারাডক্স) সম্মুখীন হয় যাকে আমি প্রতিবর্তিতা বা রিফ্লেক্সিভিটি বলছি। লেখিকা যেমন হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইনের কথা বলেছেন, সেই রকমই গঠনবাদী ভাষাতত্ত্বের (স্ট্রাকচরাল লিঙ্গুইস্টিক্স) প্রবক্তারাও ভাষা ও চিহ্নকে দর্শনের আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসেন। দেরিদা তাঁর 'অব গ্রামাটোলজি'-র এক বড়ো অংশ নিয়োজিত করেছেন এঁদের আলোচনায়।[৫] ভাষার নতুন স্বরূপ ও চরিত্র উন্মোচিত হওয়ার ফলে দার্শনিক প্রত্যয়গুলি (কন্‌সেপ্টস) স্বচ্ছ বলে গণ্য করা কঠিন হয়ে ওঠে, ফলে আমাদের ভাষা সম্পর্কে দাবি, ভাষার সঙ্গে জগতের সম্পর্কের দাবি এবং সবরকম পরোক্ষ দাবি এমন এক প্রতিবর্তী চরিত্র পেয়ে যায় যার থেকে মুক্তি অসম্ভব হয়ে ওঠে। কারণ ভাষার গুরুত্ব স্বীকার করতে হলে তা তো ভাষার মাধ্যমেই প্রকাশ করতে হবে। হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইন তাঁর 'ট্রাক্‌টেটাস' গ্রন্থে ভাষা ও জগতের সম্পর্ক বিচার করতে গিয়ে এই সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হন যে 'আমার ভাষার সীমানা মানেই হল আমার জগতের সীমানা।'[৬] কিন্তু হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইন ভাষা সম্পর্কে এই কথা বলতে পারেন না কারণ এই কথা বলা মানে ভাষার সীমানা অতিক্রম করা। তাই এই উক্তি যদি সত্যি হয় তা হলে তা মিথ্যা। হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইন এই প্রতিবর্তিতা সম্পর্কে অচেতন ছিলেন না, তাই তিনি বলেন, 'আমার প্রস্তাবগুলি ব্যাখ্যানের কাজ করে এইভাবে; যিনি আমাকে বোঝেন তিনি শেষ অবধি মেনে নেবেন যে প্রস্তাবগুলি অর্থহীন, তিনি

এইগুলি পরের ধাপে যাবার জন্য—ধাপ হিসেবে—ব্যবহার করবেন।'[৭] হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইন-এর মতো নীট্‌শে, হাইডেগার, দেরিদাও ভাষা সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন তাও প্রতিবর্তী এবং কূটাভাসী। তবুও হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইনের মতো তাঁরা ভাষার প্রকৃতি সম্বন্ধে সাধারণ দাবি করা থেকে বিরত থাকেন না। বরং তাঁদের এই দাবিগুলি তাঁদের তত্ত্বের মধ্যেই প্রতিবর্তিতা-সঞ্চালনের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত। দেরিদার ক্ষেত্রে এই অন্তর্ভুক্তি দেখায় যে সব রচনায় প্রতিবর্তিতা দেখা দিতে বাধ্য; তাই একে অস্বীকার করা বা পরিহার করার প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হতে বাধ্য। এই দার্শনিকদের রচনা সম্পূর্ণভাবে প্রতিবর্তী রচনার বক্তব্যও সবসময় রচনার সীমাবদ্ধতা থেকে উদ্ভূত। তাই এঁদের রচনা নিশ্চল বস্তু নয়, যা নিয়ে বিশ্লেষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা হতে পারে, যেমন আমরা মর্মরমূর্তি নিয়ে করি। বরং এঁদের রচনায় গতি আছে, সঞ্চালন আছে; যা বলা যায় এবং যা বলা যায় না এই দুই-এর এক অস্থিরতা আছে। তাই এই রচনায় বর্ণনা, মতপ্রকাশ ও সিদ্ধান্তের পরিশেষে সব কিছু অগ্রাহ্য করে আবার শুরু হয় নতুন যাত্রা। কোনটি বৈধ আর কোনটি অবৈধ তা আর গুরুত্বপূর্ণ নয়, কারণ সবই রচনার অবিরাম অস্থিরতার লক্ষণ এবং অংশ।

শেফালী মৈত্রের প্রবন্ধের প্রসঙ্গে এখানে বিনির্মাণ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। বিনির্মাণের মাধ্যমে একটি রচনা যেমন তার আলংকারিক এবং যৌক্তিক অসামঞ্জস্য উদ্‌ঘাটিত করে, সে রকমই রচনার প্রকাশ্য বক্তব্য এবং রচনা কী বলতে বাধ্য হচ্ছে তাও উন্মোচিত হয়। বস্তুত দেরিদার বিনির্মাণ রচনার এমন এক ঘনিষ্ঠ পাঠ যেখানে প্রত্যয়গুলির যে পার্থক্যের উপর রচনাটি দাঁড়িয়ে আছে বা রচনাটি নির্ভর করছে, রচনার মধ্যেই তার স্ববিরোধী প্রয়োগের ফলে তা রচনার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দিচ্ছে, রচনাটি তার নিজের মানদণ্ডের ভিত্তিতেই অসার্থক হয়ে উঠছে। একই সঙ্গে এ কথা বলাও আবশ্যক যে দেরিদা নিজে কিন্তু বিনির্মাণের কোনো সংজ্ঞা দিতে চাননি, বিনির্মাণের কোনো পদ্ধতি বা কৌশলও নয়। কারণ কোনো সংজ্ঞা তার অর্থ বহন করে—এই অনুমানকেই দেরিদা বিনির্মাণ করতে চান। কিন্তু বিনির্মাণ শুধুমাত্র রচনার মধ্যে অসংগতি বা স্ববিরোধ প্রদর্শন নয়, এর ক্ষমতা আসে দেরিদার এই দাবি থেকে যে একটি রচনা যদি উপস্থিতির পরাতত্ত্বের (মেটাফিজিক্স অব প্রেজেন্স) মধ্যে অবস্থান করে, তা হলে তা সবসময়ই বিনির্মাণ করা সম্ভব। বিনির্মাণ ও 'উপস্থিতির পরাতত্ত্বের' এই যোগ দেরিদার কাছে গুরুত্বপূর্ণ এবং এখানেই দেরিদার বিনির্মাণের সঙ্গে সাহিত্যিক বিনির্মাণের পার্থক্য।

Scanned with

এই যোগ সবচেয়ে পরিষ্কার দেরিদার হুসের্‌ল-সম্পর্কিত প্রথম দুই গ্রন্থে।[৮] হুসের্‌ল তাঁর দর্শনে অভিব্যক্তি (এক্সপ্রেশন) ও নির্দেশ-এর (ইন্ডিকেশন) মধ্যে পার্থক্য করেছেন। এই পার্থক্য চিহ্নের ভূমিকার সঙ্গে সম্পর্কিত। অভিব্যক্তি বক্তার অভিপ্রায়ের সঙ্গে যুক্ত, এ হল চিহ্নের বিশুদ্ধ অর্থ; অন্যদিকে নির্দেশ হল সূচনাত্মক এবং তা অভিপ্রায়ের সঙ্গে সবসময় যুক্ত নয়। হুসের্‌ল-এর আলোচনা করতে গিয়ে দেরিদা বলেন, চিহ্ন সবসময়ই পুনরাবৃত্তির উপর নির্ভরশীল। যদি চিহ্নের পুনরাবৃত্তি সম্ভব না হত, তা হলে তা চিহ্ন থাকত না। তাই চিহ্ন হতে গেলে হুসের্‌ল-এর বিশুদ্ধ অভিব্যক্তির পুনরাবৃত্তির ক্ষমতা থাকা চাই। কিন্তু তাই যদি হয় তা হলে হুসের্‌ল বিশুদ্ধ অভিব্যক্তি সৃষ্টির যে শর্ত আরোপ করেছেন, তা ভেঙে যায়। চিহ্ন আর কল্পনার বিশুদ্ধ সৃষ্টি হিসেবে থাকে না বরং তা যুক্ত হয়ে যায় বিভিন্ন সূচনাত্মক চিহ্নের জালে। দেরিদার বক্তব্য হল পাশ্চাত্য দর্শনে শুধু হুসের্‌ল কেন, প্রায় সব দার্শনিকই নির্ভর করেছেন এক পূর্ব-স্বীকৃত নিশ্চয়তার ধারণার উপর, যে নিশ্চয়তার উপস্থিতি অবিলম্বিত ও তাৎক্ষণিক। এইসব দর্শনের উৎস ও ভিত্তি হল এই উপস্থিতি। দেরিদা এই উপস্থিতির সম্ভাবনাকে অস্বীকার করেন। দেরিদার মতে, পাশ্চাত্য দর্শনে বাচন ও লেখনের মধ্যে বাচনকে অগ্রাধিকার দেবার যে প্রবণতা, যাকে তিনি ধ্বনিকেন্দ্রিকতা (ফোনোসেন্ট্রিজম) বলে আখ্যা দেন, তাও এই উপস্থিতির পরাতত্ত্বের পূর্ব-স্বীকৃত ধারণার ফল। বাচন যেহেতু তাৎক্ষণিক এবং অবিলম্বে অধিগত তাই বাচন বর্তমান ও উপস্থিত—এই যে ধারণা, তাকে দেরিদা অস্বীকার করেন। বিনির্মাণ সম্ভব, কারণ সব রচনাই নির্মিত হয় দুটি পূর্ব-স্বীকৃত ধারণাকে ভিত্তি করে: একটি হল নির্দিষ্ট অর্থের ভিত্তি বা লোগোসেন্ট্রিজম এবং অন্যটি হল উপস্থিতির পরাতত্ত্বের ধারণা। শেফালী মৈত্র লোগোসেন্ট্রিজমকে যুক্তিকেন্দ্রিকতা হিসেবে বিচার করেছেন, যে-বিচার আমার মনে হয় কিছুটা অসম্পূর্ণ। গ্রীক শব্দ 'লোগোস' যে সমস্ত দ্যোতনা বহন করে, তার মধ্যে যুক্তি তো পড়েই, আবার তার মধ্যে প্রজ্ঞা আর পরমার্থের দ্যোতনাও কখনো কখনো আসে। খ্রিস্টধর্মের আদিযুগে ধ্রুপদী দর্শনকে যুগপৎ ধারণ ও অতিক্রম করার জন্য 'লোগোস' শব্দটি ঈশ্বরের বাণী অর্থে ব্যবহৃত হত : ঈশ্বরই একমাত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা, তাঁর বাণী বা শব্দ একই সঙ্গে অর্থের উৎস এবং অর্থের সূচক এবং একমাত্র স্বয়ং সম্পূর্ণ বাণী। দেরিদার মতে লোগোসের প্রভাব পড়েছে বহুদূর। বাচন মাধ্যমহীন অভিব্যক্তি হিসেবে বিশুদ্ধ এই ধারণা থেকে লোগোসকে স্থাপন করা হয়েছে

লেখনের চেয়ে উচ্চাসনে এবং লেখনকে গ্রহণ করা হয়েছে বাচনের বিশুদ্ধতার একটি প্রয়োজনীয় কিন্তু সন্দেহজনক সম্পূরক হিসেবে। বাচনকে বেশি মূল্য দেওয়ার মধ্যে যে প্রবণতা বিদ্যমান তা হল স্বয়ংসম্পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষা, বিশুদ্ধতার আকাঙ্ক্ষা। দেরিদার মতে বিশুদ্ধ বাচন যেমন সম্ভব নয় তেমনি উপস্থিতিও সম্ভব নয়। তিনি উপস্থিতিকে অনুপস্থিতির অন্তর্ভুক্ত করেন। বাচন তাঁর মতে সর্বদাই (ও) ইতিমধ্যেই (অলওয়েজ অলরেডি) লেখনের সঙ্গে সম্পর্কিত।

দেরিদা অর্থকেন্দ্রিকতার ফাঁদ এড়াবার জন্য নতুন নতুন শব্দের উদ্ভব করেছেন, একবার ব্যবহার করার পর এই শব্দগুলি পরিত্যাগ করা ছাড়া উপায় নেই। যদিও রোরটি বলেছেন, এ কোনোমতেই সম্ভব নয়, ছাত্র ও অধ্যাপকদের ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে শব্দগুলি শেষ অবধি একটা অর্থ পেয়েই যাবে।[৯] দেরিদা তাঁর লেখায় উক্তির অপসারণের (ইরেজার) মাধ্যমে লোগোসেন্ট্রিক ক্লোজার থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছেন বা অনেক সময় বেছে নিয়েছেন এমন এক লিখনশৈলী যাকে বলা যায়, প্যারডির প্যারডি।[১০] বস্তুত এই ক্লোজারকে পরিহার করার জন্য দেরিদা নিজের গ্রন্থের ভূমিকা লেখা থেকেও সাধারণত বিরত থেকেছেন। শেফালী মৈত্র লিখেছেন, 'বিনির্মাণবাদীদের মতে ক্লোজার বা আবেষ্টন থাকা মাত্রই দূষ্য'। আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে বলতে হয় বিনির্মাণবাদীরা জানেন, তাঁদের রচনাও হয়তো ক্লোজারের ফাঁদমুক্ত থাকতে পারে না বা পারবে না। সেইজন্যই নানা ছলাকলা, কলাকৌশল, ইরেজার, ট্রেস, প্যারডির প্যারডি ইত্যাদি। বিনির্মাণে নয়, আধুনিকোত্তরতার বৈশিষ্ট্য নিহিত আছে এই কলাকৌশল বা ছলাকলার মধ্যেই।

সূত্র-নির্দেশ

১. Martin Heidegger, *Being and Time*, New York, 1962; *Poetry, Language, Thought*, New York & London, 1975; *The Question Concerning Technology*, New York, 1977.

২. Susan Sontag, *Against Interpretation*, New York, 1966.

৩. Jacques Derrida, 'Qual Quelle : Valéry's Sources', *Margins of Philosophy*, Chicago, 1982.

৪. Jacques Derrida, 'Is There a Philosophical Language', *Points... Interviews, 1974-1994*, ed., E. Wever, Stanford, 1995.

Scanned with

৫. Jacques Derrida, 'Linguistics and Grammatology', *Of Grammatology*, Baltimore, 1976.

৬. L. Wittgenstein, *Tractatus Logico-Philosophicus*, London, 1961, 5·6.

৭. তদেব, 6·54.

৮. Jacques Derrida, *'Speech and Phenomena' and Other Essays on Husserl's Theory of Signs*, Evanston, 1973; *Edmund Husserl's 'Origin of Geometry' : An Introduction*, Pittsburgh, 1978.

৯. Richard Rorty, 'Deconstruction and Circumvention', *Critical Inquiry*, vol. II, 1984, pp.1-23.

১০. এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য Jacques Derrida, *Spurs : Nietzsche's Styles*, Chicago, 1979.

সংলাপ ২*

'নির্মাণ থেকে বিনির্মাণ'-এর মতো একটি উচ্চমানের নিবন্ধের জন্য শেফালী মৈত্র আমাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা আদায় করে নিয়েছেন। মুগ্ধ হয়েছি শেফালীর চিন্তার স্বচ্ছতায়, বক্তব্য উপস্থাপনে তাঁর অনায়াস দক্ষতায়। দর্শন-বিষয়ক কোনো প্রবন্ধে আমরা সচরাচর যে ধরনের অকারণ পাণ্ডিত্য ও ভীতিপ্রদ দুর্বোধ্যতার সঙ্গে পরিচিত শেফালীর প্রবন্ধে তার অনুপস্থিতি আমাদের এক বিশেষ স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য এনে দেয়। তাঁর লেখা অত্যন্ত ঝরঝরে, প্রশংসনীয় তাঁর পরিমিতিবোধ : আর এই পরিচ্ছন্নতা ও পরিমিতিবোধের আবহে তাঁর বক্তব্য এক গভীর ঋজুতায় বিস্তারলাভ করেছে। বলা বাহুল্য, বিষয়ের উপর বিশেষ দখল না থাকলে এটি সম্ভব নয়। লেখিকার কৃতিত্ব এইখানেই।

শেফালীর উদ্দেশ্য নির্মাণ থেকে বিনির্মাণের পথ তৈরি করা। দর্শনের যে-কোনো আধুনিক প্রকল্পে বিশেষ প্রাধান্য পায় 'নির্মাণ'—যার কেন্দ্রবিন্দু কোনো ধ্রুব ও অপরিহার্য মৌল ধারণা, কোনো অচলায়তনের আবেষ্টন (ক্লোজার)। এই মনগড়া অচলায়তন থেকে বেরিয়ে আসার অন্য নাম 'বিনির্মাণ'। আধুনিকোত্তর পর্বে দেরিদা, রোরটি অথবা লিওতার এইভাবেই বেরিয়ে আসতে চান শাশ্বত থেকে

*কল্যাণকুমার সেনগুপ্ত, প্রাক্তন অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।

ঐতিহাসিকতায়। ধ্রুবত্বের বিরুদ্ধে এই তীব্র প্রতিক্রিয়ার মধ্যেই বিনির্মাণ প্রাণিত হয়ে ওঠে। লেখিকার ভাষায় :

'বিনির্মাণবাদীদের মতে ক্লোজার বা আবেষ্টন থাকা মাত্রই দূষ্য, তা সে লজিকের বৃত্তেই হোক, অথবা আদর্শ বা বিজ্ঞানের কোনো বৃত্তে হোক। ব্যাখ্যার যে-কোনো একমাত্রিকতাই অগণতান্ত্রিক, তথা দূষ্য। ইতিহাস আমাদের দেখিয়েছে যে ধ্রুবত্বের দাবি বারে বারে করা হয়েছে, কিন্তু কোনো দাবিই ধোপে টেকেনি, তবু দার্শনিক একটা কোনো শাশ্বত ধ্রুব সত্য যুক্তি বা বিজ্ঞান বা মতাদর্শের মধ্য দিয়ে জগতের ব্যাখ্যা খুঁজেই চলে—এমন কোনো ধ্রুব সত্য যা দর্শনকে একটা সুপ্রতিষ্ঠিত চেহারা দিতে পারে। ... তবু যেন সব দার্শনিক বলতে চান, 'কোনো বাক্য বোধগম্য হবে না যদি না অমুক, অমুক স্বীকার করা হয়।' এই শূন্যস্থানে কান্ট বসালেন ইনটুইশন আর ক্যাটিগরি-কাঠামো। অর্থাৎ 'কোনো বাক্যই বোধগম্য হবে না যদি না তা মানুষের ইনটুইশন আর ক্যাটিগরি-কাঠামোর দ্বারা বিন্যস্ত হয়।' ফ্রেগে আর হুইটগেন্‌স্টাইন বলছেন, কোনো বাক্য বোধগম্য হবে না যদি না বাক্যটি তাঁদের দেওয়া লজিকের কাঠামো বা ফর্মের মধ্যে পড়ে। আর ডেভিড্‌সন বলেন, কোনো বাক্য বোধগম্য হবে না যদি না বাক্যটি তাঁর দেওয়া কোহিয়ারেন্স বা সংগতির শর্ত পূরণ করে। এভাবে একটা মাত্রা দিয়ে গোটা জগৎকে দেখতে চাওয়া দেরিদার মতে একটা ক্লোজার বা আবেষ্টন। এঁরা প্রত্যেকে মনে করছেন, তাঁরা যা বলছেন তা-ই শেষ কথা এবং আর যে যা বলছে তার নির্গলিতার্থ যদি তাঁদের বক্তব্যের সঙ্গে মিলে যায় ভালো, নয়তো সেটা প্রলাপ। ... একটি রূপক ব্যবহার করে বলা যায় যে এই দার্শনিকদের ব্যাখ্যায় যেন আছে শুধু আশ্রয়-বাক্য আর তার থেকে নিষ্কাশিত কতগুলি সিদ্ধান্ত, আর বাদবাকি, চারপাশে যেন সাদা মার্জিন। মনে করা হয় এই আশ্রয়-বাক্য আর তার থেকে নিষ্কাশিত সিদ্ধান্ত অনন্য; বিকল্প কোনো ব্যাখ্যা আর-কোনো শাস্ত্র জোগাতে পারে না, এই ব্যাখ্যা যেন সর্বব্যাপ্য, এর বাইরে আর বোঝার কিছু থাকে না ; দাবি করা হয়, এই ব্যাখ্যা চূড়ান্ত, এর কোনো নড়চড় হতে পারে না। পাশ্চাত্য বিনির্মাণের পরিভাষায় দার্শনিকরা আমাদের দিচ্ছেন একটি অদ্বিতীয়, সমগ্র, বদ্ধ, শব্দতালিকা (ইউনিক, টোটাল, ক্লোজড ভোকাবুলারি)।'

দেরিদা বলতে চান, এমন আশ্রয়-বাক্যের সাহায্য নেওয়া মানে একধরনের মেটাফর বা উৎপ্রেক্ষার সাহায্য নেওয়া—কোনো মেটাফরই অনৈতিহাসিক নয় যদিও এই কথাটা আমরা অনেক সময় স্বীকার করতে চাই না। ইতিহাস বদলের সঙ্গে

Scanned with

আমাদের মেটাফর বদলায়, পালটে যায় দর্শন। এই সত্যটুকু অস্বীকার করলেই আমরা কোনো-না-কোনো ক্লোজার বা আবেষ্টন সৃষ্টি করে ফেলি। দেরিদার এই বক্তব্যের সঙ্গে রোরটি একমত।

এই প্রসঙ্গে বলা যায়, দেরিদার বিনির্মাণের কথা যদি আমরা মনে রাখি তবে নরিস কিংবা গাশের ভাষ্য যথাযথ বলে মনে হবে না। এঁরা দেরিদাকে দর্শনের অপরিবর্তনীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে মেলাতে চান : 'Derrida has devoted the bulk of his writings to a patient working-through (albeit on his own, very different terms) of precisely those problems that have occupied philosophers in the 'main-stream' tradition, from Kant to Husserl and Frege'. (Christopher Norris, *Derrida* দ্রষ্টব্য)। এঁরা বলতে চান অন্যান্য ট্রানসেন্ডেন্টাল দার্শনিকদের মতো দেরিদারও মূল বিবেচ্য বা প্রশ্ন : 'কোনো কিছু সম্ভব হয়ে ওঠে কোন অপরিহার্য শর্তে'? তা সে ভাষাই হোক অথবা দর্শনই হোক। এবং এই প্রশ্নের উত্তরে দেরিদার বক্তব্য, ভাষার সমস্ত বিভিন্নতা যে ঐক্যসূত্রে বা মূল শিকড়ে বিন্যস্ত তার নাম *différance* । এই ভাষ্য মানলে যে নির্মাণ বা মৌল ধারণার বিরুদ্ধে দেরিদার জেহাদ সেই দিগন্তের মধ্যেই তাঁকে নিয়ে আসতে হয়। তা হলে দেরিদার দর্শনেও প্রশ্রয় পায় অচলায়তন আবেষ্টন। তা হলে যাঁরা মনে করেন, 'This word (deconstruction) has had a remarkable career. Having first appeared in several texts that Derrida published in the mid-1960s, it soon became the preferred designator for the distinct approach and concerns that set his thinking apart' (*A Derrida Reader Between the Blinds* দ্রষ্টব্য) তাঁদের বক্তব্য নিরালম্ব হয়ে পড়ে। তা হলে আর বলা যাবে না, সবরকম বনিয়াদি তত্ত্ব ও তথ্যকে দেরিদা সন্দেহের চোখে দেখেন এবং চেষ্টা করেন বিনির্মাণ করতে।

আর সব শেষে থাকে কিছু প্রত্যাশা ও কিছু সংশয়। শেফালীর প্রবন্ধে বিনির্মাণ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেলে খুশি হতাম। বিশেষ করে হুসের্‌ল ও হাইডেগারের যে ঐতিহাসিক অনুষঙ্গে দেরিদার দর্শন উঠে এসেছে (দেরিদার *Speech and Phenomena, Margins of Philosophy* দ্রষ্টব্য) তার কিছু আলোচনা প্রয়োজনীয় ছিল। এই প্রবন্ধে বিনির্মাণ বিষয়ে যতটুকু পেয়েছি তাতে মন ভরেনি। আরও কিছু প্রত্যাশা ছিল। বিশেষ করে বিনির্মাণের নানা অন্তর্লীন তরঙ্গ ও

ব্যঞ্জনা, হুসের্‌লীয় সারতত্ত্ব এবং হাইডেগারের *Sein, Ereignis* ইত্যাদি 'unique magic word'-এর বিরুদ্ধে দেরিদার প্রবল অভিঘাত।

এবার একটু সংশয়। ডেভিড্‌সনকে শেফালী যতটা নিশ্চিত প্রত্যয়ে নির্মাণ বা ক্লোজারের পরিমণ্ডলের মধ্যে চিহ্নিত করেছেন তা সর্বজনসম্মত হবে কিনা জানি না। কেননা Ernest LePore-সম্পাদিত ডেভিড্‌সন-বিষয়ক গ্রন্থে Samuel C. Wheeler III-এর লেখা ''Indeterminacy of French Interpretation: Derrida and Davidson'' প্রবন্ধে আমরা পেয়েছি এক ভিন্নতর ভাষ্য যেখানে প্রধান হয়ে উঠেছে ডেভিড্‌সনের সঙ্গে দেরিদার বিনির্মাণের সাযুজ্য।

কিন্তু সংশয় যেখানে আরও অনেক বেশি তা লেখিকার নিম্নলিখিত মন্তব্য ঘিরে : 'বিনির্মাণবাদীরা খেলায় মাতেননি। দার্শনিক সৌধ বিনির্মাণে তাঁরা যথোপযুক্ত যুক্তি ব্যবহার করেছেন'। এবং এই একই কথা অন্য ভাষায় : 'রোরটি যতই মনে করুন দর্শনের পরিমণ্ডল থেকে না বেরোলে আধুনিকোত্তর হওয়া যায় না, দেরিদা তবু দর্শন চর্চা ছাড়তে রাজি নন... তাঁর লেখায় যথেষ্ট দার্শনিক ঋজুতা আমরা দেখতে পাই। দেরিদা কখনোই দর্শন ছেড়ে সাহিত্যের খাতায় নাম লেখানোর কথা বলেননি।' মনে হয়, শেফালীর এই বক্তব্য নরিস ও গাশের ভাষ্যের দ্বারা সংক্রামিত—যাঁদের কাছে দর্শন খেলা নয়, যুক্তির অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। কিন্তু 'খেলা' কথাটি দেরিদা স্বয়ং ব্যবহার করেছেন। 'Play of Signifiers' কথাটি বোধহয় তাঁর মুখেই শুনেছি। আমরা জানি হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইনও 'game' কথাটি ব্যবহার করেছেন। এবং খেলা হলেই সেখানে কোনো নিয়ম, শৃঙ্খলা বা যুক্তি থাকবে না—এ কথা মনে করার কোনো কারণ নেই। শেফালীর প্রতিবাদ উচ্চারিত বিশেষ করে রোরটির বিরুদ্ধে। তাঁর মতে, রোরটির কাছে দর্শন বিলুপ্ত হয়েছে সাহিত্যের মধ্যে। কারণ যে-কোনো দার্শনিক তত্ত্বই আসলে গল্প বা ন্যারেটিভ, তাই তা সাহিত্য-সমালোচনার এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে। ফলে সাহিত্যিক সাম্রাজ্যবাদের কাছে রোরটির অকুণ্ঠ ও নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ। রোরটি সম্পর্কে শেফালীর এই বিশ্লেষণ কি যথার্থ? এ কথা সত্যি, কোনো শাশ্বত সত্য বা লিওতারের ভাষায়, কোনো মেটান্যারেটিভ (*Postmodern Condition*)-এর পটভূমিকায় দর্শনকে সংস্থাপিত করতে রোরটি একেবারেই রাজি নন। এবং সেই যুক্তিকে তিনি দূষ্য বলে মনে করেন যা কোনো অচলায়তন প্রতিষ্ঠানের সপক্ষে যায়। দর্শনকে তিনি এই ধ্রুবত্বের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিতে চান; দর্শনের মৃত্যুর অর্থ এই বশ্যতা থেকে বেরিয়ে আসা। কিন্তু এর অর্থ দর্শনের পরিসমাপ্তি নয়, এক নতুন মাত্রায়

Scanned with

তার উত্তরণ। এর অর্থ দর্শনের এক redescription—মেটান্যারেটিভ থেকে ন্যারেটিভে (*Contingency, Irony and Solidarity* দ্রষ্টব্য)। এই ন্যারেটিভ-কেন্দ্রিক হওয়ার জন্য সাহিত্যকে সম্প্রসারিত অর্থে নিলে দর্শন তার কাছাকাছি এসে যায় বটে, কিন্তু এই ন্যারেটিভের পেছনে কোনো যুক্তি (reason) নেই এ কথা ঠিক নয়। শুধু সে যুক্তির ব্যঞ্জনা ভিন্ন। সে যুক্তি প্র্যাগ্‌ম্যাটিক এবং সামাজিক রীতি (convention)-শাসিত। রোরটির ভাষায়: there is nothing to be said about...rationality apart from descriptions of the familiar procedures of justification which a given society—ours—uses in one or another area of inquiry ('Solidarity or Objectivity', J. Rajchman and C. West সম্পাদিত *Post-Analytic Philosophy*। আমার মনে হয়, দেরিদা যখন একই সঙ্গে বলেন, দর্শন মাত্রই রূপকাশ্রয়ক বা গল্পকথা (narrative) এবং যুক্তি-আশ্রয়ী—তখন তাঁর কথার যথার্থ তাৎপর্য এইভাবেই বুঝতে হবে।

অবশ্য এ কথা স্বীকার করে নেওয়া ভালো, আমার এই আলোচনা এক তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া, এবং হয়তো তাই কিছুটা এলোমেলো। তবু আশা রাখি, এই শিথিলতার মধ্যেও আমার বক্তব্যের মূল সুরটির আভাস হয়তো পাওয়া যাবে।

সংলাপ ৩*

প্রদীপ বসু বলেছেন, 'শেফালী মৈত্র তাঁর রচনায় নির্মাণ থেকে বিনির্মাণের যে ব্যাখ্যা রচনা করেছেন তা এক নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা এবং ক্লোজারও'। কথাটা ঠিকই, আমি মনে করি না কোনো বিষয়ের ক্লোজার-নিরপেক্ষ ব্যাখ্যা রচনা করা যায়, সচেতন থাকলেও করা যায় না। আমার প্রবন্ধের গোড়াতেই বলা আছে, 'যুক্তিবাদী দর্শন দেকার্ত থেকে শুরু করে এই শতকের শেষ অবধি অনেক ঘাত-প্রতিঘাত অনেক আত্মসমালোচনার মধ্যে দিয়ে এসেছে, তা সত্ত্বেও তা বিনির্মাণবাদীদের আস্থাভাজন হতে পারছে না, কেন পারছে না, তা দেখা এই প্রবন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য'। অর্থাৎ র‍্যাশনালিস্ট ট্র্যাডিশনের নানান ভাঙাগড়ার কাহিনী বলে দেখাতে চেয়েছি, কেমন করে তাঁরা আধুনিক পর্যায়ে

*শেফালী মৈত্র

এসেছেন—যে-পর্যায়ে র‍্যাশনালিস্টরা মনে করেন, পুরোনো দিনের অ্যান্টি-ফাউন্ডেশনাল অভিযোগ তাঁরা খণ্ডন করতে পারেন। এ সত্ত্বেও তাঁরা এখনও আক্রান্ত— বিনির্মাণবাদীরা এখনও এঁদের দর্শনে ক্লোজার দেখেন—নিছক ক্লোজার নয়, লোগোসেন্ট্রিক ক্লোজার। বিনির্মাণবাদীদের অভিযোগ যেসব দার্শনিকদের বিরুদ্ধে, তাঁরা প্রায় সকলেই এই আপত্তি সম্বন্ধে অজ্ঞ অথবা উদাসীন। 'নির্মাণ থেকে বিনির্মাণ'-এর উদ্দেশ্য, এঁদের একটু নাড়া দেওয়া, কিছুটা অপরিচয়ের বোরখা সরানো। প্রদীপ বসু ঠিকই বলেছেন, 'এও এক আখ্যানের রচনা যা একই সঙ্গে এক টেলোস-এরও ইঙ্গিতবাহী'। এই আখ্যানে বিনির্মাণ তথা দেরিদার বিশদ বিবরণ না থাকায় কল্যাণ সেনগুপ্তর মতো আরও অনেকেরই প্রত্যাশা পূরণ না হওয়াই স্বাভাবিক। আমার প্রবন্ধের শিরোনাম এই প্রত্যাশা জাগানোর জন্য অনেকাংশে দায়ী।

এই প্রবন্ধে লোগোসেন্ট্রিজম্-এর খুব সংকীর্ণ অর্থ ধরে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। লোগোস বলতে বোঝানো হয়েছে : রিজন। এই সংকীর্ণ অর্থে দেরিদাও কখনো কখনো কথাটা ব্যবহার করেছেন। একটি সাক্ষাৎকারে উনি লোগোস, রিজন আর ডিস্‌কোর্সকে সমার্থক বলেছেন।[১] আমার সীমিত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এটুকু নিয়েই কাজ করেছি। বিনির্মাণের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় লোগোসের প্রসারিত অর্থ বাদ দিয়ে অবশ্যই দেওয়া যায় না।

প্রদীপ বসু বলেছেন, বিনির্মাণের আলোচনায় (আমি বলব, পূর্ণাঙ্গ আলোচনায়) জরুরি হয়ে পড়ে ভাষা, চিহ্ন ও রচনার অবদান; আর সেইসঙ্গে, আমাদের ভাষা সম্বন্ধে দাবি, ভাষার সঙ্গে জগতের দাবি (সম্পর্ক?) এবং সবরকম পরোক্ষ দাবি। প্রবন্ধে এই দিকটা না থাকার ফলে, আমি মনে করি, ভুল বোঝার অবকাশ থেকে গেছে। মনে হতে পারে, বিনির্মাণ মানে শুধু বিরোধ—নির্মাণের সঙ্গে সংঘাত। বিনির্মাণবাদীদের কাজে যে ইতিবাচক দিক আছে তা বর্তমান লেখায় সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। কোনোরকম এসেন্স, উপস্থিতি বা প্রেজেন্স স্বীকার না করে শব্দার্থের পৌনঃপুনিকত্ব বা ইটারেবিলিটি কী করে ব্যাখ্যা করা যায়, তা না বললে বিনির্মাণের গঠনমূলক দিক সম্বন্ধে কিছু বলাই হয় না। 'বিনির্মাণ' শব্দে 'বি' উপসর্গটির নঞর্থ-অতিরিক্ত যে একটা গঠনমূলক দ্যোতনা আছে তা অনুচ্চারিত থেকে যায়। হয়তো সেই গঠনমূলক দিকেই আমাকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছেন কল্যাণকুমার সেনগুপ্ত—দেরিদার সঙ্গে ডেভিড্‌সনের সম্পর্কের কথা বলে। স্যামুয়েল সি. হুইলার-এর প্রবন্ধ 'ইন্‌ডিটারমিনেসি অব ফ্রেন্চ ইন্টারপ্রিটেশন: দেরিদা অ্যান্ড

Scanned with

ডেভিড্‌সন" অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।[২] এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আমি কল্যাণ কুমার সেনগুপ্তর কাছে কৃতজ্ঞ। এই প্রবন্ধ পড়ার পরেও আমি কিন্তু ডেভিড্‌সন আর দেরিদার সাযুজ্য দেখতে পাচ্ছি না। ডেভিড্‌সন আর দেরিদা উভয়েই ভাষার এসেন্স অস্বীকার করেছেন আর তাই নেসেসিটি বা আবশ্যিকতার ধারণা সম্বন্ধে তাঁদের নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। এঁদের সাদৃশ্য এই পর্যন্তই। এর পরে তাঁরা যাত্রা করেছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে। ডেভিড্‌সন মানছেন, উদারম্মন্যতার নীতি, আর সেইসঙ্গে বলছেন, কোনো বাক্য বোধগম্য হবে না, যদি-না বাক্যটি তাঁর দেওয়া কোহিয়ারেন্স বা সংগতির শর্ত পূরণ করে—উনি এও মনে করেন যে 'কোহিয়ারেন্স লিড্‌স টু করেস্‌পন্ডেন্স', বা সংগতির সূত্র ধরে আমরা জগতে পৌঁছে যেতে পারি। আমার তো মনে হয় না, আমরা কোনোভাবে ডেভিড্‌সনকে দেরিদাপন্থী বলতে পারি। হুইলারও তাঁর প্রবন্ধে তা বলেননি। হুইলার বলছেন, ডেভিড্‌সন ও দেরিদার মূল পার্থক্য ইন্টারপ্রিটেশনের অনির্ণেয়ত্ব ব্যাখ্যায় ('ইনডিটারমিনেসি অব ইন্টারপ্রিটেশন')। ডেভিড্‌সন যেন বলছেন, খণ্ডাংশের ইন্টারপ্রিটেশন পৃথকভাবে হয় না—ব্যাখ্যা সবসময় অখণ্ড বা হোলিস্টিক হয়। এই অখণ্ড বা পূর্ণাবয়ব ব্যাখ্যার অনির্ণেয়ত্ব একমাত্র প্রান্তদেশে থাকতে পারে; মূল অংশে নয়। ডেভিড্‌সন মনে করেন, সব মানুষের অধিকাংশ বিশ্বাস এক এবং প্রতিটি মানুষের অধিকাংশ বিশ্বাস ঠিক, অতএব পরস্পরকে না বোঝাটা কখনোই আত্যন্তিক হতে পারে না। উপমার সাহায্যে বলা যায়, মার্জিনের কাছে কিছু অংশ যদি অনির্ণেয় থাকেও তাতে আমাদের পরস্পরকে ঠিক বোঝায় কোনো অন্তরায় সৃষ্টি হয় না। দেরিদা ইন্টারপ্রিটেশনের ব্যাপারে এমন আস্থাবান নন। তিনি মনে করেন, অনুকূল পরিবেশেও ইন্টারপ্রিটেশনে অনির্ণেয়ত্ব থাকতে পারে। এই ব্যাপারে দেরিদা আর ডেভিড্‌সনের পার্থক্য হুইলার প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করেছেন[৩] এবং প্রবন্ধের উপসংহারে বলেছেন, তিনি মনে করেন না ইন্টারপ্রিটেশনের বিষয়ে ডেভিড্‌সন-এর সঙ্গে দেরিদা সহমত।[৪]

রোরটির সঙ্গে দেরিদার তথা দর্শনের সম্পর্ক কী আর দেরিদার সঙ্গে দর্শনের সম্পর্কই বা কী, এ বিষয়ে দ্বিমত থাকতে পারে, তবু কল্যাণ কুমার সেনগুপ্তকে অনুরোধ করব কতকগুলো কথা বিবেচনা করতে। রোরটি র‍্যাশনালিটিকে পুরোপুরি বর্ণনা বা ডেসক্রিপশনের আওতায় এনেছেন নিঃসন্দেহে কিন্তু তার সঙ্গে আর একটা কাজও করেছেন তিনি—দার্শনিক আলোচনাকে রাজনীতির পরিমণ্ডলে এনেছেন বা

রিডিউস করেছেন। তাঁর কাছে দর্শনের কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই যার বলে দর্শন আমাদের জীবন-যাপনের সমস্যা সমাধানে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে। মেটাফিলসফি বা অধিবিদ্যা বর্জন করে রোর্‌টি আমাদের আর-এক ধরনের দর্শনচর্চার পরামর্শ দিচ্ছেন না; উনি বলছেন, দর্শন ছেড়ে দিয়ে সোজাসুজি রাজনীতির আলোচনা করতে; কারণ আমাদের জীবন-যাপনের সমস্যাগুলি মূলত রাজনৈতিক সমস্যা, দর্শনের সমস্যা নয়।[৫] তিনি মনে করেন না যে রাজনীতি র‍্যাশনালিটি-নিরপেক্ষ—অন্যান্য শাস্ত্রের মতো রাজনীতিও র‍্যাশনালিটির সাহায্য নিতে পারে। কিন্তু এই সুবাদে এইসব আলোচনা দার্শনিক আলোচনায় পর্যবসিত হয় না। অন্য পক্ষে দেরিদার কাছে, আমার মনে হয়, দর্শন খুব জরুরি। দেরিদা অবশ্যই লোগোসেন্ট্রিজম এবং উপস্থিতি বা প্রেজেন্স বাদ দিয়েই দর্শনের কথা ভাবছেন। এই কথার সমর্থন তাঁর সাক্ষাৎকারেই রয়েছে। সেখানে উনি পরিষ্কার করে বলছেন, দর্শনের বিলুপ্তি উনি চান না—চান নবীনায়ন[৬] ; রোরটি চান বিলুপ্তি।

সূত্র-নির্দেশ

১. 'Logocentrism, to put it in summary form, is an attempt which can only ever fail, an attempt to trace the sense of being to the logos, to discourse or reason (*legein* is to collect or assemble in a discourse) and which considers writing or technique to be secondary to logos,' *French Philosophers in Conversation*, ed. Raoul Mortley, London and New York, 1991, p. 104.

২. Samuel C. Wheeler III, 'Indeterminacy of French Interpretation: Derrida and Davidson', *Truth and Interpretation : Perspectives on the Philosophy of Donald Davidson*, ed. Ernest LePore, Oxford, 1986.

৩. 'The eruptions of Davidsonian indeterminacy seem to occur only at margins, since interpretation itself depends on overall agreement. Thus there can be no global breakdown while interpretation is possible. It seems that, in the best of circumstances, there is stability for Davidson's theory. According to Derrida, on the other hand, since iterability itself brings about displacement of interpretation, indeterminacy obtains even in the best of circumstances,' LePore, *Truth and Interpretation*, p. 490.

৪. 'Some brief disavowals and disclaimers will be required to show that this paper is serious as a whole, and not to be taken as an attempted demonstration that Davidson can be read as anybody's co-believer...I have ignored a great deal that is important and interesting in Derrida's work, and would not claim that his main significance is as fellow-traveller with Davidson's views of interpretation', LePore, *Truth and Interpretation*, pp. 493-94.

Scanned with

৫. 'The moral I wish to draw from the story I have been telling is that we should carry through on the rejection of metaphilosophical scientism... If I am right in thinking that the difference between Heidegger's and Dewey's ways of rejecting scientism is political rather than methodological or metaphysical, then it would be well for us to debate political topics explicitly, rather than using Aesopian philosophical language.

If we did, then I think that we would realize how little theoretical reflection is likely to help us with our current problems. For once we have criticized all the self-deceptive sophistry, and exposed all the "false consciousness", the result of our efforts is to find ourselves just where our grandfathers suspected we were: in the midst of a struggle for power between those who currently possess it... and those who are starving or terrorized because they lack it. Neither twentieth-century Marxism, nor analytical philosophy, nor post-Nietzschean "continental" philosophy has done anything to clarify this struggle.' Richard Rorty, 'Philosophy as Science, as Metaphor, and as Politics,' *Essays on Heidegger and Others : Philosophical Papers*, vol. II, Cambridge, 1991, pp. 25-6.

৬. 'I am not among those who say that philosophy is finished. Even when I talk about the closure of logocentrism, and the closure of metaphysics, I make a distinction between closure and end : I think that the conclusion that philosophy has reached its conclusion, come to its term, is a dangerous thing and a thing which I would resist. I think that philosophy has, *is*, the future, but for the moment it has to give its consideration to that which has enclosed it, a set of finite possibilities,' *French Philosophers in Conversation*, ed. Raoul Mortley, p. 106.

পারিভাষিক শব্দাবলি

activism সক্রিয় আন্দোলন

adolescence বয়ঃসন্ধি

ahistorical ইতিহাস-অনপেক্ষ

altruism পরার্থপরতা

a posteriori অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ

a priori অভিজ্ঞতা-অনপেক্ষ বা পূর্বতঃসিদ্ধ

atomic self আণবিক সত্তা

brutish বর্বর

care ethics দরদী নৈতিকতা

categorical imperative নিঃশর্ত আদেশ

charity, principle of উদারমনস্কতার সূত্র

classical two-valued logic ধ্রুপদী দ্বি-মাত্রিক লজিক

closed বদ্ধ

closure আবেষ্টন

co-feeling অন্যোন্য-ভাব

coherence যৌক্তিক সংগতি

complementary পরিপূরক

connectedness সংযুক্তি

construction নির্মাণ

context-neutral অনুষঙ্গ-নিরপেক্ষ

deconstruction বিনির্মাণ

defer মুলতুবি

Scanned with

early Wittgenstein নবীন হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইন
ecofeminist নারী-নিসর্গনীতিবাদী
ecology
- deep নিবিড়-নিসর্গনীতি
- social সামাজিক নিসর্গনীতি

empowered ক্ষমতাশালী
epistemology জ্ঞানতত্ত্ব
error of omission তত্ত্বের অনবধান
essentialist position অপরিহার্য অবস্থান
exit নিষ্ক্রমণ
experience of sensitive intimacy সংবেদনশীল ঘনিষ্ঠতার অভিজ্ঞতা
extension of morality নৈতিকতার বিস্তার

feminism নারীবাদ
form of life জীবনযাপনের পরিমণ্ডল
foundational conceptual scheme মৌল ধারণার বনিয়াদ

gender লিঙ্গ
- bias লিঙ্গ-পক্ষপাত
- discrimination লিঙ্গ-বৈষম্য
- division লিঙ্গ-বিভাজন
- identity লিঙ্গ-পরিচয়
- justice/equality লিঙ্গ-সাম্য
- neutral লিঙ্গ-বর্জিত/লিঙ্গ-অনপেক্ষ
- perspective লিঙ্গ-প্রেক্ষিত
- trait লিঙ্গ-ধর্ম

gendered লিঙ্গ-লাঞ্ছিত
gynocentrism নারীকেন্দ্রিক

highest regulative principle সর্বোচ্চ নিয়ামক বিধি
holistic অখণ্ড
humanist enlightenment মানবিক জ্ঞানালোকবাদ

individualism স্বাতন্ত্র্যবাদ
integrated সমন্বিত
interdisciplinary আন্তঃবিষয়ক
internal relation আন্তঃসম্পর্ক
intrinsic vagueness অন্তর্নিহিত অস্পষ্টতা

justice ন্যায়-নীতি
- distributive বিতরণধর্মী
- retributive শাস্তিমূলক

language of pure thought বিশুদ্ধ মননের ভাষা
later Wittgenstein প্রবীণ হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইন

law বিধি
- of contradiction বিরোধাত্মক বিধি
- of excluded middle নির্মাধ্যম বিধি
- of identity তাদাত্ম্য বিধি

laws
- of thought চিন্তনের বিধি
- of truth সত্যের বিধি

liberalism উদারতাবাদ
linear একরৈখিক

mainstream philosophy মূলস্রোতের দর্শন
matriarchy মাতৃতন্ত্র
meta-discourse অতিবর্তী বিচার

Scanned with

metalevel ethics পরানীতি তত্ত্ব
methodological pluralism বহুপদ্ধতিবাদ
modernism আধুনিকতা
moral নৈতিক
– disposition নৈতিক প্রবণতা
– policing নৈতিক খবরদারি

nasty কদর্য
natural kind প্রাকৃতিক জাতি
naturalistic fallacy প্রকৃতিবাদী দোষ
New Left নব্য বামপন্থী
non-spatial দেশোত্তীর্ণ
non-temporal কালোত্তীর্ণ

paradox কূটাভাস
patriarchy পিতৃতন্ত্র
personal-identity ব্যক্তিক-সত্তা
polarization of power ক্ষমতার মেরুকরণ
postmodernism উত্তর-আধুনিকতা
practical reason প্রায়োগিক প্রজ্ঞা
pre-moral প্রাক্‌নৈতিক
presence উপস্থিতি
prima facie rights প্রতীয়মান অধিকার

quality of life জীবনের গুণগত মান

radicalism আমূল সংস্কারবাদ
radical translation নিরালম্ব অনুবাদ
reason, pure বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা
reason, theoretical তাত্ত্বিক প্রজ্ঞা
relativism সাপেক্ষবাদ

reference নির্দেশ
reciprocity পারস্পরিকতা, অন্যোন্যতা
right-based ন্যায়-নীতি ভিত্তিক

self-help group স্ব-সহায়ক গোষ্ঠী
selfhood construction ব্যক্তিক-সত্তা গঠন
sense অর্থ
sex identity যৌন-পরিচয়
spatial দৈশিক
stratification of power ক্ষমতার স্তরবিন্যাস

temporal কালিক
theoretical framework তত্ত্বকাঠামো

undecided অনিশ্চয়

voice সোচ্চার (প্রতিবাদ)
vocabulary শব্দতালিকা

women's studies মানবীবিদ্যাচর্চা
web of belief বিশ্বাসের পরিমণ্ডল

Scanned with

উৎস-নির্দেশ

Beauvoir, Simone de. *The Second Sex*. Translated and edited by H.M. Parshley. London: Picador, 1988.

Derrida, Jacques. "Hospitality, Justice and Responsibility: A Dialogue with Jacques Derrida." In *Questioning Ethics: Contemporary Debates in Philosophy*. Edited by Richard Kearney and Mark Dooley. London: Routledge, 1999.

Ferguson, Ann. "A Feminist Aspect Theory of the Self." In *Women, Knowledge and Reality: Explorations in Feminist Philosophy*. Edited by Ann Garry and Marilyn Pearsall. Boston, Mass.: Unwin Hyman, 1989.

Friedman, Marilyn. "Feminism in Ethics : Conceptions of Autonomy." In *The Cambridge Companion to Feminism in Philosophy*. Edited by Miranda Fricker and Jennifer Hornsby. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

Geetha, V. *Gender*. Kolkata: Stree, 2002.

Gilligan, Carol. *In a Different Voice*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1988.

Gilligan, Carol, et al., eds. *Mapping the Moral Domain*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1988.

Grosz, Elizabeth. "Philosophy." In *Feminist Knowledge: Critique and Construct*. Edited by Sneja Gunew. London: Routledge, 1990.

Hasna Begum. *Ethics in Social Practice*. Dhaka: Academic Press and Publishers Limted, 2001.

Held, Virginia. "Rights." In *A Companion to Feminist Philosophy*. Edited by Alison M. Jaggar and Iris Marion Young. Oxford: Blackwell Press, 2000.

Jaggar, Alison M. "Love and Knowledge: Emotion in Feminist Epistemology." In *Women Knowledge and Reality: Explorations in Feminist Philosophy*. Edited by Ann Garry and Marilyn Pearsall. Boston: Mass., Unwin Hyman, 1989.

_____."Feminism in Ethics: Moral Justification." In *The Cambridge Companion to Feminist Philosophy*. Edited by Miranda Fricker and Jennifer Hornsby. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

Jaggar, Alison M., and Iris Marion Young, eds. *A Companion to Feminist Philosophy*. Oxford: Blackwell Publishers, 2000.

Kant, Immanuel. *Observations on the Beautiful and the Sublime*. Translated by John T. Goldthwait. Berkeley: University of California Press, 1960.

_____. *Groundwork of the Metaphysic of Morals*. Translated by H. J. Paton. In *The Moral Law*. Translated by H. J. Paton. Bombay: B.I. Publications, Indian reprint, 1979.

Kiss, Elizabeth. "Justice." In *A Companion to Feminist Philosophy*. Edited by Alison M. Jaggar and Iris Marion Young. Oxford: Blackwell Press, 2000.

Koehn, Daryl. *Rethinking Feminist Ethics: Care, Trust and Empathy*. London: Routledge, 1998.

Mackie, J. L. *Ethics: Inventing Right and Wrong*. Harmondsworth: Penguin, 1977.

Mackie, J. L., and Penelope Mackie, eds. *Persons and Values*, Collected Papers, vol. 2. Oxford: Clarendon Press, 1985.

Mill, John Stuart. *The Subjection of Women*. London: J.M. Dent & Sons Ltd., 1977.

Moitra, Shefali, ed. *Women Heritage and Violence*. Calcutta: Papyrus, 1996.

_____. *Feminist Thought: Androcentrism, Communication and Objectivity*. New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., 2002.

Nicholson, Linda. *Gender and History*. Columbia: Columbia University Press, 1986.

Plekhanov, G. *Fundamental Problems of Marxism*. Edited by Ryzanov. Calcutta: Eagle Publishers, Indian reprint, 1944.

Plumwood, Val. *Feminism and the Mastery of Nature*. London: Routledge, 1993.

_____. "The Politics of Reason: Towards a Feminist Logic." In *Australasian Journal of Philosophy*, vol. 71, no. 4, 1994.

Rawls, John. *The Theory of Justice*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1971.

Rorty, Richard. *Philosophy and the Mirror of Nature*. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1979.

_____. *Essays on Heidegger and Others: Philosophical Papers*, vol. 2. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

Scanned with

Rowbotham, Shiela. "Dear Mr Marx: A Letter from a Socialist Feminist." In *Socialist Register 1998.* Edited by Leo Panitch and Colin Leys. Calcutta: K.P. Bagchi and Company, Indian reprint, 1998.

Scott, John. *Power.* Cambridge: Polity Press, 2001.

Sen, Amartya. "Gender Inequality and Theories of Justice." In *Women Culture and Development.* Edited by Martha Nussbaum and Jonathan Glover. Oxford: Clarendon Press, 1995.

Warren, Karen J., ed. *Ecological Feminism.* London: Routledge, 1994.

Wheeler III, Samuel C. "Indeterminacy of French Interpretation: Derrida and Davidson." In *Truth and Interpretation: Perspectives on the Philosophy of Donald Davidson.* Edited by Ernest Lepore. Oxford: Basil Blackwell Ltd., 1986.

Wollstonecraft, M. *Vindication of the Rights of Woman* (1792). Edited by M. Brody. London: Penguin, 1988.

নির্দেশিকা

অন্তর্ভুক্তি (inclusion) ২৬, ২৭, ৭৯, ৮০, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৪, ১২৭, ১৩৬
অস্বীকৃত-নির্ভরতা ৭০, ৭২, ১৬০

আধুনিক ৩৩, ৪২, ৬৭, ৭২, ৭৩, ৭৬, ৭৭, ৮১, ১৭০, ১৭৪
আধুনিকতা ৬৬, ৬৯, ৭১, ১৬৪
আধুনিকোত্তর ৩৫, ৩৬, ৩৯, ৪৩, ৬২, ১৬৪, ১৬৯
আবেষ্টন (closure) ৬১, ৬৪, ১৭১
অ্যারিস্টটল ১১, ১২, ১৩, ১৭, ৩৪, ৪১, ৪৫, ৪৬, ৫৬, ৬৭, ৬৮, ৭০, ৭৭, ৮৩, ৮৪, ৯০, ৯১, ১০২, ১০৩, ১০৭, ১১৯

উত্তর-আধুনিকতা ৩৩, ৬৬-৮৭, ১২৯

এক্সিট (exit) ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৭, ১২৮
এঙ্গেলস, ফ্রেডরিখ (Friedrich Engels) ৭
এম্পাওয়ারমেন্ট (empowerment) ৭৯, ১৪৪, ১৪৫-৫৮, ১৬০, ১৬১, ১৬২
এরর অব অমিশন (error of omission) ২৬, ৮২, ৮৫

ওলস্টনক্রাফট, মেরি (Mary Wollstonecraft) ১, ২, ৩, ১২

কান্ট, ইম্যানুয়েল (Immanuel Kant) ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৭, ৩৮, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৬, ৪৮, ৪৯, ৫৬, ৫৭, ৬০, ৬২, ৬৩, ৮৬, ৯৪, ৯৫, ১০৪, ১০৯, ১৬২, ১৬৩, ১৬৫, ১৬৬, ১৭১, ১৭২
কার্নার, স্টিফন (Stephan Körner) ৪৬
কো-ফিলিং (Co-feeling) ১২৬, ১২৭
কোলবার্গ, লরেন্স (Lawrence Kohlberg) ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১
কোয়াইন, ডবলিউ. ভি. ও. (W.V.O. Quine) ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৬৩, ১৬৩, ১৬৬
ক্ষমতার মেরুকরণ ৩০, ৩২, ৬৪, ১৬১, ১৬২

গজ, ওলিম্প দ্য (Olympe de Gouges) ১
গিলিগান, ক্যারল (Carol Gilligan) ১০৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১৩১, ১৬১
গুড লাইফ (good life) ৯০, ৯৬, ৯৭, ৯৯, ১০১, ১০৩

জেমস, উইলিয়াম (William James) ৫৬

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৭, ১৪৯, ১৫২, ১৫৩, ১৬০

ডায়ালেকটিকাল লজিক (dialectical logic) ৮৩, ৮৪
ডিউই, জন (John Dewey) ৫২, ১৭৮

Scanned with

ভেভিডসন, ডোনাল্ড (Donald Davidson) ৫১, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬৩,১৬৩, ১৭১, ১৭৩, ১৭৬, ১৭৭

তত্ত্বের অনবধান ২৬

দরদী নীতিশাস্ত্র (care ethics) ১০৪, ১১৫, ১১৯, ১২৪, ১২৬, ১২৯, ১৬১
দেকার্ত, (René Descartes) ১২, ২৪, ২৫, ২৯, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪২, ৪৪, ৪৬, ৪৯, ৫৬, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৭৪
দেরিদা, জাক (Jacques Derrida) ৬০, ৬১, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৭৫, ১৬৩, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭

নারী-নিসর্গনীতি (ecofeminism) ২২, ১৩১, ১৩২-৪৩, ১৬০, ১৬২
ন্যায়নীতি
  বিতরণ ধর্মী ১৫৪
  শাস্তিমূলক ১৫৪
নিউ ওয়েভ ফেমিনিজম (new wave feminism) ১
নিরালম্ব অনুবাদ (radical translation) ৫৪
নীট্‌শে, ফ্রেডরিখ উইলহেলম (Friedrich Wilhelm Nietzsche) ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭
নিবিড়-নিসর্গনীতি (deep ecology) ১৩৩, ১৩৯, ১৪১
নিসর্গনীতি, সামাজিক (social ecology) ১৩৩, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯
নেস, আরনে (Arne Naess) ১৩৯
ন্যুস্‌বম, মার্থা (Martha Nussbaum) ১৩, ১২১-২২

পার্স্‌, চার্লস স্যান্ডার্স (Charles Sanders Peirce) ৫৬
প্লামউড, ভ্যাল (Val Plumwood) ৭৭
প্লেখানভ, জি. (Georgii Plekhanov) ৮৩, ৮৪, ৮৭
প্লেটো ১০, ১২, ১৭, ২৫, ৪৬, ১০৩, ১১৯

ফুলে, জ্যোতিরাও ৩
ফ্রয়েড, সিগমুন্ড (Sigmund Freud) ২৬, ১০৮, ১১৬, ১৪০, ১৫৩
ফ্রেগে, গটলব (Gottlob Frege) ৩৮, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৯, ৬০, ১৬০, ১৬৩, ১৬৬, ১৭১

বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র ৩
বিধি
  চিন্তন (laws of thought) ৩৪, ৬৭, ৭০, ৭২, ৭৪, ৭৭, ৮২
  তাদাত্ম্য (law of identity) ৬৭, ৬৮, ৬৯
  নির্মাধ্যম (law of excluded middle) ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭২, ৭৬, ৭৯
  বিরুদ্ধতা (law of contradiction) ৫৫, ৬৭, ৬৮, ৮৩, ৮৪
বিনির্মাণ ৩৫-৬৪, ৭৭, ৭৮, ১৬৩-৭৭
বুক্‌চিন, মারে (Murray Bookchin) ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮
বুভোয়া, সিমোঁ দ্য (Simone de Beauvoir) ৭৪, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১৩১
ব্যক্তিক-সত্তা ৩১, ৩২, ৭১, ১২৪, ১২৫, ১৫০, ১৫৭

ভট্টাচার্য্য, কৃষ্ণচন্দ্র ৫৪
ভয়েস (voice) ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৭

মার্কস, কার্ল (Karl Marx) ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৭, ১০৮
ম্যাকি, জে. এল. (J.L. Mackie) ৮৫, ৮৬, ৮৮-১০৫, ১১১, ১২১
মিল, জন স্টুয়ার্ট (John Stuart Mill) ২, ১৩, ১৪, ৯৯, ১০৯
মোট, লুক্রিসিয়া (Lucretia Mott) ২
যুক্তিকেন্দ্রিক আবেষ্টন (logocentric closure) ৬০, ৬৪, ১৭৫, ১৭৭
যৌন-পরিচয় ১৭, ১৯, ২১, ২৪, ২৯, ৩১
রলস, জন (John Rawls) ২৫, ৯৫, ১০৯, ১১৬, ১২০, ১২১, ১২৪, ১২৬
রায়, রামমোহন ৩
রাসেল, বার্ট্রান্ড (Bertrand Russell) ৪৪, ৪৬, ৪৯, ১০৩
রিচার্ডস, জ্যানেট র‍্যাডক্লিফ (Janet Radcliff Richards) ১১০, ১৩১
রোরটি, রিচার্ড (Richard Rorty) ৫১, ৫২, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৭৮, ৮৫, ১০২, ১৬৯, ১৭০, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮
রোবথম, শিলা (Shiela Rowbotham) ৮২, ৮৩, ৮৫, ৮৭
র‍্যাডিকাল, নারীবাদ ১৮-৩৩, ৮৬, ১০৪, ১০৫, ১৩১, ১৬০, ১৬১

লজিক-কেন্দ্রিকতা ৫৭, ১৬৮, ১৭৮

লিবারাল নারীবাদ ১৭, ১৮-৩০, ৮৫, ৮৬, ১৩১, ১৬১
সনটাগ, সুসান (Susan Sontag) ১৬৫, ১৬৯
সরস্বতী, দয়ানন্দ ৩
সামাজিক নিসর্গনীতি (social ecology) ১৩৩, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯
সেন, অমর্ত্য ১২১
সেন, প্রণবকুমার ৫৯, ৬০, ৬৫
স্টনটন, এলিজাবেথ ক্যাডি (Elizabeth Cady Stanton) ২
স্ট্রসন, পি. এফ. (P. F. Strawson) ৪৬
স্ব-সহায়ক গোষ্ঠী ১৫১, ১৫২
স্বয়ংসিদ্ধ ১৪৫, ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৫৬, ১৫৮

হব্‌স, টমাস (Thomas Hobbes) ৮৬, ৯১, ১০২
হাইডেগার, মার্টিন (Martin Heidegger) ৫৯, ৬০, ৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৯, ১৭২, ১৭৩, ১৭৮
হুইট্‌গেনস্টাইন, লুডউইগ (Ludwig Wittgenstein) ৩৮, ৪৪, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৬০, ১২৮, ১৬০, ১৬৩, ১৬৬, ১৬৭, ১৭০, ১৭১, ১৭৩
হুসের্‌ল, এডমন্ড (Edmund Husserl) ১৬৮, ১৭২, ১৭৩

Philosophy / ASIHSS / DL
Mahabodhi
Rs. 150.00

JADAVPUR UNIVERSITY LIBRARY

Scanned with

শেফালী মৈত্র যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপিকা। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে মানবীবিদ্যাচর্চা কেন্দ্রের (School of Women's Studies) সঙ্গেও তিনি যুক্ত আছেন। নারীবাদ বিষয়ক তাঁর উল্লেখযোগ্য দুখানি বই হল: *Women Heritage and Violence*, ed. *(Kolkata*: Papyrus, 1996); *Feminist Thought : Androcentrism, Communication and Objectivity* (New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd, 2002)।

প্রচ্ছদ: সুনীল শীল
ISBN 81 7819 026 5
মূল্য: ১৫০.০০ টাকা